কোরআন কী বলে?
যুগোপযোগী বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা
প্রথম খন্ড

সুরাহ আল ফাতিহা

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

ফাতিহা শব্দের বাংলা অর্থ ভূমিকা, মুখবন্দ বা কোন পুস্তকের শুরু। কিন্তু কোরআনে এই সুরাহ ফাতিহা সন্নিবেশিত করা হয়েছে প্রথম পাতায় অভিনব এক প্রার্থনা হিসাবে।উম্মুল কোরআন তথা কোরআন-জননী খ্যাত সুরা ফাতিহা মহান আল্লাহর এক অমিয় নিদর্শন। ৩০ পারা ও ১১৪টি সুরাবিশিষ্ট পবিত্র কোরআনের সূচনা হয়েছে সুরা ফাতিহার মাধ্যমে; ঐশী মর্যাদা ও গুরুত্বের দিক থেকে যা অনন্য বৈশিষ্ট্যের ধারক। আল কোরআনের এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ সুরায় রয়েছে ৭টি আয়াত, একটি রুকু, ২৫ শব্দ ও ১১৩ বর্ণের সমাহার। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত কোরআনুল কারিমের প্রাথমিক দিককার সুরাগুলোর অন্যতম এটি। ৭টি আয়াতের প্রথম ৩টি আয়াতে আছে মহান আল্লাহর প্রশংসা, গুনগান এবং শেষ ৩টি আয়াতে আছে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা যেন আমাদেরকে সরল সঠিক পথে দেখানো হয়। মাঝে ৪ নং আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহর প্রশংসা ও শেষাংশে আমাদের প্রার্থনা। সুতরাং ৭টি আয়াতের এই সুরার অর্ধেক আল্লাহর জন্য আর অর্ধেক আমাদের জন্য। এই সাতটি আয়াতের কথা আল্লাহ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, সুরাহ হিজরের ৮৭ নং আয়াতে । অর্থাৎ "আমি অবশ্যই আপনাকে সাতটি বারবার পঠিতব্য আয়াত (সুরা ফাতিহা) এবং মহান কোরআন দিয়েছি (১৫ :৮৭)।" এখানে লক্ষ্য করুন, আল্লাহ এই সাতটি আয়াতকে কোরআন থেকে আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। এটা এই কারনে যে এই সাতটি আয়াতের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এটা এমন এক নূর যা অন্য কোন নবী-রাসুলকে দেওয়া হয়নি।সুরাহ ফাতিহা বার বার পঠিতব্য , তাই নামাজের প্রতি রাকাতেই এই সুরাহ পড়া ওয়াজিব। একে সব রোগের প্রতিষেধক হিসেবেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই সুরার শেষ তিন আয়াতে আমরা প্রার্থনা করেছি, যেন আমাদের সরল সঠিক পথ দেখানো হয়, যে পথে নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহীনগন গিয়েছেন। যে পথ গজব-প্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথ নহে। এই প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পুরো কোরআন নাজিল করেছেন। এই কোরআনে রয়েছে সরল সঠিক পথের সন্ধান। গজব প্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট জাতি কারা, তারও দিক নির্দেশনা রয়েছে এই কোরআনে। । আমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান চেয়েছি, উত্তরে আল্লাহ কোরআন পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাই সুরাহ বাকারার প্রথমেই আল্লাহ ঘোষনা করেছেন, এই কিতাব মুত্তাকিনদের জন্য পথ প্রদর্শক।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمـٰنِ الرَّحِيمِ

مَـالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ
غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।
যিনি পরম দয়ালু ও অতি মেহেরবান।
যিনি বিচার দিনের মালিক।
আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।
আমাদেরকে সরল পথ দেখাও,
সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ।
তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

সুরাহ বাক্বারাহ

১
এ বিশ্বে এমন কোন বই কি আপনি দেখেছেন যার লেখক তার বইকে সম্পূর্ন ত্রুটিমুক্ত বলে ঘোষনা দিয়েছেন, যেখানে কোন ধরনের ভুল ভ্রান্তি নেই। কক্ষনো নয়, এমন কোন বই-ই আপনি পাবেন না। বরং প্রতিটি লেখক তার বইয়ের ভুল ভ্রান্তি ধরিয়ে দেবার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করেন। কিন্তু আল্লাহর এই বইয়ের দিকে লক্ষ্য করুন। তিনি পরিস্কার ভাবে ঘোষনা দিয়েছেন যে তার কেতাবে না আছে কোন সন্দেহ, না আছে কোন ভুলভ্রান্তি, না আছে কোন বিভ্রান্তি। এবং মুমিনদের জন্য এটা এক মহা হেদায়েতের গ্রন্থ। আল্লাহর এই কেতাব এই ভাবেই শুরু করা হয়েছেঃ

الم
ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

আলিফ লাম মীম।
এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য, (২ঃ১-২)

২
সুরাহ বাকারার প্রথমেই আল্লাহ ঘোষনা দিয়েছেন, এই মহা গ্রন্থ আল কোরআন মুত্তাকীদের জন্য পথ-প্রদর্শক। কারা এই মুত্তাকী? পরবর্ত্তী দুই আয়াতে আল্লাহ মুত্তাকীদের পরিচয় পেশ করেছেন। মুত্তাকী তারাই যারা অদৃশ্যে বা গায়েবে বিশ্বাস করে। আমরা দেখিনা বলেই যে সেটার অস্তিত্ব নেই, তা কিন্তু নহে। আমরা বায়ু দেখি না, কিন্তু মৌসুমী বায়ুর প্রবাহে যখন বৃষ্টিপাত হয় তখন বায়ুর কার্যকারীতা বুঝতে পারি। আবার বায়ু যে কত ভয়ংকর হতে পারে, টর্নেডো হলে সেটা টের পায়। তাই মুত্তাকীরা গায়েবে বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে আল্লাহতে যাকে আমরা দেখি না। তারা বিশ্বাস

করে ফেরেশতাদের, তারা বিশ্বাস করে বেহেশত-দোজখে, আর পুনরুত্থানকে যেগুলি ভবিষ্যতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাবে। সামাজিকভাবে মুত্তাকীদের চেনা যাবে তাদের দুইটি কাজের দ্বারা। তারা যথাযতভাবে নামাজ আদায় করে এবং সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় দান খয়রাত করতে থাকে। মুত্তাকী তারাই যারা এই কোরআনকে বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে মুহাম্মদ (দ:) আল্লাহর রাসুল এবং তার উপরই কোরআন নাজিল হয়েছে। তারা বিশ্বাস করে, এর আগেও নবীরা কেতাব পেয়েছেন। সর্বশেষে তারা বিশ্বাস করে পরকালের অনন্ত জীবনকে। আমাদের জীবন এই পৃথিবীর একশত দেড়শত বছরে সীমাবদ্ধ নহে। সামনে আমাদের সীমাহীন অনন্ত জীবন যার প্রস্তুতি আমাদের নিতে হবে এই পৃথিবীতে। আল্লাহ ঘোষনা দিয়েছেন, এই সব লোকেরাই আল্লাহর নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং এরাই জীবনে সফল।

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। (২:৩-৪)

৩
মুত্তাকীদের বিপরীত মেরুতে যারা অবস্থান করছে তারাই কাফির ও মুশরীক। তারা কখনই অদৃশ্যে বিশ্বাস করে না, রাসুলদের তারা যাদুকর মনে করে, মোজেজাগুলিকে তারা যাদু মনে করে, আল্লাহর কিতাবকে তারা স্বহস্তে লিখিত বই মনে করে। আসলে তারা সত্য গ্রহনের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, কোন যুক্তি তারা মানে না। আসমান-জমিনে আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনাবলী বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলি তাদের মনে দাগ কাটে না। তাদের চোখ আছে, তারা দেখে না। তাদের কান আছে তারা শুনে না। তাদের অন্তর আছে, তারা উপলব্ধি করে না। আল্লাহ বলেন, তাদের চোখের উপর পর্দা ফেলে দেওয়া হয়েছে, তাদের কানে ও অন্তরে মোহর এটে দেওয়া রয়েছে। এই পৃথিবীর ১০০ বছরের জীবনের মধ্যেই তাদের জীবন সীমিত। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে চরম শাস্তি।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ
خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ

নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাতে কিছুই আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (২:৬-৭)

৪.
মুত্তাকী আর কাফির, এই দুই দলের মাঝামাঝি আর এক দল রয়েছে, তাদেরকে মোনাফিক বলা হয়। তারা মুমিনদের প্রতারিত করতে চাই। তারা মুখে ইমানের কথা বলে, কিন্তু অন্তরে তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। এরা খুবই সাংঘাতিক এই কারনে যে তাদেরকে সহজে চেনা যায় না, কারন তারা মুসলমানদের সাথেই মিলে মিশে থাকে। অথচ সব সময়ই মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টায়

থাকে। মুসলমানদের কোন ক্ষতি হলে তারা মনে মনে আনন্দিত হয়। মুসলমানদের শত্রুদের সাথে তারা গোপনে হাত মিলায়, তাদের মিশন বাস্তবায়িত করার জন্য তারা মুসলমানদের মাঝে কাজ করে। আল্লাহ বলেন, তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, আর এই ব্যাধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। দোজখের নিম্নতম স্তরে তাদের স্থান।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ
يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ
فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। তাদের অন্তঃকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন। (২:৮-৯-১০)

৫ .

আমরা অতীতে দেখেছি যে, অনেক সমাজ সংস্কারক এই বিশ্বে আবির্ভুত হয়েছেন তাদের নিজস্ব মত, পথ এবং চিন্তা চেতনা নিয়ে। সেগুলি তারা তাদের সমাজে এবং রাষ্ট্রে প্রবর্তন করার চেষ্টা করেছেন।কম্যুনিজম সোস্যালিজম এবং ক্যাপিটালিজম এই ধরনের চিন্তা ও চেতনার ফসল। কিন্তু এইসব চিন্তা চেতনা কি বিশ্বের সমস্যা গুলির সমাধান দিতে পেরেছে ? পারেনি। বরঞ্চ সেগুলি আমাদের জীবনকে আরও জটিল করে তুলেছে।তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করেন, কেন তারা বিশ্বে বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে? তারা বলবে, আমরা তো সমাজকে সংস্কার করছি। আল্লাহতালা এই ধরনের লোকদের কথা কোরআনে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান মুসলিম সমাজের মধ্যেও এরকম বহু দলের আবির্ভাব হয়েছে যারা কোরআন গবেষনার নামে নতুন নতুন তত্ত্বের উদ্ভাবন করে চলেছে যা ইসলামের মুল ধারা থেকে শত যোজন দূরে। অনেকে হাদিস ও সুন্নাহকে পুরোপুরি অস্বীকার করছে। ফলে প্রচলিত পদ্ধতিতে নামাজ রোজা হজ্জ পালনের পরিবর্তে নতুন ভাবে নিজস্ব পদ্ধতি আবিস্কারে তৎপর তারা। বিদআত ও শিরকের ধুঁয়া তুলে তারা ইসলামের কলেমাকেও মানতে চায় না। কলেমা থেকে তারা "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" শব্দগুলিকে বাদ দিতে চায়। অথচ ইসলামে প্রবেশ করার প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে প্রকাশ্যে এই কলেমার ঘোষনা দেওয়া- লা এলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। এই ঘোষনা ছাড়া কেউ মুসলমান হতে পারে না। এদের থেকে মুসলিম ভাইদের সাবধান থাকতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে যারা এই শ্রেনীর, আল্লাহ তাদেরকে মুনাফিকের দলে ফেলেছেন।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ

আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরাই তো হচ্ছি বরং সংশোধনকারী। মনে রেখো, তারাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না। (২ঃ১১-১২)

প্রতিটি সমাজে কিছু কিছু নাস্তিক আর মুনাফিক থাকে যারা নিজেদেরকে এই বিশ্বের সবচেয়ে শিক্ষিত লোক বলে মনে করেন। তাদের চোখে সমস্ত বিশ্বাসীগণ হলো বোকা। তারা এটাকে অন্ধ বিশ্বাস বলে মনে করে। সব কিছুতেই তারা বিজ্ঞান ও যুক্তি খুজে বেড়ায়। কিন্তু ব্যাপারাটি সম্পূর্ন উল্টো। তাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। এই পৃথিবীর ১০০ বছরের জীবন নিয়ে তাদের কারবার। এর পরেও যে সামনে এক অনন্ত মহা জীবন পড়ে রয়েছে, সে সম্বন্ধে তাদের কোন ধারনাই নেই। তাই মহান আল্লাহতালা এইসব নাস্তিকদেরকেই মহা বোকা বলে ঘোষনা দিয়েছেনঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না।(২ঃ১৩)

৭.

মুনাফিকদের বিষয়ে বলতে যেয়ে আল্লাহ সুবহানুতালা নীচের আয়াতে একটি সুন্দর উদাহরন টেনেছেন। নিকশ অন্ধকারের মধ্যে চলছে এক ব্যক্তি। সামনে পিছনে সবদিকেই ঘোর কৃষ্ণ কালো। ভালো-মন্দ কোন কিছুই দেখতে পায় না সে। অনেকটা আন্দাজে পথ চলছে। এর মধ্যে খড়কুটো জোগাড় করে সে একটি মশাল জালালো। চারিদিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সামনের পথ পরিষ্কার হলো। উচুনিচু, খানা-খন্দ এড়িয়ে সে নিরাপদে পথ চলতে লাগলো। কিছুক্ষন পরে এক দমকা হাওয়ায় মশালটি নিভে গেল। আবার অন্ধকারে ছেয়ে গেল চারিদিক। অন্ধের মত আন্দাজের উপর চলতে লাগলো সে। মদীনার মুনাফিকদের অবস্থাও ছিল একই রকম। প্রথম দিকে শিরকের অন্ধকার পথে ছিল তারা। অন্যান্য লোকের সাথে তারাও ইসলাম গ্রহন করলো। সত্যের আলোতে ভরে উঠলো তাদের জীবন। কিন্তু সেটা ক্ষণস্থায়ী হলো তাদের জন্য। ক্ষমতা, লোভ ও সম্পদের মোহের দমকা হাওয়ায় তারা সে সত্য হারিয়ে ফেললো। আবার অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো তারা। গোপনে ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার কাজে লিপ্ত হয়ে উঠলো তারা। মদীনার মোনাফিক ও বর্তমানের মুনাফিকদের কাজে কি কোন পার্থক্য আছে? মোটেই না। আগের আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, এরা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ ক্রয় করেছে। মোটেই লাভজনক হয়নি এদের ব্যবসা। অন্যদিকে মুমিনদের জান মাল আল্লাহ কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। আর আল্লাহ বার বার ঘোষনা করেছেন, মোনাফিকদের জন্য রয়েছে সবচেয়ে নিম্ন স্তরের দোজখ।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ

তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে লোক কোথাও আগুন জ্বালালো এবং তার চারদিককার সবকিছুকে যখন আগুন স্পষ্ট করে তুললো, ঠিক এমনি সময় আল্লাহ তার চারদিকের আলোকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। ফলে, তারা কিছুই দেখতে পায় না। (২:১৭)

৮

আল্লাহ তালা কেন আসমানকে ছাদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন? আসমান কি আমাদেরকে ছাদের ন্যায় সুরক্ষা দিয়ে থাকে? সত্যিই তাই । আসমান আমাদেরকে মহাবিশ্বের মহাক্ষতিকর রশ্মির কবল থেকে রক্ষা করে। যে বায়ুমন্ডল আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে তা ভেদ করে মহাবিশ্বের কোন কিছুই আমাদের পৃথিবীকে আঘাত হানতে পারেনা। উল্কা পিন্ড বা কোন গ্রহাণু যদি পৃথিবীর দিকে

ধেয়ে আসে তবে বায়ু মণ্ডলে প্রবেশের সাথে সাথে তাতে আগুন ধরে যায়। পৃথিবীতে পৌছার আগেই তা ভস্মীভূত হয়। কি সুন্দর সুরক্ষা ব্যবস্থা। তাইতো একে কোরআন ছাদ নামে আখ্যায়িত করেছে। আবার যদি আসমান বলতে মহা বিশ্বের শেষ সীমানা ধরা হয়, তবে সেখানে সুরক্ষা ব্যবস্থা আরো কঠিন। কোন কিছুই মহা বিশ্ব ভেদ করে বাইরে যেতে পারে না, না পারে কোন কিছু ভিতরে ঢুকতে। ইস্পাত কঠিন সুরক্ষা ব্যবস্থা সেখানে। তাই আসমানকে আমরা যে অর্থেই নিই না কেন, এটা যে সর্বাবস্থায় ছাদের কাজ করে এতে কোন সন্দেহ নাই।

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুতঃ এসব তোমরা জান।।(২ঃ২২)

৯.
আল্লাহ বিশ্ববাসীর সামনে এক মহা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন, তোমরা যদি এই কোরআনকে সন্দেহ করো, যদি মনে করো যে এই কোরআন কোন এক মানুষ স্বহস্তে লিখেছে, তবে এর মত করে একটি সুরাহ রচনা করে নিয়ে আসো। আর এই কাজে তোমরা যে কোন ধরনের সাহায্য গ্রহন করতে পারো। তোমরা তোমাদের সহযোগীদের ডাকতে পারো, তোমাদের উপাস্যদের ডাকতে পারো। কিন্তু তোমরা তা কখনই রচনা করতে পারবে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, তখনকার আরবের শিক্ষিত জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তিরা আল্লাহর এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারে নি। নামী-দামী কবিরাও হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছে- এটা মানুষের কথা হতে পারে না। তাই কোরআন নিজেই একটি মোজেজা যা কেয়ামত পর্য্যন্ত কায়েম থাকবে। এই কারনেই কোরআনের প্রতিটি বাক্যকেই এক একটি নিদর্শন বলা হয়েছে, আয়াৎ বলা হয়েছে। আয়াতের শাব্দিক অর্থই হচ্ছে নিদর্শন। চ্যালেঞ্জের পরেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের হুসিয়ার করে দিয়েছেন- যেহেতু তোমরা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে না, সেহেতু তোমরা একে আল্লাহর বানী বলে বিশ্বাস করো, আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ইমান আনো। তা না করলে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তোমরা, দোজখের আগুনে জ্বলতে হবে তোমাদের। মনে রেখো, দোজখের ইন্ধন হচ্ছে জ্বিন, ইনসান আর পাথর।

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরাহ রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও- এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। আর যদি তা না পার-অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সেই দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য। (২:২৩-২৪)

১০.
আল্লাহ তাদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন, যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। ইমানের সাথে সৎকর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সৎকর্ম ছাড়া কোন ইমানই পরিপুর্ন নহে। তাই কোরআনের বিভিন্ন স্থানে ইমানের সাথে সাথে আমলের উল্লেখ আছে। আমল ছাড়া ইমান ফলপ্রসু নহে। আবার ইমান ছাড়া কোন আমলই আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য নহে। তাই যাদের হৃদয় ইমানে ভরপুর, আর জীবন সৎকর্মে পরিপুর্ন, তাদের জন্যই আল্লাহ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। জান্নাতে কি কি পাওয়া যাবে? দুনিয়াতে যে সব নাজ-নেয়ামত মানুষ উপভোগ করেছে, তার সব কিছুই জান্নাতে থাকবে। কিন্তু কোয়ালিটি, স্বাদ আর গুনের দিক থেকে সেগুলি অতুলনীয়। দুনিয়া থেকে হাজার গুনে উপভোগ্য সেগুলি। একইভাবে পৃথিবীতে যে সব কষ্টকর জিনিস রয়েছে, জাহান্নামে সেগুলি থাকবে। কিন্তু সেগুলি হবে হাজারগুন কষ্টকর। আসলে এই দুনিয়া হচ্ছে বেহেশত ও দোজখের একটি Mini Pilot Project. এখানেই আমরা কিছুটা বুঝতে পারি ও অনুভব করতে পারি, বেহেশতের শান্তি কেমন হবে, অথবা দোজখের শাস্তি কেমন হবে। বর্তমান সময় ও আখিরাতের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল বর্তমানের সব কিছুই নশ্বর। আর আখিরাতের সব কিছুই অবিনশ্বর অক্ষয়। বর্ত্তমান যে মহাবিশ্ব রয়েছে, সেটা Expanding এবং ধ্বংশলীল। কিন্তু পরকালে যে মহাবিশ্ব তৈরী হবে সেটা স্থিতি-স্থাপক অবস্থায় থাকবে এবং তা কখনই ধ্বংশ হবে না। তাই সেই মহাবিশ্বের বেহেশত-দোজখও হবে চিরস্থায়ী। না সেখানে ধ্বংশ আছে, না সেখানে ক্ষয় আছে।

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

আর হে নবী (সাঃ), যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকূল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (২:২৫)

১১
আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে অনেক ছোটখাটো পোকা-মাকড়ের উদাহরন টেনেছেন। মশা, মাছি, পিঁপড়া, মৌমাছি, মাকড়সা ইত্যাদি পতঙ্গ এবং ঘোড়া, গাধা ও বানরের মত জন্তু-জানোয়ারও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অবিশ্বাসীরা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, এইসব উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ আমাদের কি শিক্ষা দিতে চান। নিশ্চয়ই শিক্ষার অনেক কিছু আছে। আপনি কি লক্ষ্য করেন নি যে কিভাবে এই তুচ্ছ পতঙ্গগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কিভাবে তাদের জীবন দেওয়া হয়েছে? প্রতিটি প্রাণী একে অপর থেকে আলাদা। আলাদা তাদের বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজনীয়তা। একটা মশা ও একটা মাছির মধ্যে কত পার্থক্য। আবার মৌমাছির জীবনধারা সম্পূর্ণ আলাদা। প্রশ্ন হল, মানুষ কি সামান্য একটা মাছিও তৈরী করতে পারে এবং তাতে জীবন দিতে পারে? এইখানেই রয়েছে সবচেয়ে বড় শিক্ষা। আল্লাহ এইসব ছোট খাট তুচ্ছ প্রানী দিয়েই পৃথিবীতে বিশাল বিশাল ঘটনা ঘটিয়ে দেন। মৌমাছির মধু মানুষের কত উপকারে আসে। আবার মশা মাছি দিয়ে আল্লাহ বড় বড় সভ্যতা ধংশ করে দেন। মশার চেয়েও ছোট করোনা, একটি অণুজীব। সমস্ত পৃথিবী তার তাণ্ডবে ছয়লাব।

إِنَّاللَّهَلاَيَسْتَحْيِيأَنيَضْرِبَمَثَلاًمَّابَعُوضَةًفَمَافَوْقَهَافَأَمَّاالَّذِينَآمَنُواْفَيَعْلَمُونَأَنَّهُالْحَقُّمِنرَّبِّهِمْوَأَمَّا الَّذِينَكَفَرُواْفَيَقُولُونَمَاذَاأَرَادَاللَّهُبِهَـذَامَثَلاًيُضِلُّبِهِكَثِيراًوَيَهْدِيبِهِكَثِيراًوَمَايُضِلُّبِهِإِلاَّالْفَاسِقِينَ

আল্লাহ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদুর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। বস্তুতঃ যারা মুমিন তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত এ উপমা সম্পূর্ণ নির্ভূল ও সঠিক। আর যারা কাফের তারা বলে, এরূপ উপমা উপস্থাপনে আল্লাহর মতলবই বা কি ছিল। এ দ্বারা আল্লাহ তাআলা অনেককে বিপথগামী করেন, আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করেন। তিনি অনুরূপ উপমা দ্বারা অসৎ ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন অন্য কাকেও বিপথগামী করেন না। ।(২:২৬)

১২

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, আমাদের এই মহাবিশ্বই একমাত্র বিশ্ব নহে।এর বাইরেও আরও অনেক মহাবিশ্ব রয়েছে এবং প্রত্যেকেরই নিজস্ব প্রাকৃতিক নিয়মাবলী ও আইন কানুন রয়েছে। আমরা খালি চোখে অথবা দুরবীনের সাহায্যে যা কিছু দেখি তা সমস্তই আমাদের এই মহাবিশ্বের অন্তর্গত। কিন্তু বিজ্ঞান এখনও জানে না ঠিক কতটি মহাবিশ্ব রয়েছে। কোরআন এটাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কোরআন বলে, আল্লাহ তালা সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ মোট ৭টি মহাবিশ্ব রয়েছে। অন্য আয়াতে রয়েছে যে প্রতিটি মহাবিশ্বের মধ্যে পৃথিবীর মত একটি করে জমিন রয়েছে। "আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়" -(৬৫ঃ১২)। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত। (২:২৯)

১৩

আল্লাহ তালা আদম (আ:) কে সৃষ্টি করেন এবং তাঁকে সব কিছুর নাম শিখিয়ে দিয়েছেন। এর অর্থ কী কেবল মাত্র এই যে তাঁকে পানি, নদী, গাছ-পালা, জীব-জন্তু অথবা এই ধরনের সমস্ত কিছুর নাম শেখানো হয়েছে, যেভাবে বাইবেলে আছে? মোটেই না! প্রতিটি বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে শিক্ষা দেয়া হয়েছে- যেমন পানির সাথে সাথে পানির যে তিনটি অবস্থা, পানির উপাদান (অক্সিজেন-হাইড্রোজেন), পানির ধর্ম ইত্যাদি পানির পুরো Chemistry আল্লাহতালা আদম (আ:) কে শিখিয়েছেন। আর আদম (আ:) এর নিকট থেকে তার সন্তানেরা সুপ্ত অবস্থায় এই জ্ঞান বহন করে চলেছেন। তাই বিজ্ঞানীরা ক্রমান্বয়ে এসব আবিস্কার করে চলেছেন এবং মানব কল্যাণে সেগুলো ব্যবহার হচ্ছে। কেয়ামত আসার আগেই বাকী সমস্ত সুপ্ত জ্ঞান আস্তে আস্তে প্রকাশিত হয়ে পড়বে এবং মানব জাতী উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করবে। এ কারণেই মানুষ ফেরেশতাদের তুলনায় জ্ঞানী। আর এই জ্ঞানের জন্যই আমাদের আদি-পিতাকে সিজদা করে শ্রদ্ধা জানাতে হয়েছিল ফেরেশতাদের ।

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

আর আল্লাহ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। তারপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক।(২ঃ৩১)

১৪
ফেরেশতাদের মতামতের বিরুদ্ধেই আল্লাহ আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করলেন। তাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিলেন। তারপর তাকে ফেরেশতাদের সামনে হাজির করলেন পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। আদম আঃ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন যা ফেরেশতাদের জানা ছিল না। আল্লাহ চাইলেন আদমকে বিশেষভাবে সম্মানীত করা হোক সবার সামনে। তাই তিনি সবাইকে আদেশ করলেন আদমকে সিজদা করার জন্য। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই সিজদা এবাদতের সেজদা নয়। এটা কাউকে সম্মান দেখানোর জন্য তার সামনে বিনত হওয়া। আগেকার যুগে বিভিন্ন ধর্মে, গোত্রে বা জাতির মধ্যে এই ধরনের সম্মানমূলক সেজদা চালু ছিল। হিন্দু ধর্মে এখনও ষষ্ঠাঙ্গে প্রনাম করার প্রথা আছে। ইউসুফ আঃ এর ভাইয়েরা তাকে সম্মান মূলক সেজদা করেছিল। কিন্তু শেষ নবীর শরীয়তে যে কোন ধরনের সেজদাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেজদা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। হাদিসে এসেছে, সেজদা দেওয়া জায়েজ হলে স্বামীকে সেজদা করার আদেশ দেওয়া হতো। কিন্তু শিরক করার সমস্ত পথ বন্ধ করার জন্যই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য সব ধরনের সেজদাকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। পীর সাহেবকে সেজদা করার প্রথা এবং পীরের কবরকে তাওয়াফ করার প্রথা শিরক ছাড়া আর কিছুই নহে। যাই হোক, আল্লাহর আদেশ শুনা মাত্রই ফেরেশতারা সেজদায় পড়ে গেলেন। কিন্তু ইবলিস সরাসরি আল্লাহর আদেশকে অমান্য করলো। শুধু তাই নয়, সে আল্লাহর সাথে এক বিতর্কে লিপ্ত হলো যে কেন সে সেজদা করে নাই। সে দাবী করল যে সে আদমের চেয়ে শ্রেষ্ট, কারন সে আগুন থেকে সৃষ্টি, আর অন্যদিকে আদম মাটি থেকে সৃষ্টি। মাটি থেকে সৃষ্টি হলেও জ্ঞান-বিজ্ঞান আর উদ্ভাবনী শক্তিতে মানুষ এতই উন্নত যে ফেরেশতাদের সম্মানও তারা দাবী করতে পারে। এই সত্য ইবলিস কোনদিনও বুঝতে চাই নি। এই অহংকারই তাকে আল্লাহর লানতের উপযোগী করেছে কেয়ামত পর্য্যন্ত।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

এবং যখন আমি হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। (২ঃ৩৪)

১৫
আদম ও হাওয়াকে জান্নাতে স্থান দেওয়া হলো। অন্য দিকে ইবলিস বহিস্কার হলো আল্লাহর রহমত থেকে। এটা ইবলিস কোনমতেই মেনে নিতে পারলো না। কিভাবে আদমকে পদস্খলন করানো যায় সেটাই হলো তার প্রধান প্রচেষ্টা। জান্নাতের সব কিছুই আদম-হাওয়ার জন্য অবারিত ছিল, শুধুমাত্র একটি গাছের কাছে যেতে আল্লাহ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। এই সুযোগই নিলো ইবলিস। ঐ গাছের ফল খাওয়ার জন্য সে আদম হাওয়াকে প্ররোচিত করতে লাগলো। সে তাদের বোঝাতে লাগলো, ঐ গাছের ফল খেলে তারা জান্নাতে চিরকাল থাকতে পারবে। এক সময় আল্লাহর নিষেধকে বিস্মৃত হয়ে সেই গাছের ফল খেলেন তারা। সংগে সংগেই এর ফলাফল দেখা গেল। নিজেদের জান্নাতী পোষাক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। নিজেদের ভূল বুঝতে পারলেন তারা। আকুল ব্যাকুল হয়ে তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। আল্লাহ বললেন, নেমে যাও তোমরা পৃথিবীতে একে অপরের শত্রু হয়ে। পৃথিবীতে এসেও আদম হাওয়া অব্যাহত ভাবে আল্লাহর কাছে তওবা করতে লাগলেন। এক পর্য্যায়ে আল্লাহ তাদেরকে শিখিয়ে দিলেন সেই অমিয় বানী, যা বলে তারা আল্লাহর কাছে মাফ

চাইতে লাগলেন-"রাব্বানা জালামনা আনফুসিনা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা ওয়া তারহামনা লানা কুনান্না মিনাল খাসিরিন" (৭ঃ২৩)। আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিলেন, আর শিখিয়ে দিলেন কি ভাবে জীবন যাপন করলে তারা আবার জান্নাতের অধিকারী হবেন, চিরদিনের জন্য। ইবলিস মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিল যে, নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলে তারা জান্নাতে চিরস্থায়ী হবেন। কিন্তু সে ফল খাওয়ার ফলে সত্যি সত্যিই মানুষের সামনে আল্লাহ চিরস্থায়ী জান্নাত লাভের দ্বার খুলে দিলেন। কি অপূর্ব আল্লাহর কলাকৌশল।

فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অতঃপর হযরত আদম (আঃ) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। (২:৩৭)

১৬
বনি ইসরাইল-ইসরাইলের বংশধরগন। কে এই ইসরাইল? আমরা হয়তো অনেকে জানি না যে ইসরাইল হচ্ছে ইয়াকুব আ: এর একটি উপাধী। সারা রাত একটি লোকের সাথে কুস্তি লড়ার পরেও ইয়াকুব আঃ হেরে যান নি বলে সেই লোকটি তাকে এই উপাধী দিয়েছেন। বাইবেলে উল্লেখ আছে–28 Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel,[a] because you have struggled with God and with humans and have overcome."- Genesis 32:28 । কোরআনে বহু স্থানে এই বনি ইসরাইল শব্ধটির উল্লেখ আছে। এমন কি এই নামে কোরআনে একটি সুরাও রয়েছে। ইসরাইলী নবী মুসা আঃ এর নাম কোরআনে এসেছে ১০৮ বার। নিশ্চয়ই এ সবের বহুবিধ কারন রয়েছে। মদীনায় যে সব গোত্র ইসলামের সংস্পর্শে আসে তার মধ্যে ঐশীপ্রাপ্ত একমাত্র জাতি ছিল বনি ইসরাইলগন, মদীনার ইহুদীগন। আল্লাহর কেতাব সম্বন্ধে তাদের সম্যক জ্ঞান ছিল, বহু নবী রাসুলের সংস্পর্শে এসেছে তারা, আল্লাহর বহু মোজেজা তারা চাক্ষুস দেখেছে। তা ছাড়াও শেষ নবীর আগমনের বার্তা তাদের কেতাবে খুবই সুস্পষ্টভাবে ছিল। তাই আশা ছিল যে তারা শেষ নবীকে অতি সহজেই চিনে নেবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তারা নবীকে ঠিক চিনেছিল, কিন্তু বিভিন্ন পার্থিব কারনে তাকে সাহায্য করেনি। তাই আল্লাহ বার বার তাদেরকে স্মরন করিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর সাথে তাদের অঙ্গীকারের কথা, বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা। তাদের পালানোর জন্য আল্লাহ সাগরে পথ করে দিয়েছেন, ৪০ বছর তাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্য বর্ষন করেছেন। তাই আল্লাহ বার বার তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন, তারা যেন এই নতুন অবর্তীন কেতাবে বিশ্বাস স্থাপন করে, পার্থিব কারনে তারা যেন অবিশ্বাসকারী না হয়।

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ
وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

হে বনী-ইসরাঈলগণ, তোমরা স্মরণ কর আমার সে অনুগ্রহ যা আমি তোমাদের প্রতি করেছি এবং তোমরা পূরণ কর আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা, তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। আর ভয় কর আমাকেই। তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারী রুপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি তা বিশ্বাস কর। তোমরাই তার প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না। আর আমার আয়াতের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করো না। এবং শুধু আমাকেই ভয় করো। (২:৪০-৪১)

১৭
নীচের আয়াতটিও মদীনার ইহুদীদের কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতেই নাজিল হয়েছে। তাদের কিতাবে শেষ নবী সম্বন্ধে যে সত্য বর্ণনা আছে, পার্থিব মোহে তা গোপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশিয়ে সত্যের অপলাপ করতেও বারন করা হয়েছে। বর্তমানেও এটা আমাদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। আমরা প্রায়ই সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশিয়ে কথা বলি, অথবা সত্যকে গোপন করি। আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু- বান্ধব বা ভিন্ন ধর্মের বন্ধুদের খুশী রাখার জন্য এ পথ বেছে নেই। আমাদের ধারনা যে, সত্য প্রকাশ পেলে তারা আঘাত বা লজ্জা পেতে পারে। অনেক সময় কোর্টে সাক্ষ্য দিতে গিয়েও আমরা সত্যের অপলাপ করি। আল্লাহ তালা আমাদের সত্য গোপন করতে নিষেধ করেছেন।এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনের নির্দেশনা নিম্নরূপঃ-

وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিওনা এবং জানা সত্ত্বে সত্যকে তোমরা গোপন করোনা। (২ঃ৪২)

১৮
যখনই কোন সমস্যা আসে, অথবা কোন বিপর্যয় বা ধ্বংশ আপতিত হয়, তখন আমাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কী হয় ? প্রায়ই দেখা যায়, আমরা প্রথমেই সৃষ্টিকর্তাকে দোষারোপ করতে থাকি। আল্লাহ কেন এই বিপদ দিলেন, শুধু আমার উপরেই যত সব বিপদ, ইত্যাকার নানা রকম অভিযোগ। আমরা অন্য লোকদেরও অভিশাপ দিয়ে থাকি, একে অপরের উপর দোষ চাপাই। কখনও কখনও নিরাশ হয়ে পড়ি। আল্লাহ এ ব্যপারে কি সুন্দর নির্দেশনা দিয়েছেন আমাদের। প্রথমেই আমাদের ধৈর্য ধারন করতে হবে। কাউকে দোষারোপ না করে আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। মনকে শান্ত রাখতে হবে। পরে নামাজে দাড়িয়ে আল্লাহর সাহায্য ও দয়া চাইতে হবে। এর পরেই উন্মুক্ত প্রান্তরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। সুরাহ বাকারার ১৫৩ নম্বর আয়াতেও আল্লাহ একই রকম নির্দেশনা দিয়েছেন। এখানে নামাজের উপকারীতা লক্ষ্য করুন। এটা এমন এক সার্বজনীন এবাদত যার সাহায্যে যে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহর সাহায্যের আবেদন করা যায়। এতে কোন Restriction রাখা হয় নি। ছেলে অসুস্থ, নামাজে দাড়িয়ে যান। নাতি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, নামাজে আল্লাহর সাহায্য চান। সফরে যাবার আগে দুই রাকাত নামাজ পড়েন নিরাপত্তার জন্য। ফিরে এসে আবার দুই রাকাত পড়েন শুকরিয়া হিসাবে। এমন কোন বিষয় নেই যেটা নামাজের মাধ্যমে আল্লাহকে বলা যাবে না। তাই এটাকে আমি এক সার্বজনীন এবাদত বলি। এই নামাজকে যারা বিভিন্ন ছুতায় বিদআত বলতে চায় তাদের থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে।

وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ

তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর । অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব। (২:৪৫)

১৯

মদীনার ইহুদীদের continuous বিরোধীতার মুখে আল্লাহ আবার তাদের সম্বোধন করেন এবং তার অগনিত অনুগ্রহের কথা তাদেরকে স্মরন করিয়ে দেন। কি কি অনুগ্রহ আল্লাহ তাদের প্রতি করেছেন তার বিস্তৃত বর্ননা আল্লাহ পরবর্ত্তী আয়াতগুলিতে দিয়েছেন। ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা করা থেকে আরম্ভ করে, দাউদ আঃ এর রাজত্ব কায়েম পর্য্যন্ত আল্লাহর অনুগ্রহের সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত ছিল বিশ্বে সবার উপরে আল্লাহ তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন। ধনে- জনে, জ্ঞানে-গুনে, তারা বিশ্বে অদ্বিতীয় ছিল। তারা ছিল কেতাবধারী, শিক্ষিত জ্ঞানী, বিজ্ঞানে গবেষনায় অতুলনীয়। বর্ত্তমান বিশ্বেও কিন্তু ইহুদীরা সেই ধারা অব্যাহত রেখেছে। বিশ্বের অর্থনীতি তারা control করছে, সমস্ত মিডিয়ার নেতৃত্বে তারা, নবেলজয়ী বিজ্ঞানীর সংখ্যাও তাদের মধ্যে বেশী। কিন্তু এতকিছুর পরেও তারা গত ২০০০ বছর রাষ্ট্র-হারা ছিল। মাত্র সেদিন ১৯৪৮ সাল থেকে তারা ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে, তাও বিশ্বের খৃষ্টান রাষ্ট্রগুলির সহায়তায়। কেন এই বিপর্য্যয়? এর একমাত্র কারন তারা ইমান হারা হয়ে গেছে, আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদাগুলি তারা একের পর এক ভেঙ্গে চলেছে। নবীদের মারফত আল্লাহ তাদের বার বার সাবধান করে দিয়েছেন। শেষ সাবধান বানী ছিল মদীনার রাসুলের মারফত। কিন্তু জেনে শুনেই তারা সেই সুযোগ হাতছাড়া করেছে। এখন তারা অপেক্ষা করছে আল্লাহর শেষ আঘাত আসার অপেক্ষায়।

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

হে বনী-ইসরাঈলগণ! তোমরা স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা, যা আমি তোমাদের উপর করেছি এবং (স্মরণ কর) সে বিষয়টি যে, আমি তোমাদেরকে মর্যাদা দান করেছি সমগ্র বিশ্বের উপর। (২:৪৭)

২০

মানুষ কতখানি নির্বোধ, আর উদ্ধত হলে আল্লাহর সরাসরি অনুগ্রহ ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার পরেও শিরকে নিমজ্জিত হতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরন ইহুদী জাতি। সেটাই আল্লাহ বর্ননা করেছেন নীচের আয়াতে। সবেমাত্র আল্লাহ ফেরাউনের কবল থেকে ইহুদীদের মুক্ত করেছেন, সাগরের বক্ষকে বিদির্ন করে তাদের পালানোর পথ তৈরী করে দিয়েছেন, ফেরাউন ও তার বাহিনীকে সাগরে নিমজ্জিত করেছেন। তারপরেই আল্লাহ মুসা আঃ কে ডাকলেন তুর পাহাড়ে, তাকে তৌরাত দেবার অভিপ্রায়ে। ৩০ দিন থাকার কথা ছিল তার। কিন্তু ৩০ দিনের কঠোর সাধনা ও রোজার পরেও মুসার হৃদয় তৌরাত গ্রহনের উপযুক্ত হলো না। তাই আরো ১০ দিন বাড়িয়ে ৪০ দিন করা হলো । কিন্তু এই সংকীর্ণ সময়ের মধ্যেই ইহুদীগন আল্লাহর শক্তিকে অবজ্ঞা করে বাছুর পুজায় লিপ্ত হলো। হারুন আঃ এর সমস্ত বাধা ও প্রতিবাদকে তারা উপেক্ষা করলো। মনে হলো তারা যেন হারুনকে হত্যাই করে ফেলবে। বাধ্য হয়ে হারুন আঃ নিরব রইলেন। ইহুদীগন বাছুরের মুর্তিটাকে ঘিরে নাচ গানে মেতে উঠলো, তাদের কাড়া নাকাড়ার আওয়াজ দুর থেকেও শোনা যাচ্ছিল। মুসা আঃ ফিরে এসেই তাদেরকে দিলেন এক কঠোর শাস্তি যা ছিল অতীব ভয়াবহ।

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ

আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখন্ডিত করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরআউনের লোকদিগকে অথচ তোমরা দেখছিলে। আর যখন আমি মূসার সাথে ওয়াদা করেছি চল্লিশ রাত্রির অতঃপর তোমরা গোবৎস বানিয়ে নিয়েছ মূসার অনুপস্থিতিতে। বস্তুতঃ তোমরা ছিলে যালেম। (২ঃ৫০-৫১)

২১
আল্লাহ মুসা আঃ কে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তার সম্প্রদায় বাছুর পুজায় লিপ্ত হয়ে গেছে। বিপুল ক্রোধ আর কষ্ট নিয়ে মুসা আঃ ফিরে আসলেন শিবিরে। তারপর ঘোষনা দিলেন, কে আছ আমার পক্ষে বেরিয়ে আস। ১২টি গোত্রের মধ্যে লেবীয় গোত্রের সবাই এসে সমবেত হলো তার পিছনে। তাদেরকে অস্ত্রসজ্জিত করলেন তিনি। তারপর ঘোষনা দিলেন সেই কঠোর শাস্তির। আদেশ দিলেন, ক্যাম্পের যাকেই সামনে পাওয়া যাবে তাকেই হত্যা করতে হবে। হোক সে পিতা, ভাই, আত্মীয় বন্ধু অথবা যে কেউ। সন্ধা পর্য্যন্ত লেবীয় গোত্রের লোকেরা তান্ডব চালালো সমস্ত ক্যাম্প জুড়ে। বাইবেল বলেছে, সেদিন তিন হাজার ইসরাইলী নিহত হয়। এটাই ছিল তাদের পার্থিব শাস্তি। পরে আখিরাতের শাস্তি তো রয়েছেই। পরের দিন মুসা আঃ আবার ছুটলেন পাহাড়ের দিকে, অবশিষ্ট ইহুদীদের মাফ করিয়ে নেওয়ার জন্য। প্রত্যক্ষ নিদর্শন বা মোজেজা দেখার পরেও যদি কেউ তা অস্বীকার করে, তবে তাদের উপর কঠোর শাস্তি নেমে আসে। এটাই আল্লাহর বিধান। ইহুদীদের উপর যেমন অহরহ আল্লাহর অনুগ্রহ নেমে আসতো, তেমনি সামান্য ত্রুটির জন্যও আল্লাহর আজাব নেমে আসতো যখন তখন। তাই আমাদের রাসুল সাঃ কাফেরদের মাঝে কোন মোজেজা দেখাতে চাইতেন না। কারন যে কোন সময় তারা তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে, ফলে আজাব নেমে আসতে পারে তাদের উপর। তার বেশীরভাগ মোজেজা ছিল ইমানদারদের সাথে, তাদের সাহায্যের জন্য। কোন সফরে সাহাবীরা হয়তো পানির অভাবে অজু গোসল করতে পারছেন না, আল্লাহর রাসুল মোজেজার সাহায্যে পানির ব্যবস্থা করলেন। এই ধরনের মোজেজাই দেখাতেন আল্লাহর রাসুল। তিনি খেয়াল রাখতেন, যেন মোজেজা অস্বীকার করার কারনে কোন আজাব নেমে না আসে।

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদেরই ক্ষতিসাধন করেছ এই গোবৎস নির্মাণ করে। কাজেই এখন তওবা কর স্বীয় স্রষ্টার প্রতি এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের স্রষ্টার নিকট। তারপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হবেন। নিঃসন্দেহে তিনিই ক্ষমাকারী, অত্যন্ত মেহেরবান। (২:৫৪)

২২
পানি নাই। আল্লাহ মুসা আঃ কে লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত হানতে বললেন। ১২টি ধারা বেরিয়ে আসলো ১২টি গোত্রের জন্য। ঘর বাড়ী নাই, আল্লাহ মেঘের ছায়া দিয়ে সর্বক্ষন তাদেরকে তাপ থেকে বাচালেন। খাদ্য-খাবার নাই, মান্না সালওয়া নাজিল হতে থাকলো তাদের উপর। কিন্তু এই আসমানী খাবার খেতেও তারা বিরক্ত হয়ে উঠলো। কোন কৃতজ্ঞতাবোধ নেই তাদের। মুসার কাছে দাবী করলো তারা, শাক সবজী চাই তাদের, গম-মুসুর চাই, পিয়াজ রসুন চাই। আসমানী খাবারকে তাচ্ছিল্য করে দুনিয়ার নিকৃষ্ট বস্তুকে চাইলো তারা। আল্লাহ বললেন,"এ সবই পাবে তোমরা যদি কোন শহরে প্রবেশ করো। সেখানে সবই আছে তোমাদের জন্য।" শহরে প্রবেশ করার সময়েও তারা চরম অবাধ্যতার পরিচয় দিলো। আল্লাহ বললেন, নত-মস্তকে প্রবেশ কর। তারা আগে পা দিয়ে পাছা হিছড়াতে হিছড়াতে প্রবেশ করলো। আল্লাহ বললেন, ক্ষমা চাইতে চাইতে প্রবেশ করো। তারা গম চাই, রুটি চাই বলতে বলতে প্রবেশ করলো। এমনই এক উদ্ধত জাতী এই ইহুদীগন। তারা ধরেই নিয়েছে, তাদেরকে সর্বাবস্থায় সাহায্য করা মুসার ও তার আল্লাহর দায়ীত্ব। কিন্তু তাদের এই প্রকাশ্য অবাধ্যতার জন্য

আল্লাহ তাদেরকে চরম শাস্তি দিয়েছেন। শহরে ঢোকার পরে তারা নানা রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, চরম দারিদ্রতা তাদেরকে ঘিরে ধরে।

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ

আর তোমরা যখন বললে, হে মূসা, আমরা একই ধরনের খাদ্য-দ্রব্যে কখনও ধৈর্য্যধারণ করব না। কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আমাদের পক্ষে প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্যে এমন বস্তুসামগ্রী দান করেন যা জমিতে উৎপন্ন হয়, তরকারী, কাকড়ী, গম, মসুরি, পেঁয়াজ প্রভৃতি। মূসা (আঃ) বললেন, তোমরা কি এমন বস্তু নিতে চাও যা নিকৃষ্ট সে বস্তুর পরিবর্তে যা উত্তম? তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও, তাহলেই পাবে যা তোমরা কামনা করছ। আর তাদের উপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। এমন হলো এ জন্য যে, তারা আল্লাহর বিধি বিধান মানতো না এবং নবীগনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান সীমালংঘকারী। (২:৬১)

২৩

ঠিক একই আয়াত সুরাহ মায়েদার ৬৯ নম্বর আয়াতে এসেছে, হুবহু এক। এই আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়েও আলেমদের মাঝে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। অনেকে বলেন, এই আয়াত অনুসারে যে কোন ধর্মের লোকই মুক্তি পাবে যদি সে এক আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, অন্য ধর্মে থেকে কি এক আল্লাহতে বিশ্বাস রাখা সম্ভব? পৃথিবীর যে কোন ধর্মকে উদাহরণ হিসাবে নিতে পারেন। খৃস্টানরা তিন খোদাকে গ্রহণ করেছে। হিন্দুদের হাজার হাজার দেবতা। বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধের সোনার মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করে। পরিশুদ্ধ একত্ববাদ পেতে হলে আপনাকে ইসলামে আসতেই হবে। তাই আল্লাহ সুরাহ আলে ইমরানের ১৯ নম্বর আয়াতে ঘোষণা দিয়েছেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট দ্বীন একমাত্র ইসলাম"। আলে ইমরানের ৮৫ নম্বর আয়াতেও একই কথার প্রতিধ্বনি করা হয়েছে। এর আগের আয়াতেও আল্লাহ আহলে কিতাবীদের কোরআনে বিশ্বাস করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই মুক্তি পেতে হলে সবাইকে ইসলামে ফিরে আসতেই হবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, ছাবেয়ী বা খ্রীষ্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (২ঃ৬২)

২৪

আপনি কি ডারউইন তত্ত্ব বিশ্বাস করেন? আপনি কি মনে করেন যে মানুষ বানর থেকে এসেছে অথবা আমাদের পূর্বপুরুষ বানর ছিল? আল্লাহ তা'লা এ বিষয়ে যে ঘোষনাটি দেন তা একেবারেই আলাদা। আসলে মানুষের উৎপত্তি বানর থেকে নয়। মানুষ মানুষ থেকেই । বরং কিছু লোক আল্লাহর নির্দেশ মান্য না করায় তিনি তাদেরকে বানরে রূপান্তরিত করেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও

ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বকে সত্য বলে মনে করেন না। বানর কখনই বিবর্তিত হয়ে মানুষ হতে পারে না। পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী বানরকে যদি একজন পাগল মানুষের সাথেও তুলনা করেন, দেখবেন যে পাগল মানুষটি ঐ বানর থেকে হাজার গুনে উত্তম। তাছাড়া মানব সভ্যতার হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে এরকম কোন উদাহরণ নাই যেখানে একটি বানর মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করুন, মানুষের ক্রোমোজম সংখ্যা ৪৬। সেখানে বানরের ক্রোমোজম সংখ্যা মাত্র ৪২। সুতরাং দুর্ঘটনাক্রমেও বানরের মানুষ হবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। তবে কোন কারনে যদি মায়ের পেটে বেড়ে উঠা বাচ্চার ক্রোমোজম ৪৫ হয়ে যায়, তবে সেক্ষেত্রে ডাউন সিন্ড্রোম বেবির জন্ম হতে পারে। আল্লাহ যেসব মানুষকে অবাধ্যতার জন্য বানরে রূপান্তরিত করেছিলেন, হয়তো তাদের এমন রোগ দিয়েছিলেন যাতে তাদের রক্তে ক্রোমোজম কমে গিয়ে ৪২ হয়ে যায় আর তারা বানরে রুপ নেয়। তবে বিজ্ঞানীরা বলেন, আরশোলা কোটি কোটি বছর ধরে এই পৃথিবীতে বসবাস করছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের এতটুকু পরিবর্তন হয় নাই। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ
فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

তোমরা তাদেরকে ভাল রূপে জেনেছ, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লংঘণ করেছিল। আমি বলেছিলাম: তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। অত:পর আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ ভীরুদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপাদান করে দিয়েছি। (২ঃ৬৫-৬৬)

২৫

অকারনে নানা রকম প্রশ্ন করার অভ্যাস ছিল ইহুদীদের। এর ফলে অতি সহজ এক কাজ অতিশয় জটিল হয়ে পড়তো। ইহুদীদের মাঝে এক হত্যার ঘটনা ঘটে। হত্যাকারীকে খুজে বের করার জন্য আল্লাহ তাদের একটি গরু জবাই করার নির্দেশ দেন। গরুর মাংস দিয়ে মৃতদেহকে স্পর্শ করলেই সে জীবিত হয়ে হত্যাকারীর নাম বলে দেবে। অতি সহজ একটি কাজ। কিন্তু গরু সম্বন্ধে একের পর এক প্রশ্ন করে তারা মুসাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো। কি রকম গরু, বয়স কত, গরুর রং কি, চাষের গরু কিনা, পানি সেচের গরু কিনা, ইত্যাকার নানা ধরনের প্রশ্নের পর যে উত্তর পাওয়া গেল তাতে সেই ধরনের গরু খুজে পাওয়াই মুশকিল হয়ে পড়লো। ফলে অনেক খোজাখুজি করে বিপুল টাকা খরচ করে একটা গরু সংগ্রহ করা সম্ভব হলো। অথচ প্রথম নির্দেশের সাথে সাথেই তারা যে কোন একটা গরু জবেহ করলেই কাজ হতো। এই কারনেই রাসুল সাঃ সাহাবীদের নিষেধ করে দিয়েছিলেন যাতে তারা দ্বীনের ব্যাপারে খুটিনাটি প্রশ্ন না করেন। এতে দ্বীন পালন করা আরও কঠিন হয়ে পড়বে। রাসুল কোন বিধান দিলে সেটা Clarify করার জন্য সাহাবীরা কোন প্রশ্ন করতেন না। যে যেভাবে বুঝতেন, সেভাবেই সেটা পালন করতেন। একবার রাসুল বললেন, অমুক স্থানে পৌছে মাগরিবের নামাজ পড়বে। কেউ ভাবলেন, আমাদের দ্রুততার সাথে যেতে হবে যাতে মাগরেবের আগেই সেখানে পৌছাতে পারি। অন্য দল ভাবলেন, যত দেরীই হোক না কেন আমরা মাগরিব ওখানে পৌছেই পড়বো। পথেই মাগরিবের সময় হলো। এক দল নামাজ পড়ে নিলেন। অন্য দল গন্তব্যে না পৌছা পর্য্যন্ত নামাজ পড়লেন না। পরে রাসুল দুই দলকেই সঠিক বলে ঘোষনা দিয়েছিলেন।

قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ
قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ
قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَاء اللّهُ لَمُهْتَدُونَ

তারা বলল, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন সেটির রূপ বিশ্লেষণ করা হয়। মূসা (আঃ) বললেন, তিনি বলছেন, সেটা হবে একটা গাভী, যা বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়- বার্ধক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সের। এখন আদিষ্ট কাজ করে ফেল। তারা বলল, তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যে, তার রঙ কিরূপ হবে? মূসা (আঃ) বললেন, তিনি বলেছেন যে, গাঢ় পীতবর্ণের গাভী-যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে। তারা বলল, আপনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন-তিনি বলে দিন যে, সেটা কিরূপ? কেননা, সকল গরু আমাদের কাছে একই রকম মনে হয়। ইনশাআল্লাহ এবার আমরা অবশ্যই পথপ্রাপ্ত হব। মূসা (আঃ) বললেন, তিনি বলেন যে, এ গাভী ভূকর্ষণ ও জল সেচনের শ্রমে অভ্যস্ত নয়- হবে নিষ্কলঙ্ক, নিখুঁত। (২:৬৮-৬৯-৭০)

২৬

ইহুদী আলেমগনের আরও একটা অভ্যাস ছিল যে তারা নিজেরাই কিছু একটা রচনা করে প্রচার করতো যে এটা আল্লাহ থেকে এসেছে। সেগুলি তারা জিহবা বাকা করে এমনভাবে উচ্চারন করতো যেন মনে হতো যে সত্যিই এগুলি আল্লাহর বানী। আর নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এই সব বানী ব্যবহার করে ফতওয়া দিতো তারা। এই কারনেই আজ বোঝার কোন উপায় নেই যে তৌরাত-ইনজিলে কোনটা আল্লাহর বানী আর কোনটা মানুষের রচনা। আল্লাহ বলেন, কঠোর শাস্তি রয়েছে এই সব রচনাকারীদের জন্য। হাদিসে এসেছে, জাহান্নামের ওয়াইল উপত্যকায় থাকবে এই সব লোকেরা। ইহুদীদের আর একটা দাবী যে তারা জাহান্নামে গেলেও খুবই অল্প সময়ের জন্য তারা সেখানে থাকবে। কেউ কেউ বলে, ৪০ দিন তারা বাছুর পুজা করেছে, তাই মাত্র ৪০দিন তারা জাহান্নামে থাকবে। আল্লাহ বলেন, এ সবই তাদের মনগড়া উক্তি। এর পক্ষে তারা কোন দলীল দেখাতে পারবে না। তৌরাত- ইনজিলে এই ধরনের কোন অঙ্গীকার আল্লাহ করেন নি। আর এই সব মনগড়া বানীর কারনেই তারা দিন দিন আরো উদ্ধত হয়ে উঠছে। উদাহরণ দেখুন একটা। সুদ গ্রহন ইসলামে যেমন হারাম, তেমনি ইহুদীদের জন্যও হারাম। কিন্তু তাদের মাঝে একটা মিথ্যা বানী প্রচলিত আছে যে অন্য ধর্মের লোকের কাছ থেকে চড়া হারে সুদ নেওয়া যাবে। তাই দেখা গেছে, মধ্য যুগে সুদী কারবারে ইউরোপে ইহুদীদের প্রচন্ড দাপট ছিল। নাটক নভেলেও তাদের দুস্কৃতির কথা উঠে এসেছে বহুবার। এই ভাবেই তারা হারামকে হালাল করে নিয়েছে মিথ্যা ফতওয়া দিয়ে।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে। তারা বলেঃ আগুন আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করবে না; কিন্তু গুনাগুনতি কয়েকদিন ছাড়া। বলে দিনঃ তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোন অঙ্গীকার পেয়েছ যা আল্লাহ কখনও খেলাফ করবেন না; নাকি তোমরা যা জান না তা আল্লাহর সাথে জুড়ে দিচ্ছ। (২:৭৯-৮০)

২৭

কেউ যদি একটা পাপ করে তবে তার অন্তরে একটা দাগ পড়ে যায়। যদি সে তওবা করে এবং ঐ পাপ থেকে ফিরে আসে তবে সেই দাগটি মুছে যায়। কিন্তু যদি তওবা না করে সে ঐ পাপটি আবার করে তবে আর একটি দাগ পড়ে। এই ভাবে সমস্ত অন্তরটি পাপে সমাচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন পাপ করতেই তার মজা লাগে। তাই আল্লাহ বলেন, উদ্ধত ভাবে পাপের পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। যে ইচ্ছাকৃত ভাবে এবং পূন: পূন: পাপ কাজ করতে থাকবে, সে তার নিজের পাপেই নিমজ্জিত হয়ে দোজখে প্রবেশ করবে।

بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

হাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে, তারাই দোযখের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে। (২ঃ৮১)

২৮

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, ইহুদী খৃষ্টানগন এই রাসুলকে এমনভাবে চিনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চিনে। অর্থ্যাৎ তৌরাত ও ইনজিলে শেষ নবী সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা এসেছে। বাইবেলে ইসা আঃ বলেছেন- আমাকে যেতে দাও, আমি না গেলে তিনি আসবেন না। আর তিনিই তোমাদের সব কিছু শিক্ষা দিবেন। John 14:26 "But the Comforter, [which is] the Spirit of Truth, whom the God will send , He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you." তৌরাতে আল্লাহ মুসাকে বলেছেন-- Deuteronomy 18:18 God said to Moses –" I will raise a Prophet like you for them from their brethren & I will give my words to his mouth & whatever I order him, he will pass on to them all." । তাই খৃষ্টান ও ইহুদীগন শেষ নবীর আগমনের প্রতিক্ষায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তাদের একটা বদ্ধমূল ধারনা ছিল যে এই নবী বনী ইসরাইলদের মধ্য থেকেই আসবে। ইসমাইল আঃ এর বংশধর থেকেও যে এক নবী আসতে পারে, তারা এটা কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু তৌরাতে স্পষ্টভাবেই বলা ছিল- তিনি তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আসবেন। তাই যখন শেষ নবী মদীনায় হিজরত করে আসলেন, তখন মদীনার ইহুদী আলেমগন স্পষ্টত:ই বুঝতে পারলেন যে ইনিই তৌরাতে ও ইনজিলে বর্নিত শেষ নবী। ইহুদীগনের Ego তে তখন বিরাট এক ধাক্কা লাগলো। কেন এই নবী অন্য গোত্র থেকে আসলেন, কেন তিনি বনী ইসরাইল থেকে হলেন না? এটা তারা কোনমতেই মেনে নিতে পারছিল না। তাদের এই উদ্ধত্য ও হটকারীতার জন্যই তারা অন্তর থেকে এই নবীকে গ্রহন করতে পারলো না। অধিকাংশ ইহুদীগন আল্লাহর কোরআনকে অস্বীকার করে বসলো। কেউ কেউ নামমাত্র ইমান এনে মোনাফিক হয়ে গেলো। খুবই অল্পসংখ্যক ইহুদী সত্যিকারভাবে ইমাম আনলেন। আল্লাহ বলেন, এটা সম্পূর্নভাবেই আল্লাহর ইচ্ছা ও এখতিয়ার, কাকে তিনি নবুওয়াত দিয়ে অনুগ্রহ করবেন। আমাদের নবীকে অস্বীকার করে ইহুদীগন আর একবার আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হলো।

وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أَنَزَلَ اللهُ بَغْياً أَن يُنَزِّلُ اللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ فَبَآؤُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ

যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছাল, যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা যা পূর্বে করত। অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌঁছল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। অতএব, অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে, তা খুবই মন্দ; যেহেতু তারা আল্লাহ যা নযিল করেছেন, তা অস্বীকার করেছে এই হঠকারিতার দরুন যে, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ নাযিল করেন। অতএব, তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (২:৮৯-৯০)

২৯

ইহুদীরা দাবী করে যে, তারা আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় জাতি, তারাই কেবল বেহেশতে যাবে। আল্লাহ তা'লা তাদের এই দাবীকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যে, তারা যদি বেহেশতে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে- তাহলে কেন তারা আশু মৃত্যু কামনা (মুবাহালা) করে না? কিন্তু তারা কখনোই মৃত্যুকে চাইবে না, কারণ তারা জানে যে তাদের ঐ দাবী একেবারেই ভিত্তিহীন। রাসুল মদিনার ইহুদীদের মুবাহালা করার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু তারা আসবো বলেও পিছিয়ে যায়। আসলে তারা কখনই মৃত্যুকে কামনা করবে না। এই প্রসঙ্গে অনেকে হয়তো জানতে চাইবেন মুবাহালা কি? শরীয়তের পরিভাষায় বলা যায় যে, যখন দু'জন ব্যক্তি নিজের বক্তব্যকেই সঠিক ও অপরের বক্তব্যকে মিথ্যা বলে দাবি করে তখন তারা প্রকাশ্যে আল্লাহর গযব কামনা করতে পারে এই বলে যে,হে আল্লাহ আমি বা আমরা যদি সৎ পথের পরিবর্তে মিথ্যার দাবীতে অটল থাকি তাহলে আমার বা আমাদের ধ্বংস ও গজবের মাধ্যমে শেষ করে দিন, মূলত এটাই মুবাহালা। ইহুদীরা দাবী করত তারা সর্বশ্রেষ্ঠ ও জান্নাতের একমাত্র হকদার । তারা এসব অদ্ভুত কথা বলে রাসূল সাঃ এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করত। আর এ অবস্থায় রাসূল সাঃ আল্লাহর নির্দেশে তাদেরকে মুবাহালার প্রস্তাব করেন। কিন্তু অভিশপ্ত ইহুদীরা নাসারারা এ প্রস্তাবে কোনভাবেই রাজি হয়নি। আসলে তারা কখনই মরতে চায় না। এর পরের আয়াতেই এসেছে বরং তারা হাজার বছর বাচতে চায়।

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِندَ اللهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

বলে দিন, যদি আখেরাতের বাসস্থান আল্লাহর কাছে একমাত্র তোমাদের জন্যই বরাদ্দ হয়ে থাকে- অন্য লোকদের বাদ দিয়ে, তবে মৃত্যু কামনা কর, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক। কস্মিন কালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না ঐ সব গোনাহর কারণে, যা তাদের হাত পাঠিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ গোনাহ্গারদের সমপর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।(২ঃ৯৪-৯৫)

৩০

আপনি কী জানেন এ পৃথিবীতে হাজার বছর ধরে কারা বাঁচতে চায়? তারা ইহুদী এবং মুশরিকগন। । তারা পার্থিব জীবনের জন্য লালায়িত এবং তারা কেবল পার্থিব জীবন নিয়েই কাজ করে চলেছে। তাদের এই আসক্তি মেটাতে হাজার হাজার বছরের প্রয়োজন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'লা ঘোষনা করেছেন যে, তারা যদি হাজার বছরের জীবনও পায় তবুও তা তাদেরকে দোজখে প্রবেশ করা থেকে

বাঁচাতে পারবে না। কারন তারা খারাপ আমলের অধিকারী। তাই মদীনার ইহুদীরা রাসুলের আহ্বানে মুবাহালা করতে এগিয়ে আসে নি। এ বিষয়ে ইহুদীদের প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ-

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে , এমন কি মুশরিকদের চাইতেও অধিক লোভী দেখবেন। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন হাজার বছর আয়ু পায়। অথচ এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ দেখেন যা কিছু তারা করে।
(২ঃ৯৬)

৩১
সমস্ত নবী-রাসুলগনকে কিছু না কিছু মোজেজা আল্লাহ দান করেছিলেন যা ছিল নবুওয়াতের প্রমান স্বরূপ। কিন্তু অবিশ্বাসীরা সেটা তো বিশ্বাস করতোই না, বরং তারা উল্টো প্রচার করতো যে এগুলি যাদু। আসলে যাদুবিদ্যা কি, সেটা ভালো ভাবে বোঝানোর জন্য আল্লাহ বাবেল শহরে হারুত মারুত নামে দুই ফেরেশতা নাজিল করেন। তারা বিভিন্ন যাদু দেখাতেন মানুষকে এবং বোঝাতেন যে মোজেজা ও যাদু সম্পূর্ণ আলাদা। মোজেজাকে যাদু বলে তোমরা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করো না। মানুষেরা যাদু শিখতে আগ্রহ দেখালে ফেরেশতাগন এই শর্তে শিক্ষা দিতেন যে তারা যেন কখনই এই যাদু মানুষের উপর প্রয়োগ না করে। অন্যথায় তারা কাফের হয়ে যাবে। ইহুদীগন যখন বাবেলে বন্দী জীবন কাটাচ্ছিলো, তখনই সম্ভবত: তারা এই সব যাদুবিদ্যার সংস্পর্শে আসে। তারা এগুলি শিক্ষা করে এবং ব্যাপকভাবে এর অপব্যবহার করতে থাকে। তৌরাতকে পিছনে ফেলে তারা এই যাদুবিদ্যার চর্চায় মেতে উঠে। এমনকি অনেকে সুলায়মান আঃ কে অপবাদ দিতে থাকে যে তিনি যাদুবিদ্যার সাহায্যে জ্বিনদের বশ করতেন এবং রাজ্য চালাতেন। আল্লাহ এই অপবাদকে সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন নীচের আয়াতে। আমরা জানি যে রাসুলের সময়ও মদীনার ইহুদীরা এই সব যাদুর প্রয়োগে লোকদের ক্ষতি করতো। রাসুল নিজেও যাদু দ্বারা রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। পরে সুরা ফালাক ও নাস প্রয়োগে তিনি ঐ যাদু থেকে মুক্তি পান। আল্লাহ বলেন, তারা আল্লাহর অবতীর্ণ কোরআনকে গ্রহণ না করে যাদুবিদ্যার কাছে নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করে দিয়েছে। এখানে উল্লেক্ষ্য যে, ইসলামে যাদুবিদ্যাকে কুফরী বলে ঘোষনা করা হয়েছে। যে কোন যাদু শিক্ষা করা এবং তা প্রয়োগে লোকের ক্ষতি করা সম্পুর্ন হারাম।

وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ

তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা

ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত। (২:১০২)

৩২

ইহুদীরা মনে করতো, তৌরাতে যে সব বিধান আল্লাহ নাজিল করেছেন, সেগুলির কার্য্যকারীতা কখনও রহিত হতে পারে না। মুসলমানদের মধ্যেও একটি দল আছে যারা মনে করেন যে কোরআনের কোন আয়াতের কার্য্যকারীতা রহিত হতে পারে না। মদের উপর পর্য্যায়ক্রমে তিনটি আয়াত এসেছে। তারা বলেন, তিনটি আয়াতই কার্য্যকর। অর্থ্যাৎ এখনও মদ খাওয়া যাবে, তবে মদ খেয়ে নামাজে দাড়ানো যাবে না। রোজার উপরেও আছে দুধরনের আয়াত। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, সবল ব্যক্তিরাও ফিদইয়ার বিনিময়ে রোজা পরিত্যাগ করতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতে সুস্থ সবাইকে রোজা করতে বলা হয়েছে। অনেকে আছেন, তারা রোজার পরিবর্তে ফিদইয়া দেওয়ার পক্ষপাতী। নীচের আয়াতে বিষয়টাকে আল্লাহ সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যে কোন সময় যে কোন পুরানো বিধানকে বাতিল করে দিতে পারেন। কোন সময় পুরানো বিধানকে Modify করতে পারেন। আবার কোন সময় সম্পুর্ন নতুন এক বিধান জারী করতে পারেন। আর এগুলি সবই করা হয় রাসুলদের মাধ্যমে। নতুন রাসুল আগেকার রাসুলের বিধানগুলিকে Modify বা বাতিল করতে পারেন, আবার কোন নতুন বিধানও চালু করতে পারেন। তবে সর্বশেষ যে বিধান চালু হয়েছে, সেটাই আল্লাহর কাছে গ্রহন যোগ্য। একই রাসুলের মেয়াদকালের মধ্যেও কোন বিধান কয়েকবার Modify হতে পারে। যেমন, কোরআনে মদের ব্যাপারে হয়েছে। তবে সেখানেও সর্বশেষ নাজিলকৃত আয়াতটিই গ্রহনযোগ্য হবে। তাই মদকে হালাল বলার কোন Scope এখন নাই। আবার সুস্থ মানুষের রোজা না করে ফিদইয়া দিলেও চলবে না। সুরাহ বাকারার ১৮০ নম্বর আয়াতে মৃত্যুর সময় ধন সম্পদ বিতরণের জন্য অসিয়ত করে যেতে বলা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কালে সম্পদ বিতরণের দায়ীত্ব আল্লাহ নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন সুরাহ নিসার ১১ ও ১২ নম্বর আয়াত দ্বারা। তাই আসুন, আমরা সর্বশেষ গ্রন্থ কোরআনকে মেনে নিই, আর এতে যে সর্বশেষ বিধানগুলি রয়েছে তা মেনে নিই।

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান? (২:১০৬)

৩৩

১৫০০ বছর পূর্বে রসুলল্লাহ (ছ:) এর সময় থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত ইহুদি খৃস্টানদের একই প্রচেস্টা, কিভাবে তারা মুসলিমদের ইমান-হারা করবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে তারা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে । মুসলমানদের মধ্যে তারা বিভিন্ন দল উপদল ঢুকিয়ে দিয়েছে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশে । বাইবেলকে তারা ইসলামী পরিভাষায় অনুবাদ করে নাম দিয়েছে 'ইনজিল শরীফ' , আল-কিতাব, কিতাবুল মুকাদ্দাস ইত্যাদী ইত্যাদী। এসবই মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য। আমি একজনের বাসায় কিতাবুল মুকাদ্দাস দেখলাম। তিনি জানেনই না যে এটা বাইবেলের অনুবাদ। আজকাল মুষ্টিমেয় কিছু লোকের আবির্ভাব হয়েছে। তারা খৃস্টানদের আদলে সকাল সন্ধ্যায় দুইবার প্রার্থনা করে, যে কোন এক দিকে দাড়িয়ে, তাতে রুকু সেজদা নাই। তারা বলে কোরআন থেকে তারা এই নামাজের আবিষ্কার করেছে। একদল প্রচার করে চলেছে, মুহাম্মদ সাঃ শ্রেষ্ট নবী নহেন। আর এক

দল আমাদের কলেমা থেকে 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' অংশটি বাদ দিতে চায়। এছাড়া হাদিস অস্বীকারকারীদের একটা বড় দল বাংলাদেশে কাজ করছে। তারা জানে, লোকজনকে হাদিস বিমুখ করতে পারলেই ইসলামী শরিয়তকে বিনষ্ট করা যাবে। আমাদের সবাইকে এদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে এবং সাধারন মুসলিমদের এইসব ফিতনা থেকে রক্ষা করতে হবে। আল্লাহ তা'লা যতক্ষন পর্যন্ত না এইসব ফিত্নাবাজদের ভাগ্য নির্ধারন করেন, ততক্ষন পর্যন্ত তাদেরকে উপেক্ষা করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশতঃ চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোন রকমে কাফের বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তারা এটা চায়)। যাক তোমরা আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।।(২ঃ১০৯)

৩৪

আমেরিকায় যাবেন, সেখানে খরচের জন্য আপনার ডলার একাউন্টে কিছু জমিয়েছেন কি? সেখানে টাকা চলবে না। আবার যখন আখিরাতে যাবেন, সেখানে ডলার চলবে না, টাকাও চলবে না। সেখানের একমাত্র অবলম্বন হবে আপনার আমল। আপনি কী আপনার আখিরাতের স্থায়ী হিসাবে জমা করার জন্য কিছু প্রেরণ করেছেন? আপনার বর্তমানের সঞ্চয় আখেরাতে অচল, সে সঞ্চয় যদি নগদ ডলারে বা টাকায়ও হয়। তাই নিজে আখিরাতে পৌছানোর আগে আখিরাতের হিসাবে ভাল আমল জমা করার ব্যবস্থা করুন। সেখানে প্রতিটি ভাল আমলের জন্য বিশাল আকারে প্রতিদান পাবেন। আর ভাল আমল কোনগুলি, সেটাও আল্লাহ বলে দিয়েছেন নীচের আয়াতে। নামাজ পড়ুন আর জাকাত দিন। জাকাত বলতে এখানে ফরজ জাকাত ছাড়াও সব ধরনের সাদাকাহকে বোঝানো হয়েছে। সৎকর্মের আরো এক বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে এই সুরাহর ১৭৭ নম্বর আয়াতে। পরবর্তী সময়ে সেই আয়াতের আলোচনা সামনে আসবে।

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্যে পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহ্‌র কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা প্রত্যক্ষ করেন।(২ঃ১১০)

৩৫

হুদায়বিয়ার সন্ধির আগে পর্য্যন্ত মক্কার মুশরিকগন মদীনার কোন মুসলমানকে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে দিতো না। এমনকি তাদের ওমরাহ, তাওয়াফ বা হজ্জ করার অনুমতি ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ বলেন, তারাই সবচেয়ে বড় সীমা লংঘনকারী যারা মানুষকে মসজিদে যেতে বাধা দেয়, অথবা মসজিদ ধ্বংস করার প্রয়াস চালায়। এই ধরনের ঘটনা আগেও অনেক ঘটেছে, এখনও ঘটছে। এক সময় জেরুজালেমের মসজিদকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হয়েছিল।

বর্ত্তমানেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনা ঘটে। বাবরী মসজিদের কথা আমরা সবাই জানি। মসজিদে ঢুকে মুসল্লিদের উপর গোলাগুলির ঘটনাও ঘটেছে নিকট অতীতে। অথচ যারা মুশরিক, তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করাই সংগত নহে। মক্কা ও মদীনার মসজিদে অবিশ্বাসীদের ঢোকা নিষেধ করা হয়েছে। শুধুমাত্র প্রানভয়ে ভীত কোন অবিশ্বাসী জীবনের নিরাপত্তার জন্য মসজিদে আশ্রয় নিতে পারে। মসজিদ ভাঙ্গা এবং মসজিদে যেতে বাধা দেওয়া, আল্লাহ এই সব সীমালংঘনকারীদের জন্য চরম শাস্তির ঘোষনা দিয়েছেন। ইহকালে তারা লাঞ্চিত হবে, আর পরকালে রয়েছে এক মহা শাস্তি, অনন্ত কালের জন্য।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যে ব্যাক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করে, তার চাইতে বড় সীমালঙঘনকারী যালেম আর কে আছে? অথচ এদের পক্ষে মসজিদসমূহে প্রবেশ করা বিধেয় নয়, অবশ্য ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ছাড়া। ওদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। (২:১১৪)

৩৬

ইহুদী ও খৃষ্টানগন কখনই মুসলমানদের ভালবাসে না। তাদের একমাত্র প্রচেষ্টা মুসলমানদের ইমানহারা করে আবার ইহুদী খৃষ্টান বানানো। বর্ত্তমানে ইহুদীদের থেকে খৃষ্টানগন এই কাজে বেশী এগিয়ে রয়েছে। বিশ্বের আনাচে কানাচে তারা মানব সেবার নামে স্কুল-হাসপাতাল খুলে বসেছে। সেবার পিছনে তারা আসলে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে চলেছে। এমন সব বই পুস্তক তারা প্রকাশ করেছে যা দেখে মনে হবে সেগুলি ইসলামী বই। কিন্তু আসলে সেগুলি বাইবেলের অনুবাদ, ইসলামীক পরিভাষায়। পরিসংখ্যানে দেখ যায়, শত শত মুসলিম এই সব ছলচাতুরীর শিকার হয়েছে। ইসলামের নাম নিয়েই তারা খৃষ্টানী কায়দায় নানা ধরনের উপাসনা চালিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলে বলে, কোরআন থেকেই নাকি তারা এই সব পদ্ধতির আবিস্কার করেছে। খৃষ্টানদের মতই তারা দুই বেলা উপাসনা করে, দাড়িয়ে দাড়িয়ে। রুকু সেজদা নাই, কেবলা নাই। আবার তারা বলে, তারাই নাকি আসল মুসলিম। আল্লাহ বলেন, ইসলামই একমাত্র সত্য পথ। সেই সত্য জ্ঞান তোমাদের কাছে এসেছে। এর পরেও যদি তোমরা নিজের খেয়াল খুশী মতো চলো , তবে আল্লাহ তোমাদের বিপক্ষে দাড়িয়ে যাবেন। আর আল্লাহর বিপক্ষে কে তোমাদের বন্ধু হতে পারে, কে তোমাদের , সাহায্য করতে পারে? কেউ নয়; না ইহজগতে, না পরজগতে।

وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ

ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, তাই হল সরল পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই। (২:১২০)

৩৭
কঠিন কঠিন কিছু পরীক্ষা আল্লাহ দিয়েছিলেন ইব্রাহিম আঃ এর জন্য। মন্দিরে ঢুকে মুর্ত্তিগুলোকে ভাংচুরের অপরাধে মুশরিকরা তাকে বিশাল অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করলো। সেখানেও অটল ছিলেন তিনি। তারপর নিজের দেশ ছাড়তে হয় তাকে। অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য। মিশরের রাজদরবার হয়ে পরে এক সময় থিতু হলেন তিনি কেনানে। সেখানেও আল্লাহর পরীক্ষা। বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান ইসমাইলকে মা হাজেরা সহ মক্কার ধুসর প্রান্তরে নির্বাসিত করতে হলো আল্লাহর নির্দেশে। ইসমাইল আঃ বড় হয়ে উঠলেন মক্কাতে। তখনই আর এক কঠিন পরীক্ষা নেমে আসলো ইবরাহিম আঃ এর জীবনে। নিজের প্রিয় বস্তুকে কোরবানী করার নির্দেশ পেলেন তিনি স্বপ্নে, বার বার। শত শত উট কোরবানী দেওয়ার পরেও তিনি একই স্বপ্ন দেখতে থাকলেন প্রতি রাত্রে। তিনি বুঝলেন, উট কোরবানী করলে হবে না। এর চেয়েও প্রিয় বস্তু আমার একমাত্র সন্তান। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকেই চান। ইসমাইলকে কোরবানী করার প্রস্তুতি নিলেন ইবরাহিম আঃ। আল্লাহ ঘোষনা দিলেন, -ইবরাহিম, তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়েছ। আল্লাহ এতই খুশী হলেন যে তাকে নিজের বন্ধু বলে গ্রহন করলেন, তাকে খলিলুল্লাহ উপাধী দিলেন। আর তাকে মানব জাতীর নেতা হিসাবে মনোনয়ন দিলেন। শুধু তাই নয়, ইবরাহিম আ: এর প্রার্থনার জবাবে তার বংশধরদের মধ্য থেকে একের পর এক নবী- রাসুল পাঠিয়েছেন আল্লাহ। তবে আল্লাহ এই সাবধান বানীও উচ্চারন করলেন, সীমালংঘনকারীদের জন্য আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি প্রযোজ্য নহে।

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না। (২:১২৪)

৩৮
আল্লাহ কাবা ঘরকে বিশ্ব মানবতার এক মহা সম্মিলনস্থল বানিয়েছেন। ইবরাহিম আঃ তার ছেলে ইসমাইল আঃ কে সাথে নিয়ে কাবাঘর নির্মান কাজ সম্পন্ন করলেন। তখন আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিলেন, বিশ্বের সমস্ত মানুষকে হজ্জের জন্য আহবান জানাতে। ইবরাহিম আঃ হজ্জের ডাক দিলেন। সেই দিন থেকে প্রতি বছর বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত থেকে লাখ লাখ লোক হজ্জের জন্য কাবাগৃহের চারপাশে সমবেত হন। আর এটা চলতে থাকবে কেয়ামত পর্য্যন্ত। শুধু বাৎসরিক হজ্জ নহে, সারা বছরই এই গৃহ খোলা থাকে তওয়াফ ও ইহতেকাফকারীদের জন্য। প্রাথমিকভাবে এই ঘরের দেখাশুনার ভার ছিল ইসমাইল আঃ এর উপর। পরবর্ত্তীকালে পর্য্যাক্রমে তাদের বংশধরদের উপর এই ভার অর্পিত হয়। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ছাড়াও হাজীদের পানি খাওয়ানোও ছিল এক বিশেষ দায়ীত্ব। রাসুলের আমলে এই দায়ীত্ব ছিল কোরাইশ বংশের লোকদের উপর। এই ঘরের আর এক বৈশিষ্ট হলো, এটা একটা নিরাপত্তা স্থল। হারাম সীমানার ভিতরে কোন ধরনের হত্যা, রক্তপাত এমনকি গাছের পাতা ছেড়াও নিষেধ। পরম শত্রুকে সামনে পেয়েও এখানে প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না। সবাই নিরাপদ এখানে। কাবা ঘরের পূর্ব পাশেই মাকামে ইবরাহিম। যে পাথরের উপর দাড়িয়ে ইবরাহিম আঃ নির্মান কাজ করেছেন সেটাই এখানে রক্ষিত, একটা জাফরির ভিতরে। ইবরাহিম আঃ এর পায়ের ছাপ আছে এই পাথরে। এটার এক বৈশিষ্ট ছিল, এটা lift এর মত উঠানামা করতো বিভিন্ন

উচ্চতায়, নির্মান কার্য্যে সহায়তা করার জন্য। তাওয়াফের শেষে হাজী সাহেবেরা এর পিছনেই দুই রাকাত নামাজ পড়েন।

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

যখন আমি কা'বা গৃহকে মানুষের জন্যে সম্মিলন স্থল ও শান্তির আলয় করলাম, আর তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ। (২:১২৫)

৩৯
এর আগে আমরা ১২৪ নং আয়াতে দেখেছি, ইবরাহিম আঃ যখন তার বংশধরদের নেতা বানানোর আবেদন করেছিলেন, তখন আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে জালিমদের জন্য এই প্রতিশ্রুতি প্রযোজ্য নহে। পরবর্ত্তী দোয়া করার সময় ইবরাহিম আঃ এই কথাটি মাথায় রেখেছিলেন। মক্কা নগরীকে তিনি শান্তি ও নিরাপত্তার শহর বানানোর জন্য আবেদন করলেন এবং যারা বিশ্বাসী, শুধুমাত্র তাদের জন্য খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা করার জন্য প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ প্রথম আবেদনটি কবুল করলেন অবিকৃতভাবে। কিন্তু দ্বিতীয় আবেদনটি তিনি সংশোধন করে দিলেন। শুধু বিশ্বাসী নহে, মক্কার যারা অবিশ্বাসী কাফের, তাদের জন্যও তিনি খাবারের ব্যবস্থা করবেন। এখানে একটা সত্য আল্লাহ স্পষ্ট করে দিলেন। আল্লাহ তার সমস্ত সৃষ্টির জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করেন। এখানে বিশ্বাসী অবিশ্বাসীর ভেদাভেদ নাই, বংশ-গোত্রের কোন প্রাধান্য নাই, এমনকি পশু-প্রাণী, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা উদ্ভিদ, সবার জন্যই আল্লাহর রিজিক অবধারিত এবং অবারিত। কিন্তু এতে যেন বিশ্বাসী-মুমিনগন মর্মাহত না হন। কারন এই ব্যবস্থা তো খুবই ক্ষনস্থায়ী, শুধুমাত্র এই পৃথিবীর সংকীর্ণ জীবনের জন্য। আখিরাতের অনন্ত জীবনে অবিশ্বাসীদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ জাহান্নাম।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

যখন ইব্রাহীম বললেন, পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে তুমি শান্তিধাম কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা অল্লাহ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ফলের দ্বারা রিযিক দান কর। বললেনঃ যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরও কিছুদিন ফায়দা ভোগ করার সুযোগ দেব, অতঃপর তাদেরকে বলপ্রয়োগে দোযখের আযাবে ঠেলে দেবো; সেটা নিকৃষ্ট বাসস্থান। (২:১২৬)

৪০
ইবরাহিম আঃ এর শেষ প্রার্থনা ছিল তাদের বংশে এমন একজন রাসুলকে পাঠানো হোক যিনি ৪টি সুস্পষ্ট দায়ীত্ব পালন করবেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দিবেন, তাদেরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবেন, এবং পরিশেষে তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবেন। আল্লাহ ইবরাহিম আঃ এর এই প্রার্থনাও কবুল করেন এবং ইসমাইল আঃ

এর বংশে শেষ নবী ও রাসুল হিসাবে মুহাম্মদ (সঃ) কে প্রেরন করেন। হাদিসে আল্লাহর রাসুল নিজেই বলেছেন-" আমি আমাদের পিতা ইবরাহিম আঃ এর দোয়া, ইসা আঃ এর সুসংবাদ এবং আমার মায়ের স্বপ্ন।" ইবরাহিম আঃ এর দোয়া কবুলের সুসংবাদ আল্লাহ পরবর্ত্তী ১৫১ নম্বর আয়াতে দিয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্য করুন, ১৫১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাসুলের দায়ীত্বের Serial নম্বরগুলি পরিবর্ত্তন করে দিয়েছেন। সেখানে ২ নম্বরেই এসেছে পবিত্রকরন বা শুদ্ধিকরন। আল্লাহর আয়াতগুলি তেলাওয়াত করে শুনানোর পরেই রাসুল মানুষদের পরিশুদ্ধ বা পবিত্র করতে পারবেন। অর্থাৎ একজন মানুষকে আয়াৎ পাঠ করে শুনানো হলো এবং সে এই আয়াতের উপর ইমান আনার সাথে সাথেই তার আত্মা পরিশুদ্ধ হবার উপযুক্ত হয়ে গেল। পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে সে হয়তো সুযোগ ও সুবিধা মত গভীর ভাবে ব্যাখ্যা সহ কোরআনের জ্ঞান এবং অন্যান্য হিকমত শিক্ষা নিতে পারে। এটা তার উপরি অর্জন এবং এটা ইমানকে আরো দৃঢ় করবে। কিন্তু একজন নিরক্ষর খেটে খাওয়া মানুষও শুধুমাত্র কোরআন শুনে এবং তা বিশ্বাস করে পবিত্র জীবন অর্জন করতে পারে।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ

হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুণ যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন। এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। (২:১২৯)

৪১

বর্ত্তমানে একদল লোকের আবির্ভাব হয়েছে যারা এক কথায় প্রচলিত নিয়ম কানুনের পরিবর্ত্তন করে নতুন পদ্ধতির প্রচলন করতে চায়। তাদের মন্ত্র হচ্ছে, আমাদের পূর্ব পুরুষদের অনুসরন করা যাবে না। কোরআন হাদিস ঘেটে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিস্কার কর এবং সেগুলি অনুসরন কর। দীর্ঘ ১৫০০ বছর ধরে আমাদের পূর্বতন মনীষীরা কোরআন সুন্নাহ যেভাবে অনুসরন করেছেন, সেগুলিকে তারা নাকচ করে দিতে চায়। পূর্বপুরুষ শব্দটিই যেন তাদের কাছে মহা আপত্তিকর। তারা মনে করে, পূর্বপুরুষের সবাই ছিলেন জাহেল, মুর্খ ও অজ্ঞ। অথচ আল্লাহ নিজেই কোরআনে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষ ইবরাহিম ইসমাইল ও ইসহাকের ধর্মকে অনুসরন করো। ইউসুফ আঃ যখন মিশরের কারাগারে ছিলেন, সেখানেও তিনি বন্দীদের উপদেশ দিতেন পূর্বপুরুষ ইবরাহিম ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্মকে অনুসরন করার জন্য। সুতরাং পূর্বপুরুষের ধর্ম মানেই যে সেকেলে Obsolete প্রাচীন এক ধর্ম সেটা সত্য নহে। কোরআনে বার বার আল্লাহ বলেছেন ইবরাহিম আঃ এর ধর্মকে অনুসরন করার জন্য। সুতরাং পূর্বপুরুষদের অবজ্ঞা করা যাবে না, পূর্বতন মনীষীদের মতামতকে তুচ্ছ তাছিল্য করে ফেলে দেওয়া যাবে না। বহু বছরের গবেষনা ও অভিজ্ঞতার ফলে ইসলামের আজকের এই বিশাল তথ্য ভান্ডার গড়ে উঠেছে। এ সবের কোন কিছু যদি নাকচ করতে হয়, তবে তার জন্য অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হবে, বিশ্ব ব্যাপী ইসলামী স্কলারদের মতামত নিতে হবে, এবং পরিশেষে স্বীকৃত গ্রান্ড মুফতীদের মাধ্যমে সেটা কার্য্যকর করতে হবে। তা না হলে মুসলিম জাতীর মধ্যে নানা দল উপদলের সৃষ্টি হবে।

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَـهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদের বললঃ আমার পর তোমরা কার এবাদত করবে? তারা বললো, আমরা তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের এবাদত করব। তিনি একক উপাস্য। (২:১৩৩)

৪২

ইহুদীরা বলে, তারাই সত্য পথে আছে। আবার খৃষ্টানরাও বলে, তারাই সত্য। আল্লাহ বলেন, বরং তোমরা তোমাদের Root এ ফিরে আসো, তোমরা ইবরাহিমের ধর্মে ফিরে আসো। সত্যিই ইহুদী খৃস্টানরা এখন আর সত্য পথে নাই। ইহুদীরা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে অনেক আগেই। অনেক নবীকে তারা অস্বীকার করেছে, একের পর এক নবীদের হত্যা করেছে। তারা ইসা আঃ কে স্বীকার করেনি, শেষ নবীকে সত্য জেনেও প্রত্যাক্ষান করেছে। তারা কোন মতেই সত্যের উপর নেই। অন্যদিকে খৃষ্টানদের অবস্থা আরো খারাপ। পিতা ছাড়া জন্ম নেওয়া ইসা আঃ এর সম্মান বাচাতে যেয়ে তাকে তারা আল্লাহর আসনে বসিয়েছে। ইসা আঃ এসেছিলেন শেষ নবীর আগমনের পথ পরিস্কার করতে, শেষ নবীর আগমনের সুখবর দিতে। কিন্তু খৃষ্টানরা সেটার অপব্যাখ্যা করে প্রচার করে যে এই সুখবর Holy Ghost আগমনের। এখন থেকে Holy Ghost প্রতিটি খৃষ্টানের অন্তরে অবস্থান নেবে এবং তার সাথে দিনে রাতে কথা বলতে থাকবে। শয়তান এই ভাবে তাদেরকে এক মহা ভ্রান্তিতে ফেলে রেখেছে। এখন একমাত্র সত্য পথে তারাই রয়েছে যারা একনিষ্টভাবে ইবরাহিমের ধর্মকে অনুসরন করে। সহজ সরল ও শিরকমুক্ত এক ধর্ম এটা। আর আমরা মুসলিমগনই সেই সত্য পথের অধিকারী, আমরাই ইবরাহিমের ধর্মের উপর রয়েছি একনিষ্ট ভাবে।

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

তারা বলে, তোমরা ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যাও, তবেই সুপথ পাবে। আপনি বলুন, কখনই নয়; বরং আমরা ইব্রাহীমের ধর্মে আছি যাতে বক্রতা নেই। সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (২:১৩৫)

৪৩

আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তাঁর রঙে রঞ্জিত হতে বলেছেন। কিন্তু আল্লাহর রঙ কি, তা কি আমরা জানি। সেটা কি সাদা না সবুজ রঙ- যেমনটি আমরা মুসলীমরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি, অথবা এ রঙ কী সন্যাসীদের ব্যবহৃত ধূসর রঙ? অথবা এটি হিন্দু দেবতার ব্যবহৃত লাল রঙ? না, এসব কিছু নয়। এ রঙ হলো হৃদয়ের রঙ।আমাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'লার গুনাবলীতে রঞ্জিত করতে হবে। সে অনুযায়ী আমাদেরকে হতে হবে দয়ালু, ক্ষমাশীল, দানশীল, পরোপকারী, ধর্মপরায়ণ এবং আরো অনেক ভাল গুনসম্পন্ন। প্রকৃত পক্ষে এগুলোই আল্লাহ তালার রঙ।

صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ

আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে? আমরা তাঁরই এবাদত করি।(২ঃ১৩৮)

৪৪
বেশীর ভাগ অনুবাদ গ্রন্থে পবিত্র কোরআন' এর নীচের আয়াতটির অনুবাদে বলা হয়েছে যে আমরা মুসলিম জাতী সমস্ত মানব মণ্ডলীর জন্য 'সাক্ষ্যদাতা' এবং রাসুল আমাদের জন্য 'সাক্ষ্যদাতা'। সুরাহ হজ্জের ৭৮ নম্বর আয়াতেও (২২ঃ৭৮) এ ধরনের কথা রয়েছে। কিন্তু রাসুল কিভাবে অনাগত উম্মতের জন্য সাক্ষ্যদাতা হবেন, যাদের রাসুল কোনদিন দেখেন নাই? এটা ব্যখ্যা করতে যেয়ে অনেকে বিভিন্ন গল্পের অবতারনা করেছেন যা আমার কাছে সন্তোষ জনক মনে হয় নি। এর মাঝে জনাব আবু জাফর সাহেবের 'মহা নবীর মহা জীবন' গ্রন্থটি পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়। সেখানে তিনি রাসুল কে সাক্ষ্যদাতা না বলে তাকে আমাদের আদর্শ বা রোল মডেল বলে উল্লেখ করেছেন । অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা তাঁর রসূল (সাঃ) কে আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ বা রোল মডেল হিসাবে ঘোষনা করেছেন। সে অনুযায়ী রসুল (সাঃ) মুসলমানদের জন্য জীবন্ত উদাহরণ। আমরা সব কিছুর Reference নেব রাসুলের কাছ থেকে। আর মুসলিমরা বিশ্বের অন্যান্য জাতীর জন্য অনুকরণীয় আদর্শ বা রোল মডেল। অর্থাৎ বিশ্বের অন্যান্য জাতীরা সত্যের Reference নিবে মুসলিম জাতীর কাছ থেকে। ছোটকালে দেখেছি, পুকুর কাটার সময় পুকুরের মাঝখানে পিলারের মত কিছু মাটি না কেটে রেখে দেওয়া হত। জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, এগুলি সাক্ষী। কারন কত কিউবিক মাটি কাটা হলো তার হিসাব করার জন্য এগুলি থেকে উচ্চতার Reference নেওয়া হয়। তখন বুঝলাম, সাক্ষী মানেই কোর্টে হাকিমের সামনে দাড়াতে হবে এমন নয়। যা থেকে কোন সত্য জানার জন্য Reference নেওয়া হয় সেটাই আমাদের জন্য সাক্ষী। সেই হিসেবেই রাসুল আমাদের সাক্ষী এবং মুসলিম জাতী অন্য জাতীদের জন্য সাক্ষী, কারন আসল সত্য জানতে হলে ইসলামেই আসতে হবে। তাই আমাদের দায়ীত্ব হবে, পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে নিজেদের গড়ে তোলা যাতে আমরা অন্য জাতীর জন্য সাক্ষী হতে পারি। মহান আল্লাহ তা'লা আমাদের জন্য কত বড় এক দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেনঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষী হও মানবমন্ডলীর জন্যে এবং যাতে রসূল সাক্ষী হন তোমাদের জন্য। আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। নিশ্চিতই এটা কঠোরতর বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ, মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুনাময়। (২:১৪৩)

৪৫
জেরুজালেমের মসজিদ নির্মান করার পর সোলায়মন আঃ প্রার্থনা করেন, যেন তাদের জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেবলা নির্ধারন করা হয়। আল্লাহ সেটা কবুল করেন। ফলে ইহুদী ও খৃষ্টানদের জন্য নির্ধারিত কেবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। কিন্তু এর পরে আর কোন নির্দেশ না আসায় মদীনায় হিজরত করার পর মুসলমানেরা বায়তুল মাকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে থাকেন। এর ফলে মদীনার মুনাফিক ইহুদীদের অনেক সুবিধা হয়েছিল। তারা ইমান আনার ভান করে মুসলমানদের সাথে মিশে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তো। কিন্তু আল্লাহর রাসুল চাইতেন, মক্কার মসজিদুল হারামই মুমিনদের জন্য কেবলা হোক। বার বার তিনি আকাশের দিকে

মুখ তুলে চাইতেন, কখন আল্লাহর নির্দেশ আসবে সেই সুখবর নিয়ে। বহু প্রতিক্ষার পর এলো সেই সুদিন। আল্লাহর রাসুল মদীনার পশ্চিমের এক মসজিদে আসরের নামাজ পড়ছিলেন। অর্ধেক নামাজ শেষ। তখনই আল্লাহর নির্দেশ আসলো- তোমার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও। বাকী নামাজটুকু মক্কার দিকে মুখ ফিরিয়ে পড়লেন আল্লাহর রাসুল। এখনও মদীনায় আছে সেই মসজিদ। মসজিদুল কেবলাতাইন বলা হয় সেই মসজিদকে। দুই কেবলার মসজিদ। এই নির্দেশে মুমিনদের হৃদয় মহা আনন্দে নেচে উঠলো। আবার তারা তাদের প্রিয় শহরের দিকে মুখ ফিরাতে পারছে। কিন্তু মুশকিল হলো কপট ইহুদীদের। কিভাবে তারা জেরুজালেম থেকে মুখ ফিরিয়ে মক্কার দিকে ঘুরবে? অধিকাংশ ইহুদী আল্লাহর এই নির্দেশ অমান্য করে বুঝিয়ে দিলো যে তারা সত্যিকারের মুসলমান হয়নি, তারা ছিল মুনাফিক। কি সুন্দর ভাবে আল্লাহ মুনাফিক ইহুদীদের আলাদা করে ফেললেন মুমিনদের থেকে।

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর। যারা আহলে-কিতাব, তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ বেখবর নন, সে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে যা তারা করে। (২:১৪৪)

৪৬

আল্লাহ তা'লা ঘোষনা করেছেন যে, ইহুদী ও খৃষ্টানগণ এই রাসুল কে এমন ভাবে চিনে, যেমন তারা তাদের সন্তানদের চিনে। কিন্তু তাদের বিজ্ঞ পন্ডিতেরা সাধারণ লোকের কাছে তা গোপন করে রাখে। তারা বাইবেলের মুল বিষয়গুলি এমন ভাবে সম্পাদনা করেছে যাতে বাইবেলে পরবর্তী রসুল আগমনের কোন চিহ্ন না থাকে। তথাপি এখনও বর্তমান বাইবেলে রাসুল আগমনের অনেক নির্দেশনাই বিদ্যমান রয়ে গেছে। আমাদের উচিত সেগুলি খুজে বের করে খৃস্টান বন্ধুদের সামনে তুলে ধরা। বাইবেলের নীচের বাক্যটি দেখুন। এটা শুধমাত্র আমাদের রাসুলের জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে। Deuteronomy 18:18 God said to Moses –" I will raise a Prophet like you for them from their brethren & I will give my words to his mouth & whatever I order him, he will pass on to them all." এরকম আরো অনেক বাক্য রয়েছে বাইবেলে। ইসা আঃ বলেন, John 14:26 "But the Comforter, [which is] the Spirit of Truth, whom the God will send, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you." এখানে আহমেদ বা মুহাম্মাদ নামের অনুবাদে লেখা হয়েছে Comforter এবং তাকে Spirit of Truth বা সত্যের বাহক বলা হয়েছে। নামবাচক শব্দগুলিকে শাব্দিক ভাবে অনুবাদ করার ফলেই এই বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশেও এই ধরণের কিছু লোক আছে যারা ইসলামের পরিভাষাগুলিকেও শাব্দিক ভাবে অনুবাদ করতে চায়। হাদিস, রাসুল, কোরআন, মুহাম্মদ, মুসলিম, মুসলমান, ইসলাম ইত্যাদী নামবাচক ও পারিভাষীক শব্দগুলিকেও তারা বাংলায় অনুবাদ করতে চায়। এতে নতুন প্রজন্মের মধ্যে এক বিরাট কনফিউশনের সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন হাদিসের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'বানী বা বক্তব্য'। কিন্তু ইসলামে হাদিস বলতে আমরা শুধু রাসুলের বানী ও কর্মকান্ডকে বুঝি। এই নব্য দল কোরআনে যে সব বানী ও বক্তব্য রয়েছে সেগুলিকেও হাদিস বলতে চায়। মুসলমান বলতে বিশ্বের একটি নির্দিষ্ট জাতীকে বুঝায় যারা মুহাম্মদ সাঃ এর উম্মত। কিন্তু এই নব্য দল একজন ইহুদীকেও

মুসলমান বলতে চায় যদি সে সৃষ্টিকর্তার অনুগত হয়। একজন তো তৌরাতকেও কোরআন বলে দাবী করেছে কারন তৌরাত সব সময় পাঠ করা হয়। তাদের মতে যে কোন পাঠ্য বইকে কোরআন বলা যাবে। কোরআনের শাব্দিক অর্থ "সদা পাঠ্য"। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইন্দোনেশিয়াতে খবরের কাগজকে কোরান বলে। এটা হয়ত ডাচদের কারসাজী ছিল যেটা ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানেরা ধরতে পারে নি।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সমপ্রদায় জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে।(২ঃ১৪৬)

৪৭

সুরাহ বাকারার ১২৯ আয়াতে ইবরাহিম আঃ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যেন তিনি এমন এক রাসুল পাঠান যিনি নীচের চারটি কাজ সম্পন্ন করবেন। উত্তরে আল্লাহ তা'লা আমাদের রাসুল কে পাঠালেন এবং তাঁর জন্য চারটি সুনির্দিষ্ট কাজ নির্ধারন করে দিয়েছেন, যা তিনি আমাদের মাঝে এসে বাস্তবায়ন করবেন। সেগুলো হলোঃ পবিত্র কোরআন পাঠ করে আমাদের শুনাবেন, আমাদেরকে জান ও মালে পবিত্র করবেন, আমাদের কোরআন ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং যা আমাদের জানা নেই সেসব বিষয় শিক্ষা দেবেন। এখানে লক্ষ্য করুন, কোরআন পাঠ করা এবং কোরআন শিক্ষা করা, দুইটা আলাদা বিষয়। পাঠ করা মানে শুধু আবৃত্তি করে শুনানো। অপরদিকে শিক্ষা করা মানে আয়াতের অর্থ সহ তফসির এবং অন্যান্য তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা। এই দুইটার আলাদা আলাদা সওয়াব আছে। আর এই দুইটায়ই আমাদের করতে হবে। যারা বলেন, না বুঝে শুধু তেলাওয়াতে কোন সওয়াব নাই, তারা ঠিক বলেন না। তেলাওয়াতেও সাওয়াব আছে। আর একটি বিষয় এখানে লক্ষ্যনীয়। ৪টি দায়ীত্বের মধ্যে শুধুমাত্র প্রথমটির জন্য একক ভাবে কোরআন, কোরআনের ভাষা ও শব্দমালা, অবিকৃত ভাবে ব্যবহার করতে হবে। এখানে নতুন কিছু যোগ বিয়োগ অথবা পরিবর্ধন পরিশীলন করার সুযোগ নেই। কিন্তু বাকী তিনটি দায়ীত্ব পালন করতে যেয়ে রাসুল নিজের ভাষা ব্যবহার করেছেন, নিজের ভাষায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, সব কিছু ব্যাখ্যা করেছেন নিজের ভাষায়, এমনকি অনেক কিছু প্রাক্টিকালি করে দেখিয়েছেন সাহাবীদের। রাসুলের এইসব কর্মকাণ্ড বর্তমানে হাদিসের বইগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে। তাই কোরআনের পরেই হাদিসের স্থান ইসলামে। কোরআন ও হাদিস, এই দুইটাকেই আমাদের আকড়ে ধরতে হবে। ইবরাহিম আঃ যখন প্রার্থনা করেছিলেন তখন পবিত্রকরণকে ৪ নম্বর সিরিয়ালে বলেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ Approve করার সময় এটা ২ নম্বরে এনেছেন। এতে বুঝা যায়, যে কেউ যখন কোন আয়াত শুনে ও তাতে ইমান আনে, তখনই তার আত্মা পবিত্রকরণের উপযুক্ত হয়ে যায়। অবশ্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনের জন্য পরবর্তী দুইটি বিষয়েও শিক্ষা লাভ করতে হবে।

كَمَاأَرْسَلْنَافِيكُمْرَسُولاًمِّنكُمْيَتْلُوعَلَيْكُمْآيَاتِنَاوَيُزَكِّيكُمْوَيُعَلِّمُكُمُالْكِتَابَوَالْحِكْمَةَوَيُعَلِّمُكُممَّالَمْتَكُونُواتَعْلَمُونَ

যেমন, আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমুহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না।(২ঃ১৫১)

৪৮
একই ধরনের একটি আয়াত সুরাহ বাকারার ৪৫ নম্বর আয়াতেও রয়েছে। জীবনে ভাল মন্দ যাই ঘটুক না কেন, প্রথমেই সেই অবস্থার উপর ধৈর্য ধারন করতে হবে। তারপর নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। নামাজ এক সার্বজনীন এবাদত। যে কোন কারনেই নামাজ পড়া যায়, আবার কোন কারন ছাড়াই নামাজ পড়া যায়। ছেলের পরীক্ষা আছে, নামাজে দাড়িয়ে যান। নাতীর জ্বর হয়েছে, নামাজে দাড়ান। সফরে যাচ্ছেন, নামাজ পড়ে নিন। সফর থেকে ফিরেছেন, নামাজ পড়ুন। রাতে ঘুম হচ্ছে না, নামাজে দাড়ান। এমন কি, বাসায় লবণ দরকার , আগে নামাযে দাড়ান, তারপর বাজারে দৌড়ান। নামাজ এমনই একটি এবাদত। কিন্তু এই নামাজকেই কারটেল করার জন্য একদল লোক উঠে পড়ে লেগেছে। বিদয়াতের নামে তারা বিভিন্ন সময়ের নামাজকে বন্ধ করে দিতে চায়। এমনকি তারাবীর নামাজকেও তারা বিদয়াত বলে । আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

হে মুমিন গন! তোমরা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (২ঃ১৫৩)

৪৯
মৃত্যুর পর থেকে আরম্ভ করে কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের যে জীবন সেটাকে বারযাখী জীবন বলে। অনেকে আবার এটাকে কবরের জীবন বলে। কোরআন ও হাদিসে এসেছে, এই সময় মানুষের আত্মাগুলি ইল্লিয়ীন অথবা সিজ্জিনে অবস্থান করবে। বারযাখী জীবন কেমন হবে সে সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট কোন ধারনা নেই। তবে এটা ঠিক যে ঐ সময় কোন শারীরীক চাহিদা থাকবে না, কারন আত্মা নির্দিষ্ট কোন শরীরের সাথে সংযুক্ত থাকবে না। তবে আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়েছেন, সেই সব শহীদদের কথা আল্লাহ আলাদাভাবে নীচের আয়াতে বর্ননা করেছেন। আল্লাহ শহীদদের মৃত বলতে নিষেধ করেছেন, বরং তারা জীবিত। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, তাদেরকে রিজিক দেওয়া হয় (আল-ইমরান আয়াত-১৬৯)। অর্থ্যাৎ শহীদদের শরীর দেওয়া হবে এবং তাদের সমস্ত শারীরিক উপলব্ধি থাকবে। এটা শহীদদের এক বিশেষ মর্যাদা। নবী ও মুমিনগনের জন্যও মর্যাদার বিভিন্ন স্তর থাকবে। এমনকি যারা দুনিয়ায় কাফের ছিল তাদের আত্মাদের জন্যও আলাদা ব্যবস্থা থাকবে সিজ্জিনে। তবে শহীদদের জন্য বিশেষ যে বৈশিষ্ট্য তা হলো তাদেরকে বেহেশতি খাবার পরিবেশন করা হবে এবং দুনিয়ার জীবিত মানুষের মতই তারা তৃপ্তির সাথে খাদ্য গ্রহন করবে। আল্লাহ আমাদের শহীদের মর্যদা দান করুন।

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ

আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। (২ঃ১৫৪)

৫০

কোন মৃত্য সংবাদ শোনার সাথে সাথেই আমরা পড়তে থাকি-"ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে প্রতিদিনই বেশ কয়েকবার করে এই বাক্যটি পড়তে হয়। প্রিয় পাঠকবৃন্দ, এটা কোরআনের সুরাহ বাকারার এক বিশেষ আয়াত, এবং এটা আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের জন্য এক নির্দেশনা। যখন মানুষ চরম বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়, যখন মৃত্যুর মত বিভিষিকা তার সামনে এসে দাড়ায়, অতি প্রিয়জন যখন তাকে ছেড়ে চলে যায়, ধন সম্পদের বিপুল ক্ষতি তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়, এমন বিপদেও মানুষকে দিশেহারা হলে চলবে না। তাকে মনে রাখতে হবে, এই বিশ্বের সমস্ত কিছুই আল্লাহর। এই জীবন আল্লাহর, এই ধন সম্পদ আল্লাহর, এই যশ-খ্যাতি আল্লাহর, এমনকি আমার দেহের প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগও আল্লাহর। আল্লাহ দয়া করে এগুলি আমাদের দিয়েছেন, আমাদের ব্যবহারের জন্য, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। যে কোন মূহুর্তে আল্লাহ এগুলি প্রত্যাহার করতে পারেন। আমাদের সবাইকেই একদিন ফিরে যেতে হবে আল্লাহর কাছে। এই আয়াত আমাদের এই কথাটিই বার বার স্মরন করিয়ে দেয়। আর যারা অতি বিপদে ধৈর্য্য ধারন করে এই কথা স্মরন করবে, এই আয়াত বার বার পড়বে, আল্লাহর করুনা ও ক্ষমা তার উপর বর্ষিত হবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ-

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয় এবং এসব লোকই হেদায়েত প্রাপ্ত। (২ঃ১৫৬-১৫৭)

৫১

ইসলামের অনেকগুলি ধর্মীয় নিদর্শনের কথা আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলিকে সম্মান করতে বলেছেন। একজন মানুষ যখন ইহরাম পরিধান করে হজের পথে রওয়ানা হন, তখন তিনিও ধর্মীয় নিদর্শনে পরিণত হন। কোরবানী করার নিয়তে যখন একটা গরু বা ছাগলের গলায় পট্টি ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তখন সেগুলিও আল্লাহর নিদর্শনে পরিনত হয়। মীনা, আরাফাহ, জাবালে নূর, জমজম কুপ, এগুলির মত আরও দুইটি বড় নিদর্শন হলো সাফা ও মারওয়া পাহাড়। এই দুই পাহাড়ের ইতিহাস আমরা জানি। বিবি হাজেরা ছেলে ইসমাইল আঃ এর জন্য পানির খোজে এই দুই পাহাড়ের মাঝে ৭ বার দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। ৭ম বার শেষে তিনি যখন ছেলে ইসমাইল আঃ এর কাছে ফিরে আসলেন, তখন দেখলেন যে ছেলের পায়ের গোড়ালীর নীচ থেকে এক পানির ঝরনা উৎসারিত হয়েছে। এটাই জম-জম কুপ। জাহেলিয়াতি যুগে মানুষেরা এই দুই পাহাড়ের মাঝে দৌড়াদৌড়ী করতো এবং দুই পাহাড়ে দুইটি মূর্তি রেখে তাদের পুজা করতো। তাই ইসলামে হজ্জ চালু হলে অনেকে সাফা-মারওয়া সাই করাকে পাপ মনে করতো। তখন আল্লাহ এই নীচের আয়াতটি নাজিল করে সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে সাফা-মারওয়া সাই করাতে কোন পাপ নাই, কারন এই পাহাড় দুটি আল্লাহর নিদর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম। এরপর থেকে সাফা-মারওয়া পাহাড় ৭ বার সাই (দৌড়া-দৌড়ী) করা হজের এক রুকনে পরিণত হয়।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন গুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্ব বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটিতে প্রদক্ষিণ (সাঈ) করাতে কোন দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তার সে আমলের সঠিক মুল্য দেবেন। (২ঃ১৫৮)

৫২

কোরআন ও হাদীসে যেসব নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে- তার সব কিছুই প্রকাশ করে দিতে হবে। কোন কিছুই গোপন করা যাবেনা। সত্য কে মিথ্যার সাথে মেশানো যাবে না। যখন কোন সুবিধা অর্জনের কথা হয় অথবা আমরা কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে চাই- তখনই সত্য গোপন করা বা সত্য- মিথ্যার মিশ্রনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রবনতা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও খোলা মন নিয়ে সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। তবেই আমরা আল্লাহ তা'লার ক্রোধ ও অভিসম্পাত থেকে রক্ষা পাব। অনেকে বলেন, ইসলামে অনেক গুপ্ত বিষয় রয়েছে যা তরিকত পন্থিরা জানেন। আমি বলব, সেগুলি যদি ইসলামের বিষয় হয় তবে তা প্রকাশ করে দিন। ইসলামের কোন কিছু গোপন করলেই আল্লাহর অভিসম্পাত হবে আপনাদের উপর। নীচের আয়াতটি পড়ুনঃ-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও। (২:১৫৯)

৫৩

আল্লাহ সুবহানু তা'লা আমাদেরকে প্রজ্ঞা দিয়েছেন, আমাদেরকে চিন্তাশীল বানিয়েছেন, যাতে আমরা আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণা করতে পারি। নীচের আয়াতে আল্লাহ সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা নিয়ে আমাদের গবেষণা করা উচিৎ। বরং আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন এসব বিষয়ে গবেষণা করতে এবং আল্লাহর শক্তি ও সৃষ্টি কৌশলকে উপলব্ধি করতে। প্রথমেই আল্লাহ এই মহা বিশ্বের কথা বলেছেন। কীভাবে এই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। কি বিশাল এর ব্যপ্তি ও বিস্তার যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এর পরেই আসে সৌরমণ্ডলের কথা। সৌরমণ্ডলের একটি গ্রহ এই পৃথিবী। কিন্তু অন্য গ্রহ থেকে কত আলাদা এই পৃথিবী। দিন রাত্রির খেলা চলে এখানে পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে। আবার দিন রাত্রি ছোট বড় হয় পৃথিবী অক্ষের উপর একটু হেলে রয়েছে বলে। এতে আমরা পাই বৈচিত্রময় ঋতুমালা। তারপর যান বাহনের কথা চিন্তা করুন। পর্বত সম জাহাজগুলো সাগরে কিভাবে ভেসে চলেছে। আকাশ পথে বিশাল আকৃতির উড়োজাহাজ পাখীর মত উড়ে চলেছে।মহাকাশ যানগুলি অন্য গ্রহে পাড়ী দিচ্ছে। ভাবুন কিভাবে আকাশ থেকে বর্ষনের পর পানি-চক্র সম্পন্ন হয়। বায়ু প্রবাহের কথা চিন্তা করুন। আসলে এ সবই সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে মানুষ এই পৃথিবীতে সুখে স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে। এসবই মহান আল্লাহ তা'লার নিদর্শনসমুহ। এসবই বিজ্ঞান। পবিত্র কোরআন আল্লাহ তা'লার এসব নিদর্শনের প্রতি গভীর চিন্তা ভাবনার জন্য আহবান

জানায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা মুসলিম জাতী এই সব গবেষণা কর্ম থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছি।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং সাগরে মানুষের কল্যানে জাহাজসমূহের চলাচলে , আর আল্লাহ তা' আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে। (২:১৬৪)

৫৪

কোন একজন ব্যক্তির প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা, কারো প্রতি মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা, মানুষকে শিরক এর দিকে ধাবিত করে। ইহুদীরা তাদের আলেম ওলামাদের রব হিসাবে গণ্য করে। খৃষ্টানগণ তাদের রসুল (আ:) কে ঈশ্বরের সমকক্ষ মনে করে। হিন্দুগন তাদের সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে অসংখ্য দেব দেবীর পুজা করে। এমন কী অনেক মুসলমানও তাদের পীর, মুর্শিদ, অলি আওলিয়াদের একমাত্র ত্রাণকর্তা বলে মনে করে। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে তারা কোরআন ও সুন্নাহর উর্ধ্বে স্থান দিয়ে ফেলে এবং বিনা প্রশ্নে তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস ও মান্য করে। এভাবেই মানুষ শিরকের পথে চালিত হতে পারে। পবিত্র কোরআনে এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'লা আমাদের সাবধান করছেন।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতইনা উত্তম হ'ত যদি এ জালেমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর। (২.১৬৫)

৫৫

খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহ সমস্ত মানব জাতীকে দুইটি নির্দেশনা দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে যে এই নির্দেশ শুধু মুসলমানদের জন্য নহে। বিশ্বের সমস্ত মানুষকেই এই নির্দেশনা মানতে হবে। এতেই মানব জাতীর কল্যাণ। খাদ্য হতে হবে হালাল এবং তায়িবা (পবিত্র)। হালাল খাদ্য কোনগুলি তার এক বিরাট তালিকা আমাদের কাছে আছে। এর বাইরে কোন খাবার খাওয়া যাবে না। বিশ্বের জনগণের এক বিরাট অংশ এই তালিকার ধার ধারে না। এমন কিছু নাই যা তারা খায় না। বিড়াল কুকুর থেকে আরম্ভ করে সাপ বাদুর পেঁচা , এমন কি জীবন্ত বানরের মগজ পর্যন্ত তাদের খাদ্য তালিকায় আছে। এর ফল আজ আমরা বিশ্বের সবাই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। বিজ্ঞানীরা বলেন, করোনার মত এই মরণ ঘাতী মহামারীর বিকাশ ঘটেছে চীনের উহান শহরের পশু মার্কেট থেকে। এখন পর্যন্ত বিশ্বের দশ লাখ

লোক মারা গেছে। আক্রান্ত হয়েছে কোটীর উপরে। তবুও এই তান্ডব থামার কোন লক্ষন দেখা যাচ্ছে না। আল্লাহর একটা নির্দেশ অমান্য করাতেই আজ এই অবস্থা। খাদ্যের ব্যপারে আল্লাহর দ্বিতীয় নির্দেশ, এটা পবিত্র বা তায়িবা হতে হবে। হালাল হলেই খাওয়া যাবে না। খাওয়ার উপযোগী হতে হবে। দরকার হলে রান্না করতে হবে। পচা, বাসি বা দুষিত হলে খাওয়া যাবে না। এমনকি রুচিতে বাধলেও সেটা না খাওয়াই উচিত। কোন রোগের কারনে ডাক্তার যে কোন খাবারকে রোগীর জন্য ক্ষতিকর ঘোষণা করতে পারেন। ঐ রোগীর জন্য সেই খাবারটি তখন আর তায়িবা থাকে না। তাই বিশ্ববাসীর উচিত, আল্লাহর দেওয়া খাদ্য বিধানকে মেনে চলা। এতে সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

হে মানব মন্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষন কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২ঃ১৬৮)

৫৬

পূর্ব-পুরুষদের অন্ধভাবে অনুসরনের প্রবনতা এখনও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা একথা মোটেই বিশ্বাস করতে রাজি নইযে, আমাদের পূর্বপুরুষ, আমাদের ইমাম, আমাদের নেতা, পীর বা উস্তাদদের কোন কারনে কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকতেও পারে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্মের লোক ইসলামে প্রবেশ করেছে। তাদের সাথে সাথে তাদের পুরাতন ধর্মের অনেক কিছু ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছে। খৃস্টান থেকে সুফিবাদ এসেছে, হিন্দু থেকে বাউল বা সন্যাসবাদ এসেছে, গ্রীক দর্শন থেকেও এসেছে অনেক কিছু। এগুলির সবই প্রায় বিদআত ও শিরক। তাই যখন প্রকৃত সত্য আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় তখন তা বিনা দ্বিধায় গ্রহন করা উচিত। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এ রকমই আদেশ দিয়েছেন ।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ

আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব। যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদি ও তাদের বাপ দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও। (২.১৭০)

৫৭

নিম্নের আয়াতে মাত্র চারটি জিনিসকে আল্লাহ হারাম বলে ঘোষনা দিয়েছেন। সেগুলি হলো মৃত জীব, প্রবাহিত রক্ত, শুকর এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবেহকৃত পশু। এই আয়াত থেকে অনেকে মনে করতে পারেন যে এই চারটির বাইরে অন্য সব কিছু আমাদের জন্য হালাল। কিন্তু এটা ঠিক নহে। হালাল পশু পাখীও কিভাবে হারাম হয়ে যায়, সেটাই এই আয়াতে বলা হয়েছে। হালাল পশু মৃত হলে হারাম হয়ে যায়। হালাল পশু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবেহ হলে হারাম হয়ে যায়। হালাল পশুর প্রবাহিত রক্ত হারাম। একটা প্রানীর দেহে কি কি রোগ জীবাণু রয়েছে সেটা তার রক্ত পরীক্ষা করলেই বোঝা যায়। রক্ত পান করার অর্থই হল সেই সব রোগ জীবাণু সরাসরি গলধঃকরন। তাই সুষ্ঠভাবে জবেহ করে রক্তকে বের করে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জবেহ ছাড়া মারা গেলে বা আঘাতে মারা গেলে এই রক্ত বের হতে পারে না, তাই সেই পশু খাওয়া হারাম। বলি দেওয়া পশুর

রক্তও পুরোপুরি বেরুতে পারে না, কারন মাথা দেহ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াতে Heart বন্ধ হয়ে যায় এবং Pump করে সব রক্ত বের করে দিতে পারে না। তাই একমাত্র ইসলামিক জবেহ পদ্ধতিতেই Heart শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত Spinal Chord এর মাধ্যমে মস্তিষ্কের সাথে Connected থাকে এবং সমস্ত রক্তকে Pump out করতে সমর্থ হয়। This is most scientific than any other system. শূকরকে খৃস্টানগন হালাল মনে করে। তাই আল্লাহ শূকরকে Specifically উল্লেখ করে বলেছেন যে শূকর হারাম। হাদিসে হারাম-হালাল নির্ধারনের মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে এবং এগুলির উদাহরন দেওয়া হয়েছে। খাদ্যে হারাম-হালালের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রথমে মুসা আঃ এর শরীয়তে আসে এবং তাওরাতে এর বিস্তৃত বর্ননা দেওয়া হয়েছে। যে সব প্রাণীর খুর আছে এবং তা দুই ভাগে বিভক্ত, সেগুলি খাওয়া হালাল। শুকরের খুর থাকলেও শুকর হারাম কারন শুকর জাবর কাটে না। হিংস্র পাখী যারা নখর দিয়ে শিকার ধরে ঠোট দিয়ে ছিড়ে খায়, সেগুলি হারাম। সাগরের সমস্ত মাছ মৃত হলেও হালাল। মুসার শরিয়তে মদ ও চর্বি হারাম। কিন্তু ইসা আঃ মদকে হালাল করেছেন। মনে হয় ইসা আঃ এর অধিকাংশ অনুসারী শীত-প্রধান দেশের লোক হওয়াতে মদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইসলামী শরীয়তে মদকে আবার হারাম ঘোষনা করা হয়েছে। মুসার শরীয়তের প্রায় সমস্ত হালাল জিনিসকেই ইসলামে হালাল হিসাবে সত্যায়িত করেছেন আল্লাহর রাসুল। উপরন্তু চর্বি, কলিজা, প্লীহা প্রভৃতি জিনিসকেও আবার ইসলাম হালাল ঘোষনা করেছে। শুধুমাত্র প্রবাহিত রক্তই হারাম। মাংসের সাথে যেটুকু রক্ত লেগে থাকে সেটা হারাম নহে। ইসলামী শরীয়তে যে খাদ্যবিধান আল্লাহ দিয়েছেন, সেটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত লেটেষ্ট খাদ্যবিধান। আল্লাহ ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত বিশ্বকে এটা মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। না হলে আবার করোনার মত মহা বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হবে এই বিশ্ব।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শুকর মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যাতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (২ঃ১৭৩)

৫৮
আমরা কী সৎকর্মশীল ? কোন কাজ গুলো সৎকর্মের পর্যায়ভুক্ত? সেগুলো কি শুধুমাত্র আমাদের মাথা পূর্ব বা পশ্চিমে নত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ? না ভাই, সৎকর্মের সীমানা আরও বিস্তৃত। নীচের আয়াতে অতি সুন্দর ও বিস্তৃত ভাবে সৎকর্মের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। আমরা যদি শুধুমাত্র নীচের আয়াতটিই যথাযথ ভাবে অনুসরণ করি, তাহলে, ইনশা আল্লাহ, আমাদের ধর্মের জন্য সেটিই যথেষ্ট হবে।। প্রথমেই ইমান ও আকীদার কথা বলা হয়েছে। ইসলামে প্রবেশের প্রথম ধাপই হচ্ছে ঈমান। ঈমান ছাড়া কোন সৎকর্মই গ্রহণযোগ্য হবে না। এর পরেই আছে সম্পদের ব্যবহার। কোন কোন খাতে, কিভাবে, কোথায় কোথায় সম্পদ ব্যয় করতে হবে, তার বর্ণনা এসেছে একটু বিস্তৃত ভাবেই। পরবর্তী ধাপে এসেছে নামাজ কায়েম ও জাকাত প্রদানের বাধ্যবাধকতা। তাছাড়াও ইমানদারদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হবে। আর সব শেষে, ধৈর্য ধারণ করতে হবে অভাবে, রোগে শোকে ও যুদ্ধের সময়। এই একটি আয়াতেই জীবনের সব কিছু তুলে ধরা হয়েছে। আসুন, আমরা এই একটি আয়াতের উপরেই পরিপূর্ণ আমল করার চেষ্টা করি। সহজে বুঝার জন্য তালিকাটি আমরা নাম্বারিং করে নীচে দিয়ে দিলাম ঃ-
বড় সৎকাজ হল এই যেঃ-

১) ঈমান আনবে আল্লাহর উপর

২) কিয়ামত দিবসের উপর,
৩) ফেরেশতাদের উপর এবং
৪) সমস্ত নবী-রসূলগণের উপর,
৫) আর সম্পদ ব্যয় করবে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে।
৬) আর নামায প্রতিষ্ঠা করবে
৭) যাকাত প্রদান করবে এবং
৮) যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং
৯) অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্য ধারণকারী
তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার।

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

সৎকর্ম (পুন্য) শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে আল্লাহরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্য ধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার (মুত্তাকী)। (২:১৭৭)

৫৯
নরহত্যা করলে মৃত্যুদন্ডের বিধান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালু আছে। ইসলামিক পরিভাষায় একে কেসাস বলে। ধর্মীয়ভাবে এটা প্রথম চালু হয় মুশা আঃ শরীয়তে। খুবই কড়াকড়ি ভাবে এই আইন বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সামান্যতম ছাড় দেওয়া বা ক্ষমা করার কোন স্কোপ নাই সেখানে। Leviticus 24:17---Anyone who takes the life of a human being is to be put to death. আবার বলা হয়েছে, Deuteronomy 19:19-21---- Show no pity: life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. কিন্তু ইসা আঃ এই বিধানকে অতিমাত্রায় শিথিল করে দিয়েছেন। ক্ষমা করায় তার এক মাত্র নীতি ছিল। তিনি বলেন, Matthew 5:38-48 “You have heard that it was said, ‘Eye for eye, and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. ডান গালে চড় দিলে বাম গাল পেতে দাও, এই শিক্ষা দিয়েছেন তিনি। দুর্ভাগ্য যে, কোন খৃস্টান জাতী আজ এই নীতিতে বিশ্বাস করে না। ইসলাম নরহত্যার ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে যা উভয় পক্ষের জন্য কল্যাণ মূলক। নরহত্যা করলে তাকে অবশ্যই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে। আমাদের দেশে এই মৃত্যুদন্ড ক্ষমা করতে পারেন একমাত্র দেশের প্রেসিডেন্ট। কিন্তু ইসলামিক আইনে মৃত্যুদন্ড রদ করার একমাত্র অধিকার রাখে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগন। তারা ইচ্ছা করলে রক্তপনের বিনিময়ে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। এতে নিহতের পরিবার কিছুটা আর্থিক সহায়তা পেল, অন্যদিকে হত্যাকারীর পরিবার একটি জীবন ক্ষয় থেকে রক্ষা পেল। কি সুন্দর ব্যবস্থা। বর্তমানে একমাত্র সৌদি আরব ও ইরানে এই আইন অনুসরন করা হয়। আজকাল দেশ-বিদেশের

অনেক বুদ্ধিজীবি মৃত্যুদন্ডকে উঠিয়ে দেবার পক্ষে সোচ্চার। কিন্তু আল্লাহ বলেন, এর মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জীবন। একটি মৃত্যুদন্ড ভবিষ্যতে অনেক মানুষের জীবনকে নিহত হবার হাত থেকে রক্ষা করবে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগন! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যাক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।
হে বুদ্ধিমানগণ! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার। (২ঃ১৭৮-১৭৯)

৬০
আল্লাহ তা'লা নিম্নোক্ত আয়াতে স্পষ্ট ভাবে ঘোষনা দেন যে, পবিত্র কোরআন রমজান মাসেই নাজিল হয়েছে। তাই এ বিষয়ে আর কোন প্রকার সন্দেহের ছায়াও থাকা উচিত নয়। আল্লাহর আর এক নির্দেশনা এই যে যারাই এই মাস পাবে, তারা পূর্ণ মাস ধরে রোজা রাখবে। এটা ফরজ। অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। আজকাল একটা দল বেরিয়েছে যারা রোজা দশ দিন বলে প্রচার করছে । তারা মিথ্যা ফিতনা সৃষ্টি করতে চায়, আমাদের মাঝে উপদল সৃষ্টি করতে চায়। আমরা যেন তাদের কথায় বিভ্রান্ত না হই । আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন । এর আগের ১৮৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে পূর্বের জাতীগুলোর জন্যও রোযার বিধান ছিল। কিতাব পাওয়ার আগে মুসা আঃ ও ইসা আঃ এক নাগাড়ে ৪০ দিন রোযা করেছেন। হিন্দুরা আমাবস্যা পূর্ণিমায় উপবাস করে। বৌদ্ধরাও পূর্ণিমাতে উপবাস করে। তাই রোযা নতুন কোন বিধান নহে। তবে এই আয়াতে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয়। যদি কেউ রমজান মাস প্রত্যক্ষ করে, তবেই সে রোজা থাকবে। কিন্তু যদি সে দুই মেরুতে অবস্থান করে, যদি সে মহাকাশে কর্মরত থাকে, যদি সে চাঁদে বা মঙ্গল গ্রহে গবেষণায় থাকে, সেখান থেকে সে চাঁদও দেখবে না বা রমজান মাসও প্রত্যক্ষ করবে না। তার জন্য কি তখন রোজা ফরজ হবে? চিন্তার বিষয়। ১৮৪ নম্বর আয়াতে রোজার মধ্যে একটা ছাড় দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- "আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্ট দায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্যদান করবে"। শুনেছি, এই আয়াতের বরাত দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক সুস্থ সবল ধনী লোক নিজে রোজা না থেকে পরিবর্তে মিসকিনকে খাদ্য দান করে। কিন্তু অধিকাংশ উলেমাদের মতে এই বিধানটি ১৮৫ নম্বর আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে। এখন প্রতিটি সুস্থ মানুষকে রমজান মাসে রোজা থাকতে হবে।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে

চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।।(২:১৮৫)

৬১

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে অন্যান্য জাতীর জন্যও আল্লাহ রোজার বিধান দিয়েছিলেন। নীচের আয়াত অবতীর্ণ হবার আগ পর্য্যন্ত মানুষেরা রোজার ব্যাপারে মুশা আঃ এর শরীয়ত অনুসরন করতো। স্বভাবতই এটা মানুষের জন্য বেশ কঠিন ছিল। ইফতারীর পরে ঘুমের আগ পর্য্যন্ত পানাহার করা যেত। কিন্তু ঘুমানোর সাথে সাথেই রোজার সময় শুরু হয়ে যেত। শেষ রাতে উঠে সেহরী খাওয়ার কোন বিধান ছিল না। স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও করা যেত না। আল্লাহ সুবহানু তালা মুসলমানদের জন্য রোজাকে আরও সহজ করার জন্য নীচের আয়াত নাজিল করেন। এই আয়াতে রোজার সময়সীমা স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ইফতারীর পর থেকে ফজরের সাদা রেখা স্পষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত সময় রোজার আওতার বাইরে। এ সময় সীমার মধ্যে পানাহার করা যাবে, স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা যাবে। আল্লাহর এই রহমতকে পূর্নভাবে সদ্ব্যবহার করার জন্য ইসলামে সেহরী গ্রহনের বিধান চালু হয়েছে যা অন্য কোন ধর্মে নেই। এর পরে রোজা আরম্ভ হয়ে মাগরীবে এর সমাপ্তি ঘটে। সূর্য ডোবার সাথে সাথেই যত তাড়াতাড়ী সম্ভব ইফতারী করার জন্য হাদিসে নির্দেশ এসেছে। অনেকে ইফতারীকে বিলম্বিত করে এশা পর্য্যন্ত টেনে নিতে চাই। কিন্তু এটা ইহুদীদের অভ্যাস ছিল। রাসুল এটাকে নিষেধ করেছেন। এই আয়াতের প্রথমে স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কের একটা ধারনা দেওয়া হয়েছে। তারা একে অপরের পোষাক। পোষাক যেমন একজনের কদর্য স্থানগুলিকে ঢেকে রাখে, রোদ বৃষ্টি থেকে তাকে রক্ষা করে, আর সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলে-তেমনি স্বামী স্ত্রী একে অপরকে এইভাবেই রক্ষা করবে, একে অন্যের সৌন্দর্য্য বর্ধনের কারন হবে, অন্যের দোষ ত্রুটিগুলি সযতনে ঢেকে রাখবে। পোষাক যেমন মানুষের দেহের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, স্বামী স্ত্রীও একে অপরের জন্য তাই, একে অপরের জন্য অবিচ্ছেদ্য। দুইয়ে মিলিয়ে পরিপূর্ণ এক একক ইউনিট।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা আহরন কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা এতেকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না। এমনিভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ নিজের আয়াত সমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাঁচতে পারে। (২:১৮৭)

৬২

ছোট্ট একটি আয়াত। আর তাতে আছে দুটি মাত্র নির্দেশনা। তোমরা অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং এই উদ্দেশ্যে বিচারকদের ঘুষ দিও না। খালি চোখে দেখলে মনে হবে যে এটা একটা উপদেশমূলক সাধারণ আয়াত। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারবো কত সুদুরপ্রসারী এর ভাবার্থ। আমাদের পারিবারিক জীবনে, আমাদের সামাজিক জীবনে, আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে, এমনকি বৈশ্বিক ক্ষেত্রেও অহরহ অন্যায়ভাবে সম্পদ গ্রাসের ঘটনা ঘটে চলেছে। এটাকে আমরা কোন অন্যায়ই বলে মনে করছি না। সম্পদ আহরন করাই যেন আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, ন্যায় অন্যায় যে কোন পন্থায়ই হোক না কেন। এমনকি যারা জনগনের সম্পদ রক্ষার দায়ীত্বে রয়েছে, তারাও মন্তব্য করে- হাজার কোটি টাকা তো কিছুই না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখে মনে হয়, প্রতারনা করে সম্পদ আহরনের এক মচ্ছপ পড়ে গেছে সমস্ত দেশে। ব্যাংক থেকে কোটী কোটী টাকা উধাও হয়ে যাচ্ছে জাল দলিল পত্রের মাধ্যমে, কোটী কোটী ডলার রিজার্ভ ফান্ড থেকে হ্যাকাররা মেরে নিচ্ছে, এমনকি সাধারন মানুষের বিকাশ একাউন্ট থেকেও মুহুর্তের মধ্যে হাজার হাজার টাকা গায়েব হয়ে যাচ্ছে বিচিত্র সব পন্থায়। ইসলাম এই সমস্ত প্রতারনাকে চরমভাবে নিষেধ করেছে। অন্য আয়াতে আছে, যারা এইভাবে সম্পদ গ্রাস করে তারা যেন দোজখের আগুন দিয়ে তাদের উদরকে পুর্ন করে। আর যারাই এই সব কাজে অংশগ্রহন করবে, তিনি ব্যাংকের ডাইরেক্টরই হোন অথবা কোন কোম্পানীর মালিকই হোন, অথবা সাধারন কোন প্রতারক হোন, তারা সবাই সমানভাবে শাস্তি পাবে আখিরাতে।

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ গ্রাস করো না। এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্নসাৎ করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের ঘুষ দিও না। (২:১৮৮)

৬৩

আল্লাহ সুবহানু তা'লা চন্দ্রকে মাসের পরিমাপ নির্ধারন ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারনের একটি উপায় বা যন্ত্র হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। কী চমৎকার বৈজ্ঞানিক হিসাব-রক্ষণ ব্যবস্থা । হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু চাঁদের এই কর্ম ক্ষমতার এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। অথবা এর সঠিকতা নির্ধারনের জন্য কোন Calibration এর প্রয়োজন হয় নি। অবশ্য এক্ষেত্রে কেউ কোন পরিবর্তনের ক্ষমতাও রাখেনা। পরিবর্তন বা শুদ্ধি করণের প্রয়োজনও নেই। তা ছাড়াও এ বিশ্বজনীন ঘড়িটির কোন ব্যাটারী পরিবর্তনেরও প্রয়োজন পড়েনা। সুবহানাল্লাহ। আমরা দেখেছি অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দিন-ক্ষন নির্ধারনের জন্যও চাঁদের উপর নির্ভর করা হয়। ভারতের হিন্দুগন ধর্মীয় কাজে চাদের উপর এত নির্ভরশীল যে অতি প্রাচীন কাল থেকেই তারা চাঁদ ও গ্রহ নক্ষত্রের সঠিক সুক্ষ হিসাব সম্বলিত পঞ্জিকার উদ্ভাবন করেছে। আমাদের এই গণনার ক্ষমতা নেই বলে আমাদেরকে সরাসরি চাদের উদয় দেখে মাস নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে। এই আয়াতের শেষে জাহেলিয়াত যুগের এক কুসংস্কারের উল্লেখ রয়েছে। একবার এহরাম পরে বাড়ীর বাইরে আসলে আর সামনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকা যেত না। প্রয়োজনে বাড়ীর পিছনের দেওয়াল টপকিয়ে ঢুকতে হতো। এটাকেই তারা পুণ্য মনে করতো। আল্লাহ বলেন, এটা মোটেই পুন্য নহে। পুন্য হোল সংযম ও তাকওয়াতে। তাই সামনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকাতে কোন বাধা নাই।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

তোমার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে নতুন চাঁদের বিষয়ে। বলে দাও যে এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্বের সময় ঠিক করার মাধ্যম। আর পেছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোন নেকী বা কল্যাণ নেই। অবশ্য নেকী হল আল্লাহকে ভয় করার মধ্যে। আর তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং আল্লাহ্ কে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা নিজেদের বাসনায় কৃতকার্য হতে পার। (২:১৮৯)

৬৪

ইসলাম ধর্মের প্রথম ১২ বছর পর্যন্ত যুদ্ধের অনুমতি ছিলনা। ২য় হিজরিতে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আল্লাহ তা'লা শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধের নির্দেশ দেন। এমন কি, প্রথমে শত্রুতা আরম্ভ করার নির্দেশ মুসলিমদের দেয়া হয়নি। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিধি নিষেধও আরোপ করা হয়েছিল। মহিলা শিশু বৃদ্ধকে হত্যা করা যাবে না, গাছ-পালা বা ফসলাদী নষ্ট করা যাবে না, মৃত দেহকে বিকৃত করা যাবে না, কারন ছাড়া পশু হত্যাও করা যাবে না, ইত্যাকার নানাবিধ যুদ্ধ বিধান জারী করা হয় যুদ্ধে গমনের আগে। আল্লাহ বলেন, যুদ্ধে যেন কোন বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন না হয়। এটা ছিল অনেকটা আত্মরক্ষামুলক যুদ্ধ।

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ

আর লড়াই কর আল্লাহর পথে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।।(২:১৯০)

৬৫

একবার যদি হজ্জ বা ওমরাহ এর জন্য এহরাম বাঁধা হয়, তবে সেই হজ্জ বা ওমরাহ পূর্ণ করা ওয়াজীব হয়ে যায়। এটা নফল হজ্জের বেলায়ও প্রযোজ্য। কিন্তু অবস্থা যদি এমন হয় যে এহরাম বাঁধার পর আর মক্কায় পৌছানো সম্ভব হচ্ছে না। বিভিন্ন কারনে তা হতে পারে। যুদ্ধের কারনে রাস্তা বন্ধ, নিজের অসুস্থতা , বা ভিসা জটিলতা বা মহামারীর কারনে এই সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। এহরাম বেধে বিমান বন্দরে যাওয়ার পরেও আমি অনেককে ফিরে আসতে দেখেছি। এই অবস্থায় আমাদের কি করনীয় তা নীচের আয়াতে বিস্তৃত বলা হয়েছে। আমাদের এহরাম খুলে ফেলে পশু কোরবানী করতে হবে। এরপর মাথা মুণ্ডন করে হালাল হয়ে যেতে হবে। পরবর্তী সুবিধাজনক সময়ে ঐ হজ্জ বা ওমরাহ এর কাজা করতে হবে। হজ্জের কিছু নিয়মাবলীও নীচের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, বিশেষ করে কোরবানির নিয়মাবলী। সাধারণতঃ কোরবানী করার পরেই মাথা মুন্ডন করার নিয়ম। কিন্তু কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, অথবা মাথায় কোন অসুখ থাকে, অথবা মাথায় অসহনীয় উকুনের উপদ্রব হয়, তবে কোরবানীর আগেও মাথা মুন্ডন করা যেতে পারে। আর যদি কোনভাবেই কোরবানীর পশু না পাওয়া যায়, তবে দশটি রোজা করতে হবে। এর তিনটি হজ্জের সময়ে, আর বাকী ৭টি দেশে ফিরে এসে। মহান আল্লাহ বলেনঃ-

وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ্ব ওমরাহ পরিপূর্ণ ভাবে পালন কর। যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও, তাহলে কোরবানীর জন্য যাকিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুন্ডন করবে না, যতক্ষণ না কোরবাণী যথাস্থানে পৌছে যাবে। যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোজা করবে কিংবা খয়রাত দেবে অথবা কুরবানী করবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা হজ্জ্ব ওমরাহ একত্রে একই সাথে পালন করতে চাও, তবে যাকিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কুরবানী করাই তার উপর কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা কোরবানীর পশু পাবে না, তারা হজ্জ্বের দিনগুলোর মধ্যে রোজা রাখবে তিনটি আর সাতটি রোযা রাখবে ফিরে যাবার পর। এভাবে দশটি রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে। এ নির্দেশটি তাদের জন্য, যাদের পরিবার পরিজন মসজিদুল হারামের আশে-পাশে বসবাস করে না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। সন্দেহাতীতভাবে জেনো যে, আল্লাহর আযাব বড়ই কঠিন। (২.১৯৬)

৬৬
হজ্জের মাস তিনটি, শাওয়াল জিলকাদ্দ এবং জিলহাজ্জ। এই তিন মাসের মধ্যেই হজ্জের নিয়তে এহরাম বাধতে হবে। এরহাম বাধার শেষ সময় জিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখ। এহরাম বাধার পর তিনটা কাজ না করার জন্য বিশেষ ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেগুলি হোল, স্ত্রীর সাথে মেলামিশা না করা , যে কোন পাপ কাজ পরিহার করা এবং ঝগড়া-বিবাদ ও বাগবিতণ্ডা না করা। প্রথম দুটি কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। কিন্তু তৃতীয়টি অর্থাৎ ঝগড়া বিবাদ এড়িয়ে চলা খুবই কঠিন একটা কাজ হজ্জের পরিবেশে। একই সাথে লাখ লাখ লোকের সমাগম। সেই তুলনায় সুযোগ সুবিধার কমতি হতেই পারে। তাই সব কিছুর জন্য একটা প্রতিযোগীতা লেগেই রয়েছে। এই পরিবেশে মাথা ঠান্ডা রেখে অতীব ধৈর্যের সাথে সব কিছুর মুকাবিলা করতে হবে। সব ধরনের তর্ক বিতর্ক বাক বিতণ্ডা এড়িয়ে চলতে হবে। মোট কথা, ধৈর্যের এক বিশাল পরীক্ষা দিতে হবে হজ্জের মৌসুমে। সেই সাথে আর একটা কাজ করার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে। যথেষ্ট পাথেয় সঙ্গে নিতে হবে যাতে ভিক্ষা বৃত্তি না করতে হয়। কিছু কিছু লোক হাজীদের নামে ভিক্ষুকদের পাঠায় মক্কা মদিনায় ভিক্ষা করার জন্য। এটা সম্পূর্ণ নাজায়েজ। ভিক্ষা করা নিষেধ, কিন্তু হজ্জ মৌসুমে ব্যবসা বানিজ্য করতে কোন বাধা নাই। পাথেয় হিসাবে তাকওয়াকে যোগ করা হয়েছে এই আয়াতে। তাকওয়া অর্জন করতে হবে এবং একজন হাজীর জন্য সার্বক্ষণিক সঙ্গী থাকবে এই তাকওয়া । এটাই একজন হাজীর সফলতা । মহান আল্লাহ বলেনঃ-

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ

হজ্জ্বের কয়েকটি মাস সুবিদিত। এসব মাসে যে লোক হজ্জ্বের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রী-সহবাস করা , পাপ কাজ করা, ঝাগড়া-বিবাদ করা হজ্জ্বের সেই সময় জায়েজ নয়। আর তোমরা যাকিছু সৎকাজ কর, আল্লাহ তো জানেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাক, হে বুদ্ধিমানগন! তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোন পাপ নেই। (২ঃ১৯৭)

৬৭
মনে আছে, ছোটকালে যখন নামাজের প্রয়োজনীয় সুরা, তাশাহুদ, দরুদ, মুখস্থ করা শেষ হলো, তখন মোনাজাত হিসাবে আমরা শিখলাম-রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাহ, ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ ওয়াকিনা আজাবান্নার। আমাদের ইহকালের কল্যাণ দাও এবং পরকালের কল্যাণ দাও, এবং দোজখের আগুনের কঠিন আজাব থেকে রক্ষা কর। একটি মাত্র আয়াতের এই ছোট্ট মোনাজাতটি যে কত ব্যাপক ও বিশাল এক প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে, তখন সেটা বুঝিনাই। পরবর্ত্তী জীবনে দেখলাম, হজ্জের পরিপেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়েছে। হজ্জের তাওয়াফের সময় এই দোয়া পড়তে হয়, রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে। আল্লাহর রাসুল তাওয়াফের সময় এটাই পড়তেন। সমস্ত হজ্জে এই দোয়া পড়ে আল্লাহর কাছে চাইতে আল্লাহ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা জানি না কিসে আমাদের কল্যাণ আর কিসে আমাদের অকল্যাণ। তাই চাওয়ার সময় আমরা কোন বাছবিছার করিনা, দুনিয়ার সব কিছুই চাইতে থাকি। আমি নিজে দেখেছি, পিতা অনেক সখ করে ছেলের জন্য মোটর বাইক কিনে বাড়ীতে আনলো রাতের বেলায়। সকালে ছেলে সেটা চালিয়ে প্রধান সড়কে উঠার সময় ট্রাকের সাথে ধাক্কা খেলো। আমরা আল্লাহর কাছে মোটর বাইক চেয়েছি, কিন্তু তাতে কল্যাণ চাইনি। নিজের কাধে এই সব দায়িত্ব নেবো কেন? আমরা চাইবো দুনিয়ার কল্যাণ, আল্লাহ আমাদের সেই সবই দিবেন যাতে আমাদের কল্যাণ রয়েছে। আমরা চাইবো আখিরাতের কল্যাণ, আল্লাহ আমাদের আখিরাতের সমস্ত কল্যাণ দিবেন। আল্লাহ কি দিবেন না দিবেন সেটা আল্লাহর উপরই ছেড়ে দিই। আমাদের প্রয়োজন কল্যাণ, এবং সেটা দুনিয়াতে ও আখিরাতে।

وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে-হে পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে দুনয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদিগকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (২ঃ২০১)

৬৮
১০ই জিলহজ্জের মধ্যেই হজ্জের সমস্ত কাজগুলি সম্পন্ন করা সম্ভব। কিন্তু এর পরেও তিন দিন মিনায় অবস্থান করতে হয়। জাহিলিয়াত যুগে এই সময় মীনাতে মেলা বসতো। মেলাতে বিভিন্ন গোত্র তাদের বংশের গৌরবগাথা কবিতার মাধ্যমে প্রচার করতো। কিন্তু ইসলাম এই সব প্রথা বাতিল ঘোষনা করেছে। এই সময় শুধুমাত্র আল্লাহর প্রসংসা ও মহিমা প্রকাশ করতে হবে। সব সময়ই উচ্চস্বরে আল্লাহর জিকির ও তাকবির পাঠ করতে হবে। এই তিন দিনকে তাশরিকের দিন বলা হয়। তাশরিকের তাকবির হলো- আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, ওয়া লিল্লাহিল হামদ। শুধুমাত্র হাজীদের জন্য নহে, আমরা যারা দেশে থাকবো, তাদের জন্যও এই তিন দিন নামাজের পড়ে এই তাকবির উচ্চস্বরে পড়া ওয়াজিব। সবাইকে উচ্চস্বরে ঘোষনা দিতে হবে, বংশের গৌরব, মহিমা, মাহাত্য, শ্রেষ্ঠত্ব বলে কিছু নাই। সব গৌরব, মহিমা, শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা এবং প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। আল্লাহু আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

আর স্মরণ কর আল্লাহকে নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি দিনে। অতঃপর যে লোক তাড়াহুড়া করে চলে যাবে শুধু দু, দিনের মধ্যে, তার জন্যে কোন পাপ নেই। আর যে লোক থেকে যাবে তাঁর উপর কোন পাপ নেই, অবশ্য যারা ভয় করে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং নিশ্চিত জেনে রাখ, তোমরা সবাই তার সামনে সমবেত হবে। (২ঃ২০৩)

৬৯

আল্লাহ তা'লা চাচ্ছেন যে, আমরা যেন পরিপূর্ন ভাবে ইসলামে প্রবেশ করি। এখানে কোন দ্বিধা-দন্দ্ব, কোন সন্দেহ এবং আংশিক আনুগত্যের কোনই সুযোগ নেই। প্রয়োজন শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পন - কেননা এর স্বপক্ষে সমুদয় প্রমানাদি এতই স্পস্ট যে এতে কোন দ্বিধার অবকাশ নেই। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দূগর্তি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই"(২"৮৫)। সুতরাং পরিপূর্ণ ভাবেই ইসলামকে গ্রহণ করতে হবে। ঘরে বাইরে, হাটে বাজারে, কাজে কর্মে, ব্যবসা বাণিজ্যে, আচার বিচারে, আনন্দ উৎসবে, অফিস আদালতে, গণভবন বঙ্গভবনে, জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ইসলামের প্রতিফলন থাকতে হবে। তাহলে আমরা কেন এখনো অপেক্ষমান? আপনি কী চান মহান আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাগণ সহ মেঘের পিঠে চড়ে নীচে নেমে আসবেন? তিনি সত্যিই তা করবেন তবে সেটি ঘটবে রোজ হাশরের দিনে। সেটি ঘটার জন্য অপেক্ষা করলে আমাদের খুবই দেরী হয়ে যাবে। বিশ্বাসে ফিরে আসার আর কোন সুযোগই থাকবে না। তাই, এক্ষুনি এই মুহূর্তেই ইসলামে পূর্ণ ভাবে দাখিল হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ

হে ঈমানদার গন! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।
অতঃপর তোমাদের মাঝে পরিস্কার নির্দেশ এসে গেছে বলে জানার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হও, তাহলে নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ, পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।
তারা কি সে দিকেই তাকিয়ে রয়েছে যে, মেঘের আড়ালে তাদের সামনে আসবেন আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ ? আর তাতেই সব মীমাংসা হয়ে যাবে। বস্তুতঃ সব কার্যকলাপই আল্লাহর নিকট গিয়ে পৌঁছবে।
(২ঃ২০৮-২০৯-২১০)

৭০

মদিনায় যখন মুসলমানগন অতীব দুঃখ কষ্টের মাঝে দিনাতিপাত করছিল তখন অনেকেই হতাশ হয়ে পড়েছিল, কখন আল্লাহর সাহায্য এসে পৌছাবে? কখন তারা সুখের মুখ দেখবে? এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ অতীতের উদাহরণ টেনে নীচের আয়াত নাজিল করেন। আল্লাহর প্রশ্ন, তোমরা কী এমনি এমনিই বেহেশতে প্রবেশ করবে? তোমাদের ঈমানের দৃঢ়তা কী পরীক্ষা করা হবে না? অথচ তোমাদের পূর্ব প্রজন্মকে এমন ভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল যে তারা প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল।

তাদেরকে দূর্ভিক্ষ, ভীতি, যুদ্ধ, বিপর্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রভৃতি দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাদের করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছে। লোহার চিরুনী দিয়ে তাদের চামড়া মাংস খুলে ফেলা হয়েছে। আল্লাহ তা'লার সাহায্যের জন্য তারা হাহাকার করে উঠেছিল। সুতরাং মদিনার মুসলমানদেরও ধৈর্য ধারন করতে হবে। আল্লাহর সাহায্য আসবেই। বর্তমান যুগেও আমাদের উপর এধরনের পরীক্ষা নেমে আসতে পারে এবং তা যেকোন সময়ে অথবা যেকোন স্থানে। ধৈর্যের সাথে আমাদের তা মোকাবিলা করতে হবে। নিশ্চয়ই অতি সত্বর আল্লাহর সাহায্য নেমে আসবে।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ

তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনি ভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী। (২:২১৪)

৭১

সৎকাজে ধন সম্পদ ব্যয় করার কথা আসলেই প্রথমেই আমাদের মনে আসে ফকির মিসকিনদের কথা, মকতব-মাদ্রাসা-মসজিদে দান করার কথা। কিন্তু মহান আল্লাহ নিম্নের আয়াতে আমাদের একটি তালিকা দিয়েছেন যে কোথায় আমাদের ধন সম্পদ ব্যয় করতে হবে। এই তালিকার প্রথমেই স্থান পেয়েছে পিতা-মাতার নাম। অর্থ্যাৎ সবচেয়ে বেশী খরচ করতে হবে পিতা-মাতার জন্য। তাদের প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশী priority পাবে। কিন্তু আমাদের সমাজে আমরা দেখি যে আমাদের পিতা-মাতাই সবচেয়ে বেশী neglected। পাশ্চাত্য সভ্যতায় বৃদ্ধকালে পিতা-মাতার স্থান একমাত্র বৃদ্ধাশ্রমে। যদিও মুসলিম সমাজে এই বর্বরতা এখনও ঐ পর্য্যায়ে পৌছেনি। সুরাহ বনি ইসরাইরের ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ তালা পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করাকে আল্লাহর এবাদত করার পর্য্যায়ে ফেলেছেন। সুতরাং সবকিছুতেই পিতা-মাতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। পিতা মাতার পরে আসে আত্মীয় স্বজনদের কথা। ধনী বা গরীব সব ধরনের আত্মীয় স্বজনদের জন্য যা ব্যয় করা হবে তা সবই সৎকাজে ব্যয়ের মধ্যে গন্য হবে। তৃতীয় পর্য্যায়ে আসে এতিম, মিসকিন বা দুর্দশাগ্রস্ত মুসাফিরদের কথা। এদের প্রয়োজনে সব সময় সামনে এগিয়ে আসতে হবে। বিদেশ-বিভুয়ে অনেক সময় ধনী ব্যক্তিরাও বিপদে পড়ে যায়। এদের সাহায্য করাও আমাদের দায়ীত্ব। উপরে যে খরচের কথা বলা হয়েছে সেগুলি জাকাতের বাইরে অতিরিক্ত খরচ। জাকাতের জন্য আলাদাভাবে সুরাহ তাওবাহ আয়াত ৬০তে বলা হয়েছে।

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ

তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও-যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্যে, আত্নীয়-আপনজনের জন্যে, এতীম-অনাথদের জন্যে, অসহায়দের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। আর তোমরা যে কোন সৎকাজ করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালভাবেই আল্লাহর জানা রয়েছে। (২০ঃ২১৫)

৭২

যুদ্ধকে আমরা সবাই ঘৃণা করি। আমরা ভাবি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ব্যতীত সব ধরনের সমস্যা সমাধান হওয়া উচিত। কিন্তু এ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় শেষ অস্ত্র হিসাবে যুদ্ধ দরকার হতে পারে। কথায় বলে, যদি যুদ্ধ এড়াতে চাও তবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। নিজেরা দুর্বল হলে প্রতিবেশী রাষ্ট্র আক্রমণ করার সাহস পবে এবং এতে যুদ্ধের আশংকা আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই আল্লাহ অন্য আয়াতে আমাদেরকে যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আমাদের শত্রু ও আল্লাহ্‌র শত্রুরা ভয় পায় (৮ঃ৬০)। আমাদেরকে সব ধরনের অত্যাচার, অবিচার ,জুলুম, স্বৈরাচার ও মানবতা-বিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করতে হতে পারে। এর মাঝেই রয়েছে আমাদের কল্যাণ। মহান আল্লাহ তা'লা বলেনঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না। (২:২১৬)

৭৩

জাহেলিয়াতের যুগ থেকেই ৪টি মাসকে পবিত্র মাস হিসেবে ঘোষনা দেওয়া হয়-রজব, জিলকাদ, জিলহাজ ও মহররম। এই চার মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা সম্পুর্ন নিষিদ্ধ ছিল। মানুষ এই সময় নিশ্চিন্তে দেশ ভ্রমন করতে পারতো, ব্যবসা বানিজ্য ও হজ উপলক্ষে মক্কায় আসতো তারা। ইসলামও এই চার মাসের পবিত্রতা বজায় রাখে। কিন্তু বিশেষ কিছু কারনে এই সময়েও যুদ্ধ পরিচালনা করা যেতে পারে। কেউ যদি আল্লাহর পথে বাধা দান করে, অথবা মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দেয়, অথবা সেখান থেকে লোকজনকে বহিস্কার করে দেয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে যে কোন সময় যুদ্ধ পরিচালনা করা যেতে পারে, এমনকি হারাম মাসেও। ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটেছে। ফিতনা সৃষ্টিকারী কিছু লোক হজের মওসুমে কাবা ঘর দখল করে সেখানকার হাজীদের জিম্মি করে রাখে। তাদের কেউ কেউ নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবী করে। মুফতিদের ফতোয়া নিয়ে সরকার এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে এবং তাদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে উচ্ছেদ করা হয়। সুতরাং এই ধরনের ঘটনা ঘটলে হারাম মাস শেষ হবার অপেক্ষায থাকার দরকার নেই। ফিতনা হত্যার চেয়েও বড় অন্যায়। তাৎক্ষনিকভাবে তাদের বেরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করা যাবে। এই আয়াতের শেষে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তাদের সমস্ত সৎকর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে, তারা কাফের হিসেবে মৃত্যুবরন করবে, আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। এটা হল আখিরাতের শাস্তি। কিন্তু যারা মুরতাদ, তারা ইসলামকে হেয় করে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ইসলাম পরিত্যাগ করে। কপট ইহুদীরা প্রায়ই এটা করতো। তারা সকালে ইসলাম গ্রহণ করতো, আর বিকালে তা পরিত্যাগ করতো। এই ফিতনা সৃষ্টি হত্যার চেয়েও বড় পাপ। তাই আল্লাহর রাসুল মুরতাদদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন হাদিসে।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্দ্বকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ। বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন পরিত্যাগ করবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। (২:২১৭)

৭৪

মদ্যপান ছিল জাহিলিয়াত যুগে আভিজাত্যের প্রতীক। আরব-আজম সর্বত্র ছিল এর ব্যাপক প্রচলন। আর সে সময় আরবরা ছিল দারুণভাবে মদে অভ্যস্ত। ইসলাম মানুষের স্বভাবধর্ম। তাই মানুষের স্বভাব বুঝে আল্লাহ ক্রমধারা অনুযায়ী এটাকে নিষিদ্ধ করেছেন। শিশুকে বুকের দুধ ছাড়াতে মা যেমন ধীরগতির কৌশল অবলম্বন করেন, স্নেহশীল পালনকর্তা আল্লাহ তেমনি বান্দাকে মদের কঠিন নেশা ছাড়াতে ধীরগতির কৌশল অবলম্বন করেছেন। ইসলাম প্রথমে তার অনুসারীদের মানসিকতা তৈরী করে নিয়েছে। তারপর চূড়ান্তভাবে একে নিষিদ্ধ করেছে। আর যখনই নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, তখনই তা বাস্তবায়িত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এজন্য কোন যবরদস্তির প্রয়োজন হয়নি। মদ নিষিদ্ধের জন্য পরপর তিনটি আয়াত নাযিল হয়। বাক্বারাহ ২১৯, নিসা ৪৩ ও সবশেষে মায়েদাহ ৯০-৯১। প্রতিটি আয়াত নাযিলের মধ্যে নাতিদীর্ঘ বিরতি ছিল এবং মানুষের মানসিকতা পরিবর্তনের অবকাশ ছিল। প্রতিটি আয়াতই একেকটি ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হয়। যাতে মানুষ নিষেধাজ্ঞার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাকে সহজে গ্রহণ করে নেয়। নীচের আয়াতটি এই ধারাবাহিকতার প্রথম আয়াত। এখানে আল্লাহ জানিয়েছেন, মদের উপকারিতার চেয়ে অপকারই বেশী। মদকে এই আয়াতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এই আয়াত নাজিলের পরে অনেক সাহাবী মদ খাওয়া ছেড়ে দেন, কেউ কেউ মদের মাত্রা কমিয়ে দেন। কারন তারা বুঝতে পেরেছিলেন, সামনেই আরো কড়া নির্দেশ আসতে চলেছে।

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا-

‘তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলে দিন যে, এ দু’টির মধ্যে রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য রয়েছে কিছু উপকারিতা। তবে এ দু’টির পাপ এ দু’টির উপকারিতার চাইতে অধিক’ (বাক্বারাহ ২ঃ২১৯)।

৭৫

ইসলাম গ্রহন না করা পর্যন্ত কোন মুশরিককে বিয়ে করা অথবা আমাদের কন্যাকে তাদের কাছে বিয়ে দেয়া ইসলামে সম্পূর্ন রূপে নিষিদ্ধ (হারাম) করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন আপোষ বা সমঝোতার সুযোগ নেই। একজন ইমানদার দাস-দাসীও একজন সুন্দর মুশরিক পুরুষ/মহিলাদের চেয়ে শ্রেয়। কারণ মুশরিকরা দোজখের দিকে পথ নির্দেশ করবে। অথচ আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তার জান্নাতের দিকে আহ্বান করেন। ইসলামে অবশ্য ইহুদী খৃস্টান মেয়েদের বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। "মুমিন সতীসাধ্বী নারী ও আহলে কিতাবের সতীসাধ্বী নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো...’ (সুরা : মায়েদা, আয়াত : ৫)। সম্ভাবনা আছে যে তারা ইসলামিক পরিবেশে থেকে ইসলামকে

বুঝবে ও গ্রহণ করবে। কিন্তু মুসলিম মেয়েদের কোনভাবেই ইহুদী খৃস্টানদের সাথে বিয়ে দেওয়া যাবে না।

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

আর তোমরা মুশরেক নারীদেরকে বিয়ে করোনা, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরেক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে। এবং তোমরা (নারীরা) কোন মুশরেকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরেকের তুলনায় অনেক ভাল, যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। তারা দোযখের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহ্বান করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।।(২:২২১)

৭৬

একজন সাবালিকা নারীর জন্য প্রতি মাসে হায়েজ হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রহমতও বটে। এই পদ্ধতিতে আল্লাহ একজন মহিলার গর্ভাশয়কে মাসে একবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেন। এতে গর্ভাশয়টি সন্তান ধারনের উপযুক্ত থাকে। বয়সকালে যখনই এই হায়েজ বন্ধ হয়ে যায়, তখন থেকেই মহিলাটি সন্তান ধারনে অক্ষম হয়ে পড়ে। বিভিন্ন ধর্মে হায়েজ কালে মহিলাদের সম্পূর্ণ অচ্ছুৎ মনে করা হয়। এই সময় তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া, চলাফিরা ঘুমানো ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামে এটাকে স্বাভাবিক ভাবে নিতে বলা হয়েছে। স্বামী শুধু স্ত্রীগমন করবে না, আর মহিলারা নামাজ আর রোজা পরিহার করবে । অবশ্য পরে রোজার কাজা করতে হবে। এর বাইরে মহিলারা সব কিছু স্বাভাবিক ভাবে করবে । এমনকি স্বামী স্ত্রী এক সাথে শয়ন করতেও পারবে। আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেনঃ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তম রূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন। (২:২২২)

৭৭

আমাদের কারো কারো কথায় কথায় শপথ করার একটা প্রবনতা রয়েছে। বিশেষ করে স্ত্রীদের ব্যাপারে আমরা খুব তাড়াতাড়ি এবং ঘন ঘন শপথ নিয়ে থাকি। শপথ নিতে হলে অবশ্যই তা সতর্কতার সাথে নিতে হবে। যদিও অনিচ্ছাকৃত শপথের জন্য দোষী সাবস্ত করা হবে না, তথাপি শপথ করা থেকে বিরত থাকায় শ্রেয়। যা করার জন্য মন শক্ত ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ , শুধু সে ব্যাপারেই শপথ নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন সৎকাজ না করার জন্য শপথ নেওয়া যাবে না। আমি অমুকের সাথে

কথা বলব না, অমুককে সাহায্য করব না, এই ধরনের শপথ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই ধরনের শপথ করলে তা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ এসেছে হাদিসে। এবং কোন কারনে শপথ ভাঙতে বাধ্য হলে তার কাফফারা দিতে হবে (সুরাহ মায়েদা ৫ঃ৮৯)। মহান আল্লাহ বলেনঃ-

لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে ধরবেন না, কিন্তু সেসব কসমের ব্যাপারে ধরবেন, তোমাদের মন যার প্রতিজ্ঞা করেছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী ধৈর্য্যশীল। (২.২২৫)

৭৮

বিবাহ একটি সামাজিক চুক্তি। রাস্ট্র ও ধর্ম একে স্বীকৃতি দেয় ও লালন করে। এই চুক্তি করার আগে বিভিন্ন রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়; যেমন পাত্র পাত্রী নির্বাচন, অভিভাবকদের মধ্যে আলাপ আলোচনা, বিবাহ চুক্তির শর্তাবলী নির্ধারণ, সরকারী কাজির সাহায্যে চুক্তিনামা তৈরী, দুজন সাক্ষীর সামনে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান এবং সর্ব শেষে চুক্তিপত্রটি রেজিস্ট্রিকরণ। এত কিছু করার পরেই একটি বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং পাত্র-পাত্রী স্বামী স্ত্রী হিসাবে বসবাস করার সামাজীক ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় অনুমতি পায়।এই চুক্তি সারা জীবনের জন্য বলবত থাকে। কেউ যদি কোন অতীব জরুরী প্রয়োজনে এই চুক্তি ভেঙে ফেলতে চায়, তবে ইসলামিক পরিভাষায় তাকে তালাক বলে। ইসলামে হুট করে কাউকে তালাক দেওয়া যায় না। বিবাহ চুক্তি করার সময় যে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল, চুক্তি ভাঙার সময়ও ঠিক একই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্ত্রীর সাথে বনিবনা না হলে তাকে উপদেশ দিতে হবে, তাকে বোঝাতে হবে। এতে কাজ না দিলে সাময়িক ভাবে তার বিছানা আলাদা করে দিতে হবে, তাকে শাসন করতে হবে, মৃদু প্রহারও করা যেতে পারে (৪ঃ৩৪)। অবস্থা আরো খারাপ হলে শালিশী করার জন্য স্ত্রীর পক্ষের একজন আত্মীয় এবং স্বামীর পক্ষের একজন আত্মীয়কে ডাকতে হবে (৪ঃ৩৫)। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'লা চান যে বিবাহ চুক্তিটি বজায় রাখার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হউক। তালাক দেবার আগে শেষ চেষ্টা হিসাবে আল্লাহ স্বামীকে স্ত্রী থেকে আলাদা থাকার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু সেটা শুধু ৪ মাসের জন্য। এই সময় সীমার মধ্যেই তাকে স্ত্রীর সাথে সমস্ত বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে হবে। এজন্য তিনি তার পক্ষের এবং স্ত্রীর পক্ষের আত্মীয় স্বজনদের সহায়তা গ্রহন করতে পারেন । কিন্তু কোন ভাবেই তিনি ৪ মাসের বেশি সময় স্ত্রীকে ঝুলিয়ে রাখতে পারবেন না। এ প্রসঙ্গে কোরআনের নির্দেশ নিম্ন রূপ ঃ-

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবেনা বলে কসম খেয়ে বসে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। অতঃপর যদি পারস্পরিক মিল-মিশ করে নেয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু। (২:২২৬)

৭৯

ইসলামে তালাক দেয়াকে সবচেয়ে ঘৃণার কাজ হিসাবে অনুমতি দেয়া হয়েছে। তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী স্বামীগৃহে ৩ হায়েজ কাল পর্যন্ত অবস্থান করবে। একে ইদ্দত বলে। আর গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে ইদ্দত বাচ্চা প্রসব করা পর্যন্ত। আর স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীর ইদ্দত কাল ৪ মাস ১০ দিন। বৃদ্ধা এবং যাদের হায়েজ এখনও শুরু হয় নি, তাদের জন্য ইদ্দত ৩ মাস। তিন হায়েজের মধ্যেই যদি প্রকাশিত

হয় যে স্ত্রী গর্ভবতী, তবে ইদ্দত কাল বর্ধিত হয়ে যাবে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত। ইদ্দত কাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক বলবৎ হবে না। ইদ্দত কালের যে কোন সময় স্বামী তার স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারেন। কারন এতে বিবাহ ভঙ্গ হয়না এবং একে অপরকে ফিরে পাওয়ার সব রকম অধিকারই তাদের রয়েছে। ইদ্দত শেষ হবার সময় দুই জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রেখে হয় স্ত্রীকে রেখে দিতে হবে, নয়তো তাকে পরিত্যাগ করতে হবে (সুরাহ তালাক্ব ৬৫ঃ২)। এই ভাবেই এক তালাক কার্যকর হয়। পাক ভারত উপমহাদেশে এক সাথে তিন বা ততোধিক তালাক দেবার যে ধারনা রয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল এবং অসম্ভব, কারন এক তালাকই কার্যকর হতে তিন হায়েজ সময় প্রয়োজন। তাই তিন তালাক একসাথে দিলেও এক তালাক কার্যকর হবে। তবে আনন্দের বিষয় এই যে আমাদের দেশে মুসলিম পারিবারিক আইনে কোরআনের এই নির্দেশকেই অনুসরণ করা হয়। মহান আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেন:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাত দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েজ নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীরদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (২:২২৮)

পাক ভারত উপ মহাদেশে স্ত্রীকে একবারেই ৩ তালাক দেওয়ার এক ফতোয়া চালু আছে। কিন্তু স্ত্রীকে একবারেই ৩ তালাক বা ৪ তালাক প্রদান করা সম্ভব নহে। কারণ এক তালাক বলবৎ হতেই সময় লাগে কমপক্ষে তিন মাস, ইদ্দত (৩মাস) সমাপ্ত হওয়ার পর। এই ইদ্দতের মধ্যে স্বামী যে কোন সময় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারেন। আবার তালাক বলবত হয়ে যাবার পরেও স্বামী আবার বিয়ে করে স্ত্রীকে ঘরে তুলতে পারেন। ফিরিয়ে নেবার পর এবং স্বামী স্ত্রী মিলিত হবার কিছুদিন পর স্বামী যদি স্ত্রীকে পুনরায় তালাক দেন, তাহলে এটি দ্বিতীয় তালাক হিসাবে গন্য হবে। এর সব রেকর্ডই কাজী অফিসে থাকতে হবে। ইসলামের ২য় খলিফা হযরত উমর (রঃ) এর সময় কাল পর্যন্ত তালাকের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিই অনুসৃত হতো। পরবর্তীতে লোকেরা নিজেদের সুবিধার্থে এবং স্বার্থের জন্য একবারেই ৩ তালাক গননা শুরু করে, যা নিশ্চিত রূপেই কোরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী এবং এতে মাত্র এক তালাক কার্যকর হবে। তালাকের সময় আগে স্ত্রীকে দেওয়া ধন সম্পদ থেকে কোন কিছু ফেরত নেওয়া যাবে না। এ ছাড়াও আর এক ধরনের তালাক আছে যা স্ত্রী চাইতে পারে স্বামীর কাছে। একে খোলা তালাক বলে। কিছু বিনিময়ের পরিবর্তে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে খোলা তালাক নিতে পারে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে।

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

তালাক দুবার পর্যন্ত, তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয় তাদের কাছ থেকে। কিন্তু

যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙঘন করবে, তারাই জালেম।(২:২২৯)

৮১

আগের দুই আয়াত দিয়ে আমরা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছি যে একই সাথে তিন তালাক দেওয়া কোন ভাবেই সম্ভব নহে। একটি ঘটনার পরে শুধুমাত্র একটি তালাকই কার্যকর করা যায় ইদ্দত শেষ হবার পরে। এই ভাবে একটি মানুষ ও একটি মহিলার ক্ষেত্রে জীবনে শুধু দুইবার এই তালাকের ঘটনা ঘটতে পারে। তৃতীয়বার এই ঘটনা ঘটলে সেটা Permanent তালাক হয়ে যাবে। সেখান থেকে আর ফিরে আসা যাবে না। ঐ মহিলা তখন ঐ পুরুষের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। এটাকে বাইন তালাক বলে। এই লিমিট করে দেওয়া হয়েছে যাতে পুরুষেরা তালাকের যথেচ্ছ ব্যবহার না করে, যাতে স্বামীর মনে ভয় থাকে যে আর একবার এই মহিলাকে তালাক দিলেই সে চিরজীবনের জন্য তার জীবন থেকে হারিয়ে যাবে। তবে ভবিষ্যতে যদি ঐ মহিলা কাউকে বিয়ে করে ঘর সংসার করে এবং ঐ স্বামীর মৃত্যু হয় বা সে তালাক দেয়, তখন ঐ মহিলা আবার আগের স্বামীর জন্য হালাল হবে। এটাকে হীলা বলে। কিন্তু আমাদের দেশে যেভাবে হীলাকে সাজানো হয় সেটা কোনভাবেই জায়েজ নহে। এটা ব্যভিচারে পরিণত হয়ে যায়। আসলে সমস্যা হল এক সাথে তিন তালাকের ভুল ফতোয়াটি। তালাকের কোরানিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে এই সাজানো হীলার কোন প্রয়োজনই পড়ে না। আসুন আমরা কোরআনকে অনুসরণ করি এবং দেশের শত শত পরিবারকে ভেঙ্গে যাবার হাত থেকে রক্ষা করি। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে সরকারী ভাবে যে মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসরণ করা হয়, সেটা সম্পূর্ণ কোরআন হাদিস ভিত্তিক।

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোন পাপ নেই। যদি আল্লাহর হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। আর এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা; যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়। (২ঃ২৩০)

৮২

কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী তালাক পুরোপুরি বলবৎ হবার পর এবং স্বামী-স্ত্রী সম্পূর্ন বিচ্ছেদের পর যদি তারা পুনরায় পরস্পরকে বিয়ে করতে চায় তবে এতে কারো বাধা প্রদান করা উচিৎ নয়। এ বিষয়ে বাঁধা না দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'লা সাবধান করে দিয়েছেন। কারন প্রাক্তন স্বামী- স্ত্রী'র একে অপরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার অধিক অধিকার রয়েছে। অবশ্য এই নির্দেশ তৃতীয়বার তালাকের পরে প্রযোজ্য নহে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ-

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ন করে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান করো না। এ উপদেশ তাকেই দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ ও কেয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (২:২৩২)

৮৩

সুবহানাল্লাহ!! ইসলাম একটি তালাকপ্রাপ্ত দম্পতির শিশুদের জন্যও লালন-পালনের খুব সুন্দর ব্যবস্থা রেখেছে। একজন মাতা বাচ্চাকে পূর্ন দুবছর দুধ পান করাতে পারেন এবং পিতা এই দুগ্ধ দানকারী মাতার দেখা শোনার দায়িত্ব পালন করবেন। বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া সত্ত্বেও মা এ শিশুটির জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। পিতারও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া উচিৎ নয়। পরস্পর বোঝা-পড়ার মাধ্যমে শিশুটির দুধ খাওয়ানো অথবা লালন পালনের ভার অর্থের বিনিময়ে তৃতীয় কোন দুধ মাতাকেও দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে শিশুটি যেন সুষ্ঠভাবে লালিত পালিত হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের কারনে শিশুর যেন ক্ষতি না হয়। আত্মীয় স্বজনদের উপরও এর দায় দায়ীত্ব বর্তায়।এখানে আরো একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিশুরা পূর্ণ দুই বছর মায়ের দুধ পান করবে। সুরাহ লোকমানের ১৪ নম্বর আয়াতেও অনুরূপ নির্দেশ আছে। যে কোন শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারও ঠিক এই মতই দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ-

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ন দু'বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ, পিতার উপর হলো সে সমস্ত নারীর খোর-পোষের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী। কাউকে তার সামর্থাতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা হয় না। আর মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। এবং যার সন্তান তাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না। আর ওয়ারিসদের উপরও দায়িত্ব এই। তারপর যদি পিতা-মাতা ইচ্ছা করে, তাহলে দু'বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়িয়ে দিতে পারে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই, আর যদি তোমরা কোন ধাত্রীর দ্বারা নিজের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে যদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও তাতেও কোন পাপ নেই। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ অত্যন্ত ভাল করেই দেখেন। (২:২৩৩)

৮৪

ইদ্দত কাল হচ্ছে ঐ নিষিদ্ধ দিনগুলি যখন কোন তালাকপ্রাপ্ত মহিলা নতুন কোন স্বামী গ্রহণ করতে পারে না এবং ইদ্দত সময়কালে তাকে পুরাতন স্বামীর ঘরেই বসবাস করতে হয়। সাধারণ ভাবে তালাকের পর মেয়েদের ইদ্দত কাল হচ্ছে তিন হায়েজ কাল। বৃদ্ধদের এবং যে সব মেয়েদের এখনও হায়েজ হয়নি, তাদের ইদ্দত তিন মাস। স্বামী স্পর্শ করার পূর্বেই যদি কোন মহিলা তালাকপ্রাপ্ত হয়, তবে তার ইদ্দত নাই। আর যদি কোন মহিলা সন্তান সম্ভবা হয় তবে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তার ইদ্দত। তবে যদি কারো স্বামী মারা যায়? স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর ইদ্দত কাল ৪ মাস ১০ দিন। ইসলামের ইদ্দত পালনের বিধান এক অভিনব স্বাস্থ্যসম্মত বৈজ্ঞানিক বিধান যা অন্য কোন ধর্মে নাই। তিন মাস হায়েজের পর এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই মহিলার গর্ভে আগের স্বামীর সন্তানের কোন ভ্রূণ নাই। দ্বিতীয়তঃ আগের স্বামীর বীর্যের সাথে বাহিত সমস্ত রোগ জীবাণু তিনটি হায়েজের সাথে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে স্বামী স্ত্রী তিন মাস সময় পান নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করার জন্য। কোরআনে বলা হয়েছেঃ

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতি সঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহর অবগতি রয়েছে। (২:২৩৪)

৮৫ .
কখনো এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যে, কোন মহিলাকে বিয়ে করার পর কোন কারণ বশত: তাকে স্পর্শ করার আগেই তালাক দিতে হবে। যেমন বিয়ের পর পরেই প্রকাশ পেলো যে তারা শিশুকালে একই মায়ের দুধ পান করেছে। ইসলামে দুধ ভাই-বোনের বিবাহ হারাম। বাধ্য হয়ে তখন একে অপরকে তালাক দিতে হয়। এ পরিস্থিতিতেও কোরআন দিক নির্দেশনা দিয়েছে। যদি মেয়েটির কোন মোহর নির্ধারিত না হয়ে থাকে, তাহলে সমাজে তার অবস্থান অনুযায়ী ভাল ধরনের উপহার প্রদান করতে হবে। যদি মোহর নির্ধারিত হয় তাহলে মোহরের অর্ধেক পরিমান মেয়েটিকে প্রদান করতে হবে। যদি সে মোহরের আংশিক অথবা পূর্নাংশ মাফ করে দেয় তাহলে এটা তার বদান্যতা । আর যদি ছেলেটি পূর্ণ মোহর প্রদান করে তবে এটা তার পরহেজগারি । আল্লাহ তা'লা চমৎকার ও ন্যায় সঙ্গত সিদ্ধান্ত দান করেছেনঃ

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দেবে। আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী। যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব।
আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার

অধিকারে সে (অর্থাৎ স্বামী) যদি ক্ষমা করে দেয় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা কর, তবে তা হবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সেসবই অত্যন্ত ভাল করে দেখেন। (২:২৩৬-২৩৭)

৮৬

সমস্ত নামাজের ব্যাপারে আমাদের যত্নবান হতে হবে, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের ব্যাপারে। মধ্যবর্তী নামাজ কী? হাদীসে পাওয়া যায় যে, এটি আছরের নামাজ। আল্লাহ তা'লা এই নামাজের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারন মানুষের আসরের নামাজ মিস করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময় মানুষ কাজে এতো বেশী ব্যস্ত থাকে যে সে বুঝতেই পারে না কখন আসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আবার অনেকে দুপুরের ঘুমকে এতো বেশী প্রলম্বিত করে ফেলে যে সেটা আসরের ওয়াক্তকে অতিক্রম করে যায়। তাই এই নামাজের ব্যাপারে আল্লাহ নতুন করে সতর্কতা জারী করেছেন। অবশ্য কোন নামাজকেই অবহেলা করা যাবে না। যদি কখনো ভয় অথবা যুদ্ধ অথবা এমন কোন জরুরী অবস্থা বিদ্যমান থাকে যাতে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নামাজ আদায় করা অসম্ভব, সে অবস্থাতেও আমাদের নামাজ পড়তে হবে। দাঁড়ানো অবস্থায়, হাটতে হাটতে, গাড়ি চালানো অথবা উড়ন্ত অবস্থায়ও নামাজ আদায় করতে হবে। তবে রুকু ও সেজদা করতে হবে ইঙ্গিতে। তথাপিও নামাজ ছেড়ে দেয়ার জন্য কোন অজুহাত প্রদর্শন করা যাবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, নামাজ সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। তাই যথা সময়েই নামাজ আদায় করতে হবে। আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেনঃ

حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও। অতঃপর যদি তোমাদের কারো ব্যাপারে ভয় থাকে, তাহলে পদচারী অবস্থাতেই পড়ে নাও অথবা সওয়ারীর উপরে। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে, যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না। (২:২৩৮-২৩৯)

৮৭

আল্লাহ তা'লা ঋণ চান, উত্তম ঋণ, কর্জে হাসানাহ। আমরা ভাগ্যবান যে, আল্লাহ তা'লা আমাদের নিকট থেকে ঋন গ্রহন করেন। আল্লাহ তা'লার চেয়ে উত্তম ঋন গ্রহীতা আর কে হতে পারে? কি সেই ঋণ যাকে আল্লাহ কর্জে হাসানাহ বলেছেন, উত্তম ঋণ বলেছেন? 'কর্জে হাসানাহ' মানব জীবন ব্যবস্থার এক বিশেষ অর্থনৈতিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। কর্জে হাসানাহর অর্থ হচ্ছে ঋণ বা কর্জ দেয়া যা সময়মতো পরিশোধ করা হবে, কিন্তু দাতা কোনো অতিরিক্ত অর্থ বেনিফিট নিতে পারবেন না। এর উদ্দেশ্য হল, সমাজের ঋণগ্রস্ত মানুষের একটি প্রয়োজন পূর্ণ করা। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ বা প্রতিষ্ঠানের নানা সময়ে নানা কারণে সাময়িক ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সবসময় ব্যক্তির কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ থাকে না। কিন্তু সম্ভাবনা থাকে যে, পরে কর্জ পরিশোধ করতে পারবে। এজন্য আল্লাহতায়ালা 'কর্জে হাসানাহ' ইসলামী নীতির বিধান রেখেছেন যেন মানুষ সাময়িকভাবে 'কর্জে হাসানাহ' নিতে পারে সুদ ছাড়া এবং পরে তা দিতে

পারে। কেননা সুদকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। ফলে কোনো ব্যক্তির পক্ষে সুদের ভিত্তিতে অর্থ নেয়া উচিত নয়। কোরআনের আরো বেশ কিছু আয়াতে কর্জে হাসানাহর কথা এসেছে (আল হাদিদ- ১১ ও ১৮, তাগাবুন- ১৭, মায়িদাহ- ১২ ইত্যাদী)। আল্লাহ এই ঋণের প্রতিদান দিবেন বহু গুন বৃদ্ধি করে, ইহকাল এবং পরকালে। যখন শেষ বিচারের দিন আমরা পেরেশান হয়ে নেকী খুঁজতে থাকব, সে সময় মহান আল্লাহ ঐ ঋনের বহু গুন পুরস্কার আমাদেরকে দান করবেন। আর এই ঋণ দিলে আমাদের সম্পদ কমে যাবার সম্ভাবনা নাই, কারন আল্লাহই আমাদের রুযীকে সংকুচিত করেন অথবা প্রশস্ততা দেন।। প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এখনও সময় আছে, যতটুকু সম্ভব আল্লাহ তা'লাকে ঋন প্রদান করুন এবং বহুগুন সওয়াবের জন্য প্রতীক্ষায় থাকুন।

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

এমন কে আছে যে, আল্লাহকে ঋণ দেবে, উত্তম ঋণ; অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। আল্লাহই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে। (২:২৪৫)

৮৮

দাউদ আঃ এর আগ পর্য্যন্ত ইসরাইলীদের কোন রাজা ছিল না। নবীগন আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি বিধান নিয়ে সেগুলি জারী করতেন। সেই বিধানের আলোকেই গোত্র প্রধানগন বিচারকার্য্য পরিচালনা করতেন। শুধুমাত্র জটিল বিষয়গুলি নবীদের গোচরে পেশ করা হতো। তাছাড়া যুদ্ধের আদেশ নিষেধও নবীরাই দিতেন। আল্লাহর এই বিধান ইসরাইলীদের পছন্দ হলো না। তারা নবী শামাইলের কাছে ধর্না দিয়ে বসলো, যেন তাদের জন্যও অন্য জাতীদের মত একজন রাজা নির্ধারন করে দেওয়া হয়। নবী আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ বললেন, তারা আসলে আল্লাহর শাসন থেকে মুক্ত হয়ে রাজার শাসনে থাকতে চায়, এতে ক্ষতিই হবে তাদের। রাজার শাসনে কি কি ঘটতে পারে, তা বিস্তৃতভাবে আল্লাহ নবীকে জানিয়ে দিলেন। তৌরাতে আছে- 1 Samuel (8:15-18) - He will take a tenth of your grain and of your vintage and give it to his officials and attendants. Your menservants and maidservants and the best of your cattle, and donkeys he will take for his own use. He will take a tenth of your flocks, and you yourselves will become his slaves. When that day comes, you will cry out for relief from the king you have chosen, and the LORD will not answer you in that day. এর পরেও ইসরাইলীগন তাদের দাবীতে অটল থাকে। রাজার রাজত্বই কাম্য তাদের। অবশেষে আল্লাহ তালুতকে তাদের রাজা নিযুক্ত করলেন। তালুত ছিলেন সাধারন এক মানুষ। কিন্তু জ্ঞানে ও দৈহিক শক্তিতে তিনি সবার থেকে এগিয়ে ছিলেন। তবুও তাকে রাজা হিসাবে মেনে নিতে ইসরাইলীগন গড়িমসি করতে লাগলো। আল্লাহ রাজা হবার নিদর্শন হিসাবে ইসরাইলীদের কাছে তাদের হারানো সিন্দুকটি পাঠিয়ে দিলেন, যে সিন্দুকে মুসা আঃ এর লাঠি ও অন্যান্য দ্রব্যাদী সংরক্ষিত ছিল। অবশেষে ইসরাইলীগন তালুতকে রাজা হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়। ইসরাইলীগন আল্লাহর রাজত্ব ছেড়ে তাদের বহু সাধের রাজার রাজত্ব লাভ করলো।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর। অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত। (২:২৪৭)

৮৯

তালুত ইসরাইলীদের রাজা হবার পর তার প্রথম যুদ্ধাভিযান ছিল আমালিকাদের রাজা জালুতের বিরুদ্ধে। জালুত ছিল বিশাল দেহের অধিকারী মহাশক্তিশালী এক পালোয়ান। এই যুদ্ধে তালুতের বাহিনীতে দাউদ আঃ ছিলেন এক সামান্য সৈনিক। খর্বাকার ছিলেন বলে তিনি তলোয়ারও বহন করতেন না। তার অস্ত্র ছিল গুলতি (ফিঙ্গা) এবং সাথে ব্যবহারের জন্য ছোট ছোট কিছু পাথর। যুদ্ধের ময়দানে দীর্ঘকায় জালুত সামনে এগিয়ে এসে দ্বন্দ- যুদ্ধের আহবান জানালেন। তালুতের বাহিনী থেকে কেউ এগিয়ে আসার সাহস দেখালেন না। দাউদ আঃ সামনে এগিয়ে গেলেন, হাতে গুলতি (ফিংগা)। একটি পাথর ভরলেন ফিংগাতে, তারপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছুড়লেন জালুতের দিকে। পাথরটি উড়ে যেয়ে জালুতের কপালে বসে গেল। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল জালুত। দাউদ আঃ দৌড়ে গিয়ে জালুতের তরবারী টেনে নিয়ে তার শিরচ্ছেদ করলেন। তারপর আরম্ভ হলো সর্বাত্বক যুদ্ধ। জালুতের দল হেরে পালিয়ে গেল সেই যুদ্ধে। এখানে উল্লেখ্য যে দাউদ আঃ নতুন এক অস্ত্র ব্যবহার করেছেন এই যুদ্ধে, যেটা দুর থেকে শত্রুর দিকে নিক্ষেপ করা যায়। এই ভাবেই তীরন্দাজ বাহিনীর উদ্ভব হয়। সেই যুগে তাদেরকেই বেশী শক্তিশালী মনে করা হতো, যাদের তীরন্দাজ বাহিনী দক্ষ ও শক্তিশালী। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে , আর রাম রাবনের লংকার যুদ্ধে তীরন্দাজদের অপূর্ব কলা-কৌশল আমরা পড়েছি। বর্ত্তমান যুগে তীরের সর্বশেষ সংস্করন হচ্ছে রকেট আর মিজাইল শক্তি। দাউদ আঃ এর আর এক উদ্ভাবন ছিল লৌহের ব্যবহার। লৌহ দিয়ে তিনি বর্ম তৈরী করতেন যা শত্রুর আঘাত থেকে সৈন্যদের রক্ষা করতো। ঐ যুগে বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিস্কারকে তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। বর্ত্তমানে বর্মের উন্নত সংস্করন হচ্ছে ট্যাংক বহর। লৌহ দিয়ে আবৃত ট্যাংকের অবয়ব, আর তার মাঝে নিরাপদে অবস্থান নেন সেনাগন। লৌহের এই আশ্চর্য ক্ষমতাকে আল্লাহ সুরা হাদিদে বর্ণনা করেছেন - লৌহের মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য অশেষ কল্যান ও শক্তি।

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

তারপর ঈমানদাররা আল্লাহর হুকুমে জালূতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা। আর তাকে যা চাইলেন শিখালেন। আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়। (২:২৫১)

৯০

আল্লাহ তা'লা এই পৃথিবীর মানুষদের হেদায়েতের জন্য হাজার হাজার নবী ও রাসুল প্রেরন করেন। সব নবী-রাসূলগনের মর্যাদা কিন্তু এক রকম নয়। আল্লাহ একেক নবীকে একেক রকম মর্যাদা দিয়েছেন। সুরাহ বনি ইসরাইলের ১৭ঃ৫৫ নম্বর আয়াতেও আল্লাহ একই রকম কথা বলেছেন-- "

আমি তো কতক পয়গম্বরকে কতক পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এবং দাউদকে যবুর দান করেছি"। নবীদের কাউকে কাউকে বিশেষ নিদর্শন প্রদান করা হয়েছিল। কোন কোন নবীর সাথে আল্লাহ তা'লা সরাসরি কথা বলেছিলেন, কোন নবীকে আল্লাহ পিতা ছাড়াই জন্ম দিয়েছেন, কোন কোন নবীকে আল্লাহ জিবরাঈল আঃ কে দিয়ে সহায়তা করেছেন। এবং তাদের প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব ছিল, বিশেষ বিশেষ গোত্রের নবী ছিলেন তারা। প্রত্যেক নবীর সুনির্দিষ্ট মিশন ছিল এবং আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে নানাবিধ মাজেজা প্রদর্শনীর ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। তাঁদের দায়িত্ব ছিল ভিন্ন ভিন্ন, নিদর্শন প্রদর্শনের ক্ষমতাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এমন কী আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের মর্যাদাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন । কিন্তু মুহম্মদ (সঃ) নিশ্চিত রূপে ছিলেন শেষ নবী- খাতামন নাবীয়্যিন এবং সকল নবীদের নেতা ও শ্রেষ্ঠ রাসূল। এবং তিনি কোন একক গোত্রীয় নবী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমস্ত বিশ্বের নবী, বিশ্বের সমস্ত জাতী ও গোত্রের জন্য।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَـكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَـكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

এই রসূলগণ-আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ তো হলো তারা যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আর কারও মর্যাদা উচ্চতর করেছেন এবং আমি মরিয়ম তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট মু'জেযা দান করেছি এবং তাকে শক্তি দান করেছি 'রুহূল কুদ্দুস' অর্থৎ জিবরাঈলের মাধ্যমে। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে পরিস্কার নির্দেশ এসে যাবার পর পয়গম্বরদের পরবর্তী যারা ছিল তারা লড়াই করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের কেউ তো ঈমান এনেছে, আর কেউ হয়েছে কাফের। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করতো না, কিন্তু আল্লাহ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন। (২: ২৫৩)

৯১
বিখ্যাত আয়াত উল কুরসির অনুবাদ নীচে দেওয়া হলো। আয়াতটিতে পূর্নরূপে আল্লাহ তা'লার সকল গুনাবলী , হেকমত, ক্ষমতা এবং জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীস মতে, এই আয়াতটি তেলওয়াত করা, এর অর্থ জানা এবং তা অনুভব করার মধ্যে অনেক উপকারীতা রয়েছে। প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে এই আয়াত পড়লে বেহেশত যাবার পথে মৃত্যু ছাড়া আর কোন বাধা থাকবে না। রাতে ঘুমানোর আগে পড়লে শয়তান থেকে হেফাজত করা হয়। আমাদের সকলেরই এই আয়াতটি মুখস্থ রাখা এবং যখনই সম্ভব তেলওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

اللهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কেউ কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (২:২৫৫)

৯২

ধর্মে কোন বাড়া বাড়ি নেই, কোন জোর জবরদস্তি নেই। কারন সত্য মিথ্যা থেকে এত সুস্পষ্ট ভাবে আলাদা হয়ে গেছে যে এখানে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আমাদের দায়িত্ব, যারা জানে না তাদের কাছে এ সত্যের বাণী পৌছিয়ে দেওয়া। এরপর তারা এটি গ্রহন করবে, না প্রত্যাখ্যান করবে, সেটি তাদের শুভ ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আর যদি তারা তা গ্রহন করে, তবে সে নিশ্চিত রূপে আল্লাহ তা'লার আশ্রয় পেয়ে যাবে। এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে মনে করেন যে এখন আর জিহাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটা ঠিক নহে। জিহাদের কারন এবং পরিপ্রেক্ষিত সম্পূর্ণ আলাদা। জিহাদের আয়াতগুলিতে সেগুলি আলোচনা করা হবে, ইনশা আল্লাহ। তাছাড়া ধর্মত্যাগী মুরতাদদের জন্য যে হাদিসে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার প্রেক্ষিতও আলাদা।

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে এক সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন। (২:২৫৬)

৯৩

অন্ধকারকে কে ভালবাসে? হয়তো কেউই না। বরং অন্ধকারকে আমরা ভয় পাই। কারন অন্ধকারই হলো অনিশ্চয়তা, অজ্ঞতা। অন্ধকার হলো একটি ভ্রান্ত পথ যা মানুষকে কুফুরীর জমাট কালো গহ্বরে নিক্ষেপ করে। অন্ধকারে থেকে সত্যকে উদঘাটন করা যায় না। তবে কীভাবে আলোর দিশা পাওয়া যাবে? আল্লাহর উপর ইমান এনে তাকে অবিভাবক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, তার বন্ধু হয়ে যেতে হবে। একমাত্র আল্লাহই মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। এটাই জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাচার একমাত্র পথ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেনঃ-

اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক (বন্ধু) । তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।।(২:২৫৭)

৯৪

অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করতেই চায় না যে আল্লাহ আখিরাতে মানুষদের আবার পুনরুত্থিত করবেন। যে মানুষের হাড় মাংস পচে গলে মাটির সাথে মিশে গেছে, তারা আবার কিভাবে জীবিত হবে? আল্লাহ মৃতকে কিভাবে জীবিত করবেন তার বেশ কিছু নিদর্শন তিনি নবীদের দেখিয়েছেন বিভিন্ন সময় । ইবরাহিম আঃ কে দেখিয়েছিলেন কিভাবে মৃত পাখীগুলি জীবিত হয়ে তার কাছে উড়ে আসলো। নীচের আয়াতটি এমনি আর একটি নিদর্শন। বেশিরভাগ উলেমাদের মতে আয়াতে বর্ণিত মানুষটি

উজায়র আঃ। ধ্বংস প্রাপ্ত এক নগরীতে তিনি যখন পৌছুলেন, তিনি ভাবলেন , কিভাবে এই নগরীকে আল্লাহ আবার জীবিত করবেন। আল্লাহ তাকে এবং তার গাধাকে মৃত্যু দিলেন। ১০০ শত বছর পরে তাদের আবার জীবিত করলেন। উজায়র আঃ প্রত্যক্ষ করলেন , কিভাবে তার মৃত গাধাটি আবার জীবিত হয়ে উঠলো। তিনি বলে উঠলেন - নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়টি বুঝতে আরো সহজ করে দিয়েছে। সামান্য একটু টিস্যুকে ক্লোন করে তারা ল্যাবে আস্ত এক জীবের সৃষ্টি করছে। যে কোন মানুষের DNA কে বিকশিত করে তারা অবিকল সেই মানুষের দেহকে সৃষ্টি করতে পারে। আল্লাহর জন্য তো দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা আরো সহজ। মায়ের পেটের পরিবর্তে মানুষের DNA গুলিকে মাটির নীচে বিকশিত করা হবে। দেহ পুষ্ট হলে আত্মাগুলি নিজ নিজ দেহে প্রবেশ করবে। তারপর যখন বিউগল বেজে উঠবে, মানুষেরা মাটি ফুড়ে বেরিয়ে আসবে আর দৌড়াতে থাকবে প্যারেড গ্রাউন্ডে জমায়েত হবার জন্য।

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِـي هَـَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ মরনের পর একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল আমি ছিলাম, একদিন কংবা একদিনের কিছু কম সময়। বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশ বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে-সেগুলো পচে যায় নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হল, তখন বলে উঠল-আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। (২:২৫৯)

৯৫

এটা মৃতকে জীবিত করার দ্বিতীয় ঘটনা। ইবরাহীম আঃ এর মনে প্রশান্তি আনার জন্যই আল্লাহ এই অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন জাতের চারটি পাখীকে পোষ মানালেন ইবরাহীম আঃ। চারজনের চারটি নাম দিলেন। তারা এমন পোষ মানলো যে নাম ধরে ডাকলেই নির্দিষ্ট পাখীটি ছুটে আসতো। চারটি পাখীকেই জবেহ করলেন তিনি। মাংসগুলি মিশিয়ে নিলেন। তারপর চার ভাগ করে চারটি পাহাড়ে রেখে আসলেন। এর পরেই ঘটতে থাকলো সেই অলৌকিক ঘটনা। ইবরাহীম আঃ প্রথম পাখীটির নাম ধরে ডাক দিলেন। চারটি পাহাড় থেকেই প্রথম পাখীটির শরীরের অংশগুলি উড়ে এসে একত্রিত হলো। তারপর জীবিত হয়ে পাখীটি ইবরাহিম আঃ এর পায়ের কাছে হাজির হল। দ্বিতীয় পাখীটিকে ডাকলেন ইবরাহীম আঃ। তারপর তৃতীয়কে এবং চতুর্থ পাখীকে। পর পর চারটি পাখীই জীবিত হয়ে ইবরাহীম আঃ এর চার পাশে জমায়েত হল। হতবিহবল ইবরাহিম আঃ অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করলেন মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি কৌশল।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন; তুমি কি বিশ্বাস কর না? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্যে

চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক; তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞান সম্পন্ন। (২ঃ২৬০)

৯৬

আল্লাহর পথে কিছু ব্যয় করলে সেই ব্যয়ের প্রতিদান কী হবে? আল্লাহ তা'লা এই প্রতিদানের একটি সহজ হিসাব দিয়েছেন । এটি একটি শষ্য দানার মতো যা মাটিতে বপন করা হয়েছে , যা থেকে একটি গাছ এবং ঐ গাছে সাতটি শীষ বেরিয়ে এসেছে, প্রতিটি শীষে ১০০টি করে শষ্য দানা ফলেছে। একটি গাছ থেকে ৭০০টি শষ্য দানা উৎপাদিত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা যদি একটি বীজ বপন করি তবে তা থেকে ৭০০টি শস্য দানা পাবো। এটি হচ্ছে সবচেয়ে কম প্রতিদান, এক টাকার বিপরীতে ৭০০ টাকা ক্যাশ ব্যাক। আল্লাহ তা'লা ঘোষনা দিয়েছেন যে একটি দানকে তিনি বহুগুন এবং সীমাহীন ভাবে বর্ধিত করে দেবেন। আল্লাহর কি অশেষ রহমত !!

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আর আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। (২:২৬১)

৯৭

আমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করে প্রতিদানের আশায় অপেক্ষা করি। কিন্তু আল্লাহ যে পুরস্কার দেবেন, তার জন্য দুটি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। প্রথমত: লোকের কাছে প্রশংসা পাওয়ার আশায় দানের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ প্রচার করা যাবে না। দ্বিতীয়ত: দান গ্রহন কারীকে কোন রকম খোটা দেয়া যাবে না অথবা তার নিকট থেকে অধিকতর শ্রদ্ধা আশা করা যাবে না অথবা তার কাছ থেকে কোন বিনিময় আদায় করা যাবে না। এই দান সম্পূর্নরূপে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করতে হবে , কোন জাগতিক উদ্দেশ্যে নয়। দানের ক্ষেত্রে এদুটি শর্ত পূরন করার পরই কেবল আমরা আল্লাহ তা'লার নিকট থেকে পূর্ন প্রতিদান আশা করতে পারি । কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন :

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

যারা স্বীয় ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। (২:২৬২)

৯৮

সাধারনত: ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়ার আগে আমরা নানাবিধ প্রশ্ন করে থাকি। যেমন, ভিক্ষা কেন কর? কাজ করতে পারো না? সন্তান তোমাকে খেতে দেয় না? বাপ তোমাকে খাওয়াই না? এ ধরনের নানা

প্রশ্ন করে বোঝার চেষ্টা করি যে, সে আসলে অভাবী না ভিক্ষা তার পেশা। এ সবের পর তার থালায় একটি মুদ্রা ঠকাস করে ছুড়ে দিয়ে খুবই সন্তুষ্টি বোধ করি যে আজ কিছু সাদাকাহ করতে পারলাম। কিন্তু এ পক্রিয়া মোটেই সঠিক নয়। ভিক্ষুককে বাক্য বানে জর্জরিত করার চেয়ে ভিক্ষা না দেয়া অনেক ভাল। সুরাহ দোহাতেও আল্লাহ ভিক্ষুককে ধমক দিতে নিষেধ করেছেন। ভিক্ষা না দিতে চাইলে নম্র কথায় মাফ চেয়ে নিতে হবে। আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেন:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

নম্র কথা বলে দেয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা ঐ দান খয়রাত অপেক্ষা উত্তম, যার পরে কষ্ট দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা সম্পদশালী, সহিষ্ণু। (২:২৬৩)

৯৯

আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে সতর্কতার সাথে চিন্তা করতে এবং সাধারন প্রজ্ঞা ব্যবহারের জন্য বার বার তাগিদ দিয়েছেন। তিনি চান আমাদের সকল কর্ম, সকল প্রচেষ্টা এবং সব ধরনের দান খায়রাত যেন বৃথা না হয়ে যায়। সারা জীবনের আমল যেন বৃদ্ধ কালে শয়তানের প্ররোচনায় বিনষ্ট হয়ে না যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লাহ বলেন, ,আপনার একটি বাগান আছে। সেখানে সব ধরনের ফল ও আঙ্গুর রয়েছে। কিন্তু আপনি এখন বৃদ্ধ এবং আপনার সন্তানেরা এতই দুর্বল যে তারা ফল আহরণ করতে অক্ষম। আপনি কী চান যে আপনার বাগানটি এসময় ঝড় বা আগুনে বিনষ্ট হয়ে যাক? কখনোই না। তাই আমাদের সতর্ক হতে হবে যেন আমাদের আমল বিনষ্ট হয়ে না যায়। মানুষ যত বৃদ্ধ হয় ততই তার দুইটি জিনিষের মোহ বেড়ে যায় - যশ ও অর্থ। এই দুইটি জিনিষ অর্জনের জন্য সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। যা কিছু ভাল কাজ করে, তা মানুষকে দেখিয়ে দেখিয়ে করে যাতে জনতা তাকে ধন্য ধন্য করে। সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য সে যে কোন পন্থা অবলম্বন করে। এমনকি নিজের মেয়ে সন্তানকে বঞ্চিত করার জন্য নানা বাহানা খুজতে থাকে। সাবধান, সাবধান। বৃদ্ধ বয়সে এসে যেন আমরা যৌবনের আমলকে বিনষ্ট না করি। মহান আল্লাহ বলেনঃ-

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

তোমাদের কেউ পছন্দ করে যে, তার একটি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হবে, এর তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে, আর এতে সর্বপ্রকার ফল-ফসল থাকবে এবং সে বার্ধক্যে পৌছবে, তার দুর্বল সন্তান সন্ততিও থাকবে, এমতাবস্থায় এ বাগানের একটি ঘূর্ণিবায়ু আসবে, যাতে আগুন রয়েছে, অনন্তর বাগানটি ভষ্মীভূত হয়ে যাবে? এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে নিদর্শনসমূহ বর্ননা করেন-যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর। (২ঃ২৬৬)

১০০

শয়তান আমাদের কানে কানে কি কু-মন্ত্রনা দেয়? সে আমাকে আপনাকে ভয় দেখায় যে, আল্লাহর পথে দান করলে আমরা গরীব হয়ে যাব, আমাদের ধন সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে। এবং সে এই ভাবে আমাদের কৃপনতার পথ দেখায়। শয়তানের আর এক কাজ হচ্ছে মানুষকে অশ্লীলতার দিকে আকর্ষণ করা। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ

তা'লার প্রতিশ্রুতির চেয়ে আর কার প্রতিশ্রুতি সত্য হতে পারে? আসুন, আমরা আল্লাহর মাগফেরাত আর করুণার দিকে ধাবিত হই । মহান আল্লাহ বলেন ঃ-

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ।।(২:২৬৮)

১০১
হিকমত (প্রজ্ঞা) হলো একজন ব্যক্তিকে দেয়া আল্লাহ তা'লার অতি বিশেষ ও মুল্যবান দান। কেউ কেউ জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে একসাথে হিকমত বলেছেন। সঠিক মত বা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকেও হিকমত বলে। হিকমত এমন এক জ্ঞান যার সাহায্যে মানুষ সুক্ষ ভাবে বিচার ফায়সালা করতে পারে। বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান এবং কোন কিছুর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোঝার ক্ষমতাও হিকমতের পর্যায়ভুক্ত। যে হিকমত লাভ করল সে সত্যিই ভাগ্যবান এবং সে যেন আল্লাহর কাছ থেকে বিশাল কল্যান লাভ করলো। হিকমত ওয়ালা মানুষই কেবল আল্লাহর শিক্ষা এবং এর সুক্ষ তাৎপর্য বুঝতে ও গ্রহন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ বলেনঃ-

يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ

তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান (হিকমত) দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভুত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান। (২:২৬৯)

১০২
কেউ যদি কোন কারনে আল্লাহর নামে মানত করে বসে, তবে তা পূরণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কারন আল্লাহতায়ালা কোরআনে বলেছেন, 'তারা যেন তাদের মানতসমূহ পূর্ণ করে। তবে ইসলাম মোটেও মানত করার জন্য উৎসাহিত বা অনুপ্রাণিত করেনি। মানত করা হয়ে থাকে মূলত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওপর শর্ত আরোপের মাধ্যমে। আল্লাহ যদি আমার এই আশাটি পূর্ণ করেন, তবে আমি প্রতিদানে ঐটা করব, এটাই মানত। আল্লাহর সাথে শর্ত সাপেক্ষে কোন কিছুর অঙ্গিকার করা, এই ধারণাটিই মুলতঃ দৃষ্টিকটু। সবচেয়ে উত্তম, আগেই সৎকাজটি করা, এবং পরে আশা পূরণের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা। অথবা কোন আশা পূরণ হলে শোকরানা স্বরূপ বিভিন্ন সৎকাজ করা। তাই মানত করা জায়েজ হলেও আল্লাহর রাসুল একে নিরুৎসাহিত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের মানত করতে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন, "মানত কোনোকিছুকে ফেরাতে পারে না। তবে মানতের মাধ্যমে কৃপণ ব্যক্তির সম্পদ বের করা হয়"। কৃপণ বে বখিল ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দান করতে চায় না। তখন আল্লাহতায়ালা তার বিভিন্ন রোগ বালাই, বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে দেন। আর তখন সে মানত করে বসে। আল্লাহ এই কৃপণের মাল থেকে এভাবেই গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু পীর দরবেশ, কোন লোকের নামে, বা মাজারে মানত করা সম্পূর্ণ শিরক।

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

তোমরা যে খয়রাত বা সদ্ব্যয় কর কিংবা কোন মানত কর, আল্লাহ নিশ্চয়ই সে সব কিছুই জানেন। অন্যায়কারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (২ঃ২৭০)

১০৩

সুরাহ বাকারার ২৭০ থেকে ২৭৪ নম্বর আয়াতগুলিতে দান খয়রাত করার বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে। আগের পোষ্টে আমরা মানত সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এখন আসবে দান খয়রাতের কথা। সাধারন অবস্থায় গোপনে দান করাই সবচেয়ে উত্তম। হাদিসে এসেছে - তোমরা ডান হাতে দান করো, বাম হাত যেন তা না জানে। হাদিসের এই কথাটি বাইবেলে অবিকল একই বাক্যে এসেছে। গোপনে যারা দান করে, তাদের জন্য হাশরেও Special ব্যবস্থা আছে। আল্লাহর আরশের নীচে ছায়াতে স্থান পাবে তারা। কিন্তু এতে যেন কেউ মনে না করেন যে প্রকাশ্যে দান করা যাবে না। অবশ্যই যাবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে এতে যেন রিয়া না হয়ে বসে। রিয়া বা লোক দেখানো দান পুণ্যকে নষ্ট করে দেয়। প্রকাশ্যে দান করার সময় একটাই উদ্দেশ্য থাকবে - আমার দান করা দেখে যাতে অন্যরা দান করতে উৎসাহী হয়। এখন প্রশ্ন, দানের পাত্র কারা? অভাবগ্রস্থ যারা তারাই দান পাবার উপযুক্ত। আত্মীয় স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, জাতী ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত অভাবগ্রস্ত লোকেরাই এর মধ্যে শামীল। অনেকে মনে করেন, অন্য ধর্মের লোকদের দান করা যাবে না। এটা ঠিক নহে। কাউকে হেদায়াত দেবার মালিক তো আল্লাহ। আমদের দায়ীত্ব, অভাবগ্রস্তকে দান করা, সে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খৃস্টান যে ধর্মেরই হোক না কেন। অনেকে আছেন যারা অভাবগ্রস্ত, কিন্তু দান চাইতে লজ্জা পান। লোকে তাদের অভাবমুক্ত মনে করে। এদেরকে খুজে খুজে বের করে দান করা উত্তম। সুতরাং দান করুন। দান করুন দিনে রাতে, দান করুন গোপনে বা প্রকাশ্যে, দান করুন যে চায় তাকে - যে চায় না তাকেও। আর প্রতিদানে আল্লাহর কাছে রয়েছে অশেষ পুরুস্কার।

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্যে তাদের সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন আশংঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (২ঃ২৭৪)

১০৪

সুদ ইসলামে নিশ্চিত রূপে হারাম ও নিষিদ্ধ। রাসুল (সাঃ) এর সময় ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যক্তিগত ভাবে সুদের ব্যবসা করা হতো। তাই সে সময়ে কোনটি সুদ গ্রহন ও কোনটি ব্যবসা এবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে দ্বিধা-দন্দ ছিল না।কিন্তু আজকের দিনে এটি বোঝা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কোন ব্যাংক সুদের উপর প্রতিষ্ঠিত আর কোন ব্যাংক ইসলামী (শরিয়তের) পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিভ্রান্তি এ কারনেই যে, ইসলামীক ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংক প্রায় একই প্রকারের সফ্ট ওয়ার ব্যবহার করে। এখানে শুধুই নাম করণের ভিন্নতা দেখা যায়। তবে এতে কোনই সন্দেহ নেই যে আমাদের বিশাল পল্লী অঞ্চল জুড়ে যে মাইক্রো ঋন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে তা পুরোপুরি ভাবেই সুদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই কোন রকম সন্দেহ পোষন ব্যতিরেকে একে এড়িয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে কোরআনের ভাষ্য:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দন্ডায়মান হবে, যেভাবে দন্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছেঃ ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মত! অথচ আল্লাহ তা'লা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে (সুদ থেকে), তাহলে পূর্বে যা হয়ে গেছে, তার ব্যাপার আল্লাহর উপর সোপর্দ। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।।।(২:২৭৫)

১০৫

নীচের আয়াতটিই কোরআনের সব চেয়ে বড় আয়াত। অথচ আমরা অধিকাংশ লোকই এই আয়াতের নির্দেশনা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নই । ফলে আমরা সামাজিক ও আর্থিক জীবনে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হই । বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন এবং ব্যবসায়ের অংশীদারদের সাথে আমাদের অধিকাংশ সমস্যা সৃষ্টি হয় ত্রুটিপূর্ণ টাকা পয়সা লেন-দেন নিয়ে। কোরআন এ বিষয়ে এক সুদীর্ঘ দিক নির্দেশনা দিয়েছে আমাদের জন্য। সুরা বাকারার সবচেয়ে দীর্ঘ এই আয়াতটিতে আল্লাহ আমাদের সকল ধরনের মেয়াদী ঋন লেন দেনের ক্ষেত্রে লিখিত ভাবে প্রমানাদি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তা ছাড়াও ব্যবসার সকল ক্ষেত্রে লিখিত ডকুমেন্ট রাখতে হবে। আমরা তা অনুসরণ না করলেই বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হবে। বন্ধুত্বে ফাটল ধরবে, আত্মীয়তা ছিন্ন হবে, ব্যবসায়ী অংশীদারদের সাথে কলহ হবে, মামলা মোকদ্দমায় জীবন তিক্ত হয়ে উঠবে। অবশ্য নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন লেখালেখির দরকার নাই। তাই আসুন, সামাজীক ও আর্থিক জীবনে আমরা এই আয়াতকে দৃঢ় ভাবে আকড়ে ধরি এবং সমস্ত ঝুট ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋনের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া। এবং ঋন গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশ কম না করে। অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দূর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। দুজন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে। যদি দুজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের অস্বীকার করা উচিত নয়।

তোমরা এটা লিখতে অলসতা করোনা, তা ছোট হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এ লিপিবদ্ধ করণ আল্লাহর কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহকে ভয় কর তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সব কিছু জানেন। (২:২৮২)

১০৬

সব কিছুরই হিসাব-নিকাশ হবে। আমরা কি চিন্তা ভাবনা করছি, আমাদের মনে কি আছে, গোপনে আমাদের মানস পটে কিসের ছবি খেলা করে , তার সব কিছুই আমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। সে কারনেই ভাল ভাল জিনিস দেখা, ভাল কথা শোনা, ভাল সঙ্গী থাকা এবং ভাল পরিবেশে বাস করা অতীব গুরুত্ব পূর্ন। তাহলেই আমরা আমাদের মনকে পবিত্র রাখতে পারবো। তাহলেই চিন্তা-ভাবনায় ভালর উপস্থিতি থাকবে এবং কোন মন্দ ও অনৈতিক বিষয় আমাদের অন্তরে বাসা বাঁধতে পারবে না। এই আয়াত নাজিলের পরে সাহাবীরা খুবই ঘাবড়িয়ে যান। কারন মনের উপর তো কারো কোন কন্ট্রোল নেই। কত ধরনের চিন্তা মনে উদয় হয়। এগুলোর জন্য শাস্তি হলে তো মহা বিপদ। তারা রাসুলের কাছে গেলেন। রাসুল সাঃ বললেন, তোমরা বল যে আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম (وَقَالُواْ وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا) । আল্লাহ তা'লা এই কথাগুলি এতই পছন্দ করেছেন যে পরের আয়াতেই তিনি এটা উল্লেখ করেছেন এবং সুরার শেষের আয়াতে সাহাবীদের আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে, আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না (وُسْعَهَا إِلاَّ نَفْسًا اللهُ يُكَلِّفُ لاَ)। আল্লাহ সুবহানু তা'লা মহা করুণাময়।

لِّلّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে আছে, সব আল্লাহরই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (২:২৮৪)

১০৭

নীচে সুরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত দেওয়া হোল। হাদিসে এই দুই আয়াতের অনেক ফযিলতের কথা বলা হয়েছে। রাতে শোবার আগে এই দুই আয়াত পড়ে শুলে মহান আল্লাহ তাকে হেফাজত করবেন। মুসলিম শরীফে এসেছে যে মিরাজের রাতে মহান আল্লাহ তার রাসুলকে এই দুই আয়াত উপহার দেন যা অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয় নি। কি কি বিষয়ের উপর ইমান আনতে হবে তার এক সুন্দর বর্ণনা প্রথম আয়াতে রয়েছে। নবীদের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য করি না, এর অর্থ সম্মান পাওয়ার বেলায় সব নবীরা সমান। আমরা সব নবীদের সমান ভাবে সম্মান দেবো। দ্বিতীয় আয়াতে রয়েছে আল্লাহর

রহমত , দয়া ও তার অনুগ্রহের বর্ণনা । তিনি মানুষকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না। তাছাড়া কিভাবে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করতে হবে, তার সুন্দর এক উদাহরণ এই আয়াত।

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমুহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (২ঃ২৮৫)

لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভূ! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্যে কর। (২ঃ২৮৬)

সুরাহ আলে ইমরান

১০৮

হাইয়ু এবং কাইয়ুম- আল্লাহর দুটি বিশেষ গুন যা বিশ্বের কোন সৃষ্টির মাঝে নেই। হাইয়ু অর্থ চিরঞ্জীব, যার মৃত্যু নেই, কোন ধ্বংস নেই। তিনি সব সময় ছিলেন, এখনও আছেন, এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন, অনাদী কাল, অনন্ত কাল পর্য্যন্ত। মহা বিশ্বের সব কিছু ধ্বংস হবে একদিন, শুধুমাত্র আল্লাহর সত্ত্বা ছাড়া। চির অক্ষয় তিনি, চির অমর তিনি। এই একটি গুনই যথেষ্ট আল্লাহকে চেনার জন্য। এটা এক কষ্টিপাথর। বিশ্বের যে কোন সৃষ্টি যদি নিজেকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে দাবী করে, তবে তাকে পরীক্ষা করার জন্য এই কষ্টিপাথর প্রয়োগ করতে হবে। দেখতে হবে তিনি অমর কিনা, তিনি অক্ষয় কিনা। যদি তার শুরু থাকে আর শেষ থাকে, যদি তার জন্ম থাকে আর মৃত্যু থাকে, তবে কখনও সে আল্লাহর

সমকক্ষ হতে পারে না। তাই ইসা আঃ আল্লাহর সমকক্ষ নহে, রাম-কৃষ্ণ আল্লাহর কমকক্ষ নহে, ব্রম্মা-বিষ্ণু আল্লাহর সমকক্ষ নহে, ভগবান রজনীশ আল্লাহর সমকক্ষ নহে। । আল্লাহ এক, একক, চিরঞ্জীব, অক্ষয়। আল্লাহর দ্বিতীয় অন্য গুন হচ্ছে তিনি কাইয়ুম, মহাবিশ্বের ধারক, সংরক্ষনকারী, পর্যবেক্ষক। যারা মহা বিজ্ঞানী, তারাই শুধুমাত্র আল্লাহর এই ক্ষমতাকে উপলব্ধি করতে পারেন। কিভাবে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে, কিভাবে কোটী কোটী গ্রহ-নক্ষত্র আল্লাহর বেধে দেওয়া নিয়ম মেনে শৃংখলার সাথে মহাবিশ্বে ভেসে চলেছে, এই নিয়মের এতটুকু ব্যত্যয় ঘটলেই মহাবিশ্বে মহা বিপর্য্যয় নেমে আসবে, এখানেই আল্লাহ কাইয়ুম, এখানেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, মহা সংরক্ষনকারী। আল্লাহর এই অদ্বিতীয় দুটি গুনের কথা কোরআনের আরো দুই স্থানে এসেছে- আয়াতুল কুরসিতে ও সুরা ত্বাহাতে। আল্লাহর এই মহাগুন ও অসীম ক্ষমতাকে উপলব্ধি করার জন্য আল্লাহ আমাদের প্রজ্ঞা দান করুন।

اللهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। (৩:২)

১০৯
আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি যে কিভাবে মায়ের পেটে আমাদের আকৃতি গঠন করা হয়েছে? একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আকারের DNA যা খালি চোখে দেখা যায় না- সেটি কিভাবে মায়ের পেটে আমাদের শরীরের গঠনকে নয় মাস ধরে নিয়ন্ত্রন করে। আমরা দেখতে কেমন হবো- সাদা না কালো, আমাদের মুখ-মন্ডল কেমন হবে, নাক চেপ্টা না খাঁড়া, শরীরের উচ্চতা এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীন গঠন- সব কিছুই ঐ ক্ষুদ্র DNA কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। মায়ের জরায়ুতে সব কিছুই স্বয়ংক্রিয় ভাবে ঘটতে থাকে। শুধু তাই নয়, এই DNA আমাদের বংশের ধারাকে বহন করে চলেছে। একটি সন্তানের যে DNA, তার অর্ধেক আসে মায়ের কাছ থেকে আর বাকী অর্ধেক আসে বাবার কাছ থেকে। তাই ভাই বোনদের মাঝে আকৃতিগত অনেক মিল থাকে। পুরোপুরি মিল থাকে না কারণ তাদের DNA এর Internal Arrangement এ পার্থক্য থাকে। কী অসাধারণ বিস্ময়কর প্রকৌশলগত কর্মকান্ড- যা আমাদের কল্পনায় ধারন করা অসম্ভব । সুবহানাল্লাহ!

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। (৩:৬)

১১০
পবিত্র কোরআনের অধিকাংশ আয়াতই খুবই স্পস্ট এবং ব্যখ্যা মূলক । এই আয়াতগুলিই কোরআনের মুল ভিত্তি। এ ছাড়াও কিছু আয়াত আছে যার অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউই জানেন না। যেমন , আলিফ, লাম, মিম ইত্যাদি। এ গুলির অর্থ এক মাত্র আল্লাহই জানেন। এর বাইরে কিছু রূপক আয়াত আছে-- যেমন , ' তুমি মৃত দেরকে শুনাতে পার না', ' তাদের চোখ আছে কিন্তু দেখে না', ' তাদের কান আছে কিন্তু শুনে না'', হে দুই শিং ওয়ালা (জুলকারনাইন), ফেরেশতাদের এক এক দুই দুই তিন তিন পাখা, ইত্যাদী ইত্যাদী । বিভিন্ন বিষয় বোঝানোর জন্য আল্লাহ এই সব আয়াত গুলি ব্যবহার করেছেন। যারা জ্ঞানে সুগভীর এবং যাদের বিজ্ঞানের জ্ঞান রয়েছে, তারাই এই আয়াতগুলি

বুঝতে পারেন। কিন্তু কিছু লোক আছে যাদের অন্তরে ব্যধি রয়েছে- তারা ঐসব রূপক আয়াত সমুহ নিয়ে বির্তক করে, তাদের অপব্যখা করে, এবং সেগুলি দিয়ে ফিতনা সৃষ্টি করে। দিনে মাত্র দুই ওয়াক্ত নামাজ আছে, কোরআনের আয়াত দিয়ে এটা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা করাও এই সব ফিতনাবাজদের কাজ। আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ

তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না, আর যারা জ্ঞানে সুগভীর। তারা বলেনঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। (৩:৭)

১১১

মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে তার ইমান। যার ইমান নাই, তার কিছুই নাই, সে সর্ব হারা। সে বিশ্বের একজন খুবই ধনবান ব্যক্তি হতে পারে, সারা বিশ্ব জুড়ে তার অধীনে হাজার হাজার লোক কাজ করতে পারে, সে হয়তো শত শত বহুজাতিক কোম্পানীর চেয়ারম্যান। কিন্তু সে কী আল্লাহকে বিশ্বাস করে? আল্লাহ তা'লার নির্দেশনানুযায়ী কি তার ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হয়? যদি তা না হয়, ,তাহলে এসব বিষয় সম্পত্তি, এসব অঢেল সম্পদ, কোম্পানীসমুহ এবং এগুলোর হাজার হাজার কর্মচারী , এ সবের কোনটিই তাকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللهِ شَيْئًا وَأُولَـئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ

যারা কুফুরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কখনও কাজে আসবে না। আর তারাই হচ্ছে দোযখের ইন্ধন। (৩:১০)

১১২

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর এবং উপভোগ্য বস্তুগুলো কী কী যা মানুষকে মোহগ্রস্ত করে রাখে? আল্লাহ তা'লা কোরআনে তার একটা সুন্দর তালিকা ১৫০০ বছর আগেই দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। বর্তমান যুগের বিচারে এগুলো হলো আমাদের রমণীকুল, সন্তানাদি , বৈদেশীক মুদ্রায় ব্যাংক ব্যালেন্স, সর্বাধুনিক অভিজাত গাড়ী (Branded), গবাদি পশুর বিশাল খামার বা র‍্যাঞ্চ, ও রিয়েল এষ্টেট সম্পত্তি। কিন্তু এসব উপভোগ এবং আরাম আয়েশের আয়োজন কেবলি পার্থিব জীবনের জন্য। তাই এসব অর্জনের জন্য ন্যায় নীতিকে বিসর্জন দেওয়া চলবে না। শরীয়তের গণ্ডীর মধ্যে থেকেই যা অর্জন করা সম্ভব, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কারন আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এমন সব বস্তুর সংবাদ দিয়েছেন যা উপরোল্লিখিত বস্তু হতে

উত্তম এবং অনন্ত । তা হচ্ছে বেহেশত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। পার্থিব আনন্দ অর্জন করতে যেয়ে আমরা যেন আমাদের অনন্ত কালের বাসস্থানকে হারিয়ে না বসি। কোরআনে এরশাদ হয়েছে..

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِالْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ
قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاوَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলবো?-যারা পরহেযগার, আল্লাহর নিকট তাদের জন্যে রয়েছে বেহেশত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত-তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন।।(৩:১৪-১৫)

১১৩

অনেক পন্ডিত এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ গর্ব করে বলেন যে তারা মানবতার ধর্মে বিশ্বাসী। বাস্তবে তারা নতুন একটি জীবনধারা আবিস্কার করে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী। তাদের এসব চেতনা উত্তেজক মতবাদ তরুন প্রজন্মের নিকট খুবই চিত্তাকর্ষক হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'লা ঘোষনা করেছেন যে, ইসলামই হচ্ছে একমাত্র জীবন বিধান যা তার নিকট গ্রহনযোগ্য। অন্যান্য সমস্ত মতবাদ একদিন না একদিন পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কম্যুনিজমের মত অতি শক্তিশালী এক মতবাদও আজ হারিয়ে গেছে। একই রকম কথা এই সূরার ৮৫ নম্বর আয়াতেও এসেছে। যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন (জীবন বিধান) কে তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত (৩:৮৫)। বস্তুত ইসলামকেই আল্লাহ একমাত্র মনোনীত দ্বীন এবং মুহাম্মাদ সঃ কে সমস্ত মানব জাতীর জন্য রাসুল হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। আর যারা ইসলামের বিরোধিতা করে সেইসব অবিশ্বাসীদের নিকট থেকে আল্লাহ অতি সত্বর হিসাব গ্রহণ করবেন। কোরআনে এরশাদ হচ্ছে ঃ-

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْوَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত। (৩:১৯)

১১৪

ইসলাম ও ইসলামের নবীকে আল্লাহ সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, "বলে দাও, হে মানব মন্ডলী। তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ প্রেরিত রসূল, সমগ্র আসমান ও যমীনে

তার রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর উপর তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার।" (৭ঃ১৫৮)। এর পরেও কেউ যদি ইসলাম সম্পর্কে তর্ক বিতর্ক করতে আসে, তবে তার সাথে কীভাবে কথা বলতে হবে, এ বিষয়েও আল্লাহ তা'লা পবিত্র কোরআনে নির্দেশনা দিয়েছেন। তা হল তাদের পেশকৃত যুক্তির প্রেক্ষিতে সহজ সরল ভাবে যুক্তির উপস্থাপন করতে হবে এবং বলতে হবে যে, আমরা সব কিছুই আল্লাহ তা'লার নিকট সমর্পন করেছি। খৃষ্টান, ইহুদী ও অন্যান্য জাতীগণকেও আহবান করতে হবে পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর কাছে আত্ম-সমর্পন করার জন্য। যদি তারা আত্ম-সমর্পন করে তবে সেটি তাদের জন্য মঙ্গল জনক, অন্যথায় আমাদের কর্তব্য হচ্ছে শুধু মাত্র আল্লাহর বাণী তাদের কছে পৌছে দেয়া।

فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْأَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তবে বলে দাও, "আমি এবং আমার অনুসরণকারীগণ আল্লাহর প্রতি আত্নসমর্পণ করেছি।" আর আহলে কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমরাও কি আত্নসমর্পণ করেছ? তখন যদি তারা আত্নসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হলো, আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো শুধু পৌছে দেয়া। আর আল্লাহর দৃষ্টির সামনে রয়েছে সকল বান্দা। (৩.২০)

.

১১৫

নীচের দুটি আয়াত মদিনার ইহুদীদের উদ্দেশ্য করে নাজিল করা হয়। ইহুদীরাই একমাত্র জাতী যারা ইসলামকে খুব কাছে থেকে দেখেছে, কোরআন ও ইসলামের নবীকে এমন ভাবে চিনেছে যেমন ভাবে তারা তাদের সন্তানকে চেনে। বস্তুতঃ তারা শেষ নবীর আগমনের অপেক্ষায় ছিল। শেষ নবী আগমনের সমস্ত লক্ষন তারা তৌরাত থেকে পেয়েছিল। এর পরেও তারাই ইসলামের চরম বিরোধিতা করে। তাদের হঠকারীতা, পথভ্রষ্টতা এবং শত্রুতা এমন পর্যায়ে পৌছায় যে আল্লাহর রাসুল তাদের মদিনা থেকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হন। কেন এই হঠকারিতা, কেন এই বিরোধিতা? আল্লাহ বলেন, তাদের এক ভুল ধারণায়ই তাদেরকে এমন করে তুলেছে। তাদের ধারনা যে অল্প কয়েকদিন ছাড়া তাদেরকে দোজখের আগুনে জ্বলতে হবে না। এই ধারণাই তাদেরকে বেশী Arrogant ও পথভ্রষ্ট করেছে, এই ধারণাই তাদেরকে সর্বশেষ ওহী অর্থাৎ কোরআনকে অবজ্ঞা করতে প্ররোচনা দিয়েছে। কিন্তু এ তথ্যটি তাদের নিজস্ব উদ্ভাবন এবং এ তথ্য দ্বারা তারা নিজেরাই প্রতারিত হচ্ছে। তাদের এই বিশ্বাস ও হঠকারিতা তারা বর্তমান যুগেও বজায় রেখেছে। ক্ষুদ্র এক জাতী গোষ্ঠী হয়েও সমস্ত বিশ্বের উপর তারা ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে-আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের আহবান করা হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা যায়। অতঃপর তাদের মধ্যে একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

তা এজন্য যে, তারা বলে থাকে যে, দোযখের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না; তবে সামান্য হাতে গোনা কয়েকদিনের জন্য স্পর্শ করতে পারে। নিজেদের উদ্ভাবিত ভিত্তিহীন কথায় তারা ধোকা খেয়েছে। (৩:২৩-২৪)

১১৬
মহান আল্লাহর সীমাহীন শক্তি ও মহা কুদরতের প্রকাশ ঘটেছে নীচের আয়াতে। সমস্ত সার্বভৌমত্বের অধিকারী তিনি। যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি রাজত্ব দান করেন, আবার যাকে ইচ্ছা তার রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। বিশ্বের ইতিহাস ঘাটলে অহরহ আমরা এটা প্রত্যক্ষ করি। আজ যিনি ক্ষমতার শীর্ষে, কাল হয়তো তাকে জেলের নির্জন সেলে দিন কাটাতে হচ্ছে। কথায় বলে, সকাল বেলা নবাব রে ভাই ফকীর সন্ধ্যা বেলা। আসল কথা হচ্ছে, আমরা যারা ক্ষমতার শীর্ষে রয়েছি, কখনও কি কোরআনের এই মহান আয়াতটি অনুধাবন করেছি? আমরা কি এই আয়াৎটি এক বারও পড়েছি এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করেছি? আমরা কি জানি যে সমস্ত সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহতা'লা? মহান আল্লাহ তা'লা মহা করুনা করে সেই সার্বভৌমত্ব আমাদেরকে দান করেছেন, শুধু মাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে জনগনকে শাসন করার জন্য ন্যায় নীতির সাথে। এই দায়ীত্ব কি আমরা ঠিক মত পালন করছি? জনগণ কি আমাদের শাসনে শান্তিতে আছে, দেশে কি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে, নির্যাতিত নিপীড়িত অসহায় মজলুমের ফরিয়াদ আল্লাহর দরবারে সবার আগে পৌছায়। মনে রাখতে হবে, এই দায়ীত্ব আল্লাহ তালা যে কোন সময় আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অন্যকে অর্পন করতে পারেন। এটাই বড় সত্য এবং মহা সত্য। মহান আল্লাহ বলেনঃ

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَنتَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।(৩:২৬)

১১৭
.নীচের আয়াতটি আগের আয়াতের ধারাবাহিকতা। আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতা ও কুদরতের আর এক প্রকাশ এই আয়াতে। মুলতঃ আল্লাহর ক্ষমতা বোঝানোর জন্য এই দুই আয়াত একসাথে পাঠ করা হয়। আমরা কী কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে আল্লাহ তা'লা কীভাবে দিন ও রাত্রিকে সৃষ্টি করেছেন যা পর্যায়ক্রমে একে অপরের পরে আসে। আল্লাহ পৃথিবীকে তার কক্ষ পথে স্থাপন করার পর লাঠিমের মত তাকে অক্ষের উপর ঘুর্ণায়মান করেছেন । এর ফলেই ২৪ ঘণ্টার দিবা-রাত্রি ঘটে। এ বিশ্ব জগতে অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র আছে যেগুলো তাদের অক্ষের উপর ঘোরে না। এই জন্য ঐ সব গ্রহ নক্ষত্রে দিন রাত্রি নাই।আবার অনেকে এত আস্তে বা জোরে ঘোরে যে তাদের দিন রাত্রি কার্যকর ভাবে চোখে পড়ে না। অর্থাৎ আল্লাহ উদ্দেশ্য মুলক ভাবেই পৃথিবীকে তার অক্ষের উপর এমন ভাবে ঘূর্ণায়মান করেছেন যাতে আমাদের জীবন ধারনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় এই ২৪ ঘণ্টার দিন-রাত্রি সৃষ্টি হয়। আরো এক কুদরতের কথা বলা হয়েছে এই আয়াতে। আল্লাহ জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। আবার সেই মৃত থেকেই বের করে আনেন জীবিতকে। প্রানী জগতে সব সময়ই এটা ঘটছে। মুরগী - ডিম - বাচ্চা, এর একটি উদাহরণ। সব শেষে আসে রিজিকের কথা। প্রানী জগতে যত জীব

আছে, সবার রিজিকের দায়ীত্ব আল্লাহ নিজ হাতে রেখেছেন। আর যাকে ইচ্ছা তাকে আল্লাহ দেন অফুরান রিজিক। সুবহানাল্লাহ। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে ঃ

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّوَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ

তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর।।(৩:২৭)

১১৮

একজন মুসলিম তার বন্ধু বা সাহায্যকারী হিসাবে একজন অমুসলিমের বিপরীতে অন্য একজন মুসলিমকেই বেছে নিবে। এতে ইমান ও আমলের ক্ষেত্রে অনেক সহায়ক পরিবেশের সৃষ্টি হবে। এই নীতি ব্যক্তিগত, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রযোজ্য। বন্ধু রাষ্ট্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে কোন অমুসলীম রাষ্ট্রের বিপরীতে অপর মুসলিম রাষ্ট্রকেই প্রাধান্য দিতে হবে। বর্তমানে মুসলিম রাষ্ট্র নায়কেরা কোরআনের এই নীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলেছে। অমুসলিম কিছু রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব অর্জনের জন্য তারা রীতিমত প্রতিযোগীতায় লিপ্ত রয়েছে। এতে নিজেদের মান সম্মান বিসর্জন দিতেও তারা কুন্ঠাবোধ করে না। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিম জনতা অমুসলিমদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একতা না থাকায় মুসলিমরা এই জুলুমের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছে না। সম্প্রতি গাজায় যে নৃশংস হত্যা যজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইল, চারিদিকের মুসলিম রাষ্ট্রগুলি অসহায় মেষ শিশুর মত সেটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। আজ কেন আমাদের এই করুন অবস্থা। এর একমাত্র কারণ, কোরআনের দিক নির্দেশনা গুলিকে আমরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলেছি। মহান আল্লাহ তা'লা বলেনঃ-

.

لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّأَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ

মুমিনগন যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। (৩:২৮)

১১৯

কিছু কিছু মানুষের মধ্যে হাদিসকে উপেক্ষা করার প্রবনতা দেখা যায়। তাদের মতে কোরআনকে অনুসরন করাই যথেস্ট। এ ধারনা সত্য নয়। কোরআন হচ্ছে মুল সংবিধান । তাই এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) এর জীবন ও কর্মই হলো কোরআনের ব্যাখ্যা এবং এগুলি হাদিস গ্রন্থ সমূহেই লেখা আছে। কোরআন বলেছে, নামাজ পড়। কিন্তু নামাজ কিভাবে পড়তে হবে, কয় ওয়াক্ত পড়তে হবে, কত রাকাত পড়তে হবে, এসব বিস্তৃত ভাবে রাসুল হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। হজ করতে যাবেন? রাসুল সাহাবীদের বলেছেন, "আমাকে দেখ আমি কিভাবে হজ্জ করি। তোমরাও এই ভাবে হজ্জ করবে"। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও রাসুলকে

অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে। তাই সুন্নাহর জ্ঞান ছাড়া কোরআনকে অনুসরণ করা অসম্ভব। আল্লাহ নিজেও তার রাসুলকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন নীচের দুই আয়াতে। আল্লাহকে ভালবাসতে চাইলে রাসুলকে ভালবাসা ও অনুসরণ করার বিকল্প অন্য কিছু নাই। নিজেদের পাপকে মার্জনা করিয়ে নেবার এটাই একমাত্র পথ। মহান আল্লাহ তা'লা বলেন:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
قُلْ أَطِيعُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। বলুন, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুতঃ যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না। (৩:৩১-৩২)

১২০
ইমরানের স্ত্রী মানত করেছিলেন, তার গর্ভে যে সন্তান আছে তাকে তিনি আল্লাহর রাস্তায় স্বাধীন করে দিবেন। তার দৃঢ় ধারনা ছিল, তার গর্ভে নিশ্চয়ই পুত্র সন্তান আছে যাকে জেরুজালেমের মসজিদের সেবায় নিয়োগ করা যাবে। কিন্তু সন্তান প্রসবের পর দেখা গেল তিনি একজন মেয়ে সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। হতাশ হয়ে তিনি আল্লাহর কাছে অভিযোগ করলেন, কিভাবে তিনি এই কন্যাকে মসজিদের সেবায় নিয়োজীত করবেন। আল্লাহ বলেন, এই কন্যা তোমার কাংক্ষিত পুত্রের চেয়ে অনেক অনেক উত্তম। আল্লাহ এই কন্যার নাম রাখলেন মরিয়ম এবং তাকে ও তার বংশধরদের শয়তানের স্পর্শ থেকে হেফাজত করবেন। আমরা জানি মরিয়ম এবং তার পুত্রকে আল্লাহ শয়তানের স্পর্শ থেকে হেফাজত করেছেন। ইসা আঃ যখন জন্ম গ্রহন করেন, তখনও শয়তান তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু ইসা আঃ এর বংশধরদের কি হবে? আল্লাহ কি তাদেরও শয়তানের স্পর্শ থেকে রক্ষা করবেন? আল্লাহর এই ওয়াদা কি তাদের জন্যও প্রযোজ্য? ইসা আঃ এর সন্তানাদী নাই বলে আমরা এই প্রসংগ ভুলে বসে রয়েছি। কিন্তু ভবিষ্যতে ইসা আঃ বিয়ে করবেন ও তার সন্তানাদী হবে। তার বিয়ের কথা বাইবেলেও রয়েছে। Rev 19:8-9 The marriage of Lamb (Jesus) has come. His wife has made herself ready. She was given a bridal gown of bright & shining linen. The linen is the righteousness. The Angel said to me-"Write this, blessed are those invited to the Wedding Supper of the Lamb. অবশ্য এই প্রসংগ আমরা ভবিষ্যতের জন্যও রেখে দিতে পারি। ইসা আঃ নিজে তার সন্তানদের ব্যাপারে কি বলবেন, সেটাই হবে আসল সত্য ।

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

এমরানের স্ত্রী যখন বললো-হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত। অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি এক কন্যা প্রসব করেছি। বস্তুতঃ কি সে প্রসব করেছে আল্লাহ তা ভালই জানেন। সেই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি। অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে। (৩:৩৫-৩৬)

১২১
নীচের আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মরিয়ম আঃ কে প্রতিপালন করার সম্পূর্ণ দায়ীত্ব আল্লাহ নিজ হাতে তুলে নিয়েছিলেন। যদিও তার পার্থিব অভিভাবকত্ব ছিল যাকারিয়া আঃ এর উপর যিনি একজন নবী ও মরিয়মের খালু ছিলেন। কিন্তু তার দেখা শোনা করার জন্য সার্বক্ষনিকভাবে ফেরেশতাগন নিয়োজীত ছিলেন। এমনকি ফেরেশতাগন খাদ্য সামগ্রীও সরবরাহ করতেন রুটিন মাফিক। আসলে আল্লাহ মরিয়ম আঃ কে এমনভাবে গড়ে তোলেন যাতে তিনি ভবিষ্যতের এক মহা গুরুভার নিজের কাধে তুলে নিতে পারেন। প্রথম থেকেই তিনি ফেরেশতাদের সাথে পরিচিত হন। তার উপর আল্লাহর যে অপার করুনা সর্বদা বিরাজ করছে এটা তার হৃদয়ে বদ্ধমূল হতে থাকে। আল্লাহর প্রতি তার ইমান দিন দিন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। তার অবস্থা এমন দাড়ায় যে আল্লাহর কোন ইচ্ছাকে উপেক্ষা করার মত অবস্থা তার থাকে না। তাই যখন জিবরাইল আঃ এসে তাকে খবর দিলেন যে তাকে পিতা ছাড়াই এক সন্তানকে গর্ভে ধারন করতে হবে এবং সেটাই আল্লাহর ইচ্ছা, তখন মরিয়ম আঃ ভয়ে আতংকে হতবিহবল হয়ে গেলেও আল্লাহর এই ইচ্ছাকে না বলতে পারেন নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এটা নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন মাষ্টার প্লানের অংশ। তাই তিনি সমাজের ভয়কে পাত্তা দেননি, কলংকের ভয়কে উপেক্ষা করেছেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি যদি ফেরেশতা ও আল্লাহর সাথে এইভাবে পরিচিত হয়ে না উঠতেন, তাহলে এই গুরুভার বহন করা তার জন্য হয়তো অসম্ভব হয়ে উঠতো।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ

অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তম ভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে উত্তম ভাবে গড়ে তুললেন । আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পন করলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন "মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো?" তিনি বলতেন, "এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।" (৩:৩৭)

১২২
মরিয়ম আঃ যখন যাকারিয়া আঃ এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তখন যাকারিয়া আঃ এবং তার স্ত্রী উভয়ই অতি বৃদ্ধ ছিলেন। তাদের কোন সন্তান ছিল না এবং ভবিষ্যতেও সন্তান হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। মরিয়ম আঃ এর উপর আল্লাহর অশেষ রহমত দেখে যাকারিয়া আঃ নিজেও আশান্বিত হয়ে উঠলেন, হয়তো আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করতে পারেন। আল্লাহর কাছে তিনি এক সৎ বংশধরের জন্য প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেন এবং ফেরেশতা মারফত ইয়াহিয়া আঃ এর জন্মের সুখবর জানিয়ে দেন। নীচের আয়াতে ইয়াহিয়া আঃ এর কিছু বৈশিষ্টের উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি আল্লাহর এক "বানী"কে সমর্থন করবেন। এখানে আল্লাহর বানী বলতে ইসা আঃ কে বোঝানো হয়েছে। ইসা আঃ এর কোন পিতা ছিলেন না। তিনি আল্লাহর এক বানী (কালাম) দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিলেন। তাই তাকে কালিমাতুল্লাহ বলা হয়। ইয়াহিয়া আঃ বয়সে বড় ছিলেন। তিনিই ইসা আঃ কে জর্দান নদীর পানি দ্বারা Baptize (দীক্ষা) করেন এবং সব সময় ইসা আঃ কে সমর্থন করতেন। বাইবেলে ইয়াহিয়া আঃ কে John The Baptist বলে সম্বোধন করা হয়। ইয়াহিয়া আঃ এক অসাধারন সংযমের অধিকারী ছিলেন। জীবনে তিনি বিবাহ করেন নি, কোনদিন কোন মহিলাকে স্পর্শ

করেননি। উটের লোম দিয়ে তৈরী একটা চট ছিল তার পরিধেয় বস্ত্র, আর পঙ্গপাল ও বনের মধু ছিল তার প্রধান খাদ্য। ইহুদীরা ষড়যন্ত্র করে তাকেও রোমানদের হাতে তুলে দেয় মৃত্যুদন্ড দেওয়ার জন্য এবং পরিশেষে তাকে হত্যা করা হয়। ইহুদীরা এই ধরনের জঘন্যতম পাপ করতো। একের পর এক তারা নিরীহ নবীদের প্রত্যাক্ষান করেছে ও বিনা কারনে হত্যা করেছে। আল্লাহ বার বার কোরআনে তাদের এই পাপের কথা উল্লেখ করেছেন।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ
فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

সেখানেই যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে, আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পুত-পবিত্র সন্তান দান কর-নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। যখন তিনি মেহরাবে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়া সম্পর্কে, যিনি হবেন আল্লাহর এক বানীর (ইসার) সত্যায়নকারী, যিনি নেতা হবেন এবং সংযমী , তিনি অত্যন্ত সৎকর্মশীল নবী হবেন। (৩:৩৮-৩৯)

১২৩
আল্লাহ যাকারিয়া আঃ এর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং ইয়াহিয়া আঃ এর জন্মের সুখবর দিলেন। যাকারিয়া আঃ এর জন্য এটা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। আনন্দের আতিশয্যে তিনি আল্লাহর কাছে এক নিদর্শন চেয়ে বসলেন। মহান আল্লাহ বললেন, "তিন দিন তোমার জবান বন্দ থাকবে, ইংগিতে ছাড়া তুমি কারো সাথে কথা বলতে পারবে না। তবে এই তিন দিন তোমাকে আরও অধিক পরিমানে এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতে হবে।" যে দিন জাকারিয়া আঃ এর স্ত্রী গর্ভ ধারন করলেন, সেদিন থেকেই তার জবান বন্দ হলো, পরবর্ত্তী তিন দিনের জন্য। জাকারিয়া আঃ আল্লাহর মহিমা দেখলেন, তার সীমাহীন কুদরত ও ক্ষমতাকে উপলব্ধি করলেন, ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আরও অবনত হলেন মহান আল্লাহর সামনে।

قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ

তিনি বললেন, হে পালনকর্তা আমার জন্য কিছু নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, তোমার জন্য নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলতে পারবে না, ইশারা ইঙ্গিত ব্যতীত এবং তোমার পালনকর্তাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে আর সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করবে। (৩:৪১)

১২৪
পবিত্র কোরআনে আল্লাহ দুজন নেককার মহিলার কথা উল্লেখ করেছেন। তারা হলেন, ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইসা আঃ এর মাতা মরিয়ম আঃ। এর মধ্যে মরিয়াম আঃ কে আল্লাহ শিশুকাল থেকেই বিশেষভাবে বিশেষ যত্নে গড়ে তুলেছিলেন যাতে তিনি আল্লাহর এক বিশেষ নিদর্শনকে ধারন করতে পারেন। পিতা ছাড়াই তিনি এমন এক নবীকে গর্ভে ধারন করেছিলেন যিনি কেয়ামতের একটি নিদর্শন হিসাবে আবার পৃথিবীতে অবতরন করবেন। তাই মরিয়ম আঃ কে আল্লাহ সমস্ত বিশ্বের নারীদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন এবং বিশেষ কাজের জন্য তাকে মনোনিত

করেছেন। কোরআন-পরবর্ত্তী যুগের আরও তিন জন মহিলাকে হাদিস শরীফে পূর্ণতাপ্রাপ্ত মহিলা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হলেন খাদিজা (রাঃ), আয়েশা (রাঃ) এবং ফাতিমা (রাঃ)। এদের তিন জনের নাম বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে উল্লিখিত নারীগন এমন গরীয়সী নারী, যাদেরকে মহান আল্লাহ অন্যান্য সমস্ত নারীদের তুলনায় বিশেষ ফজীলত, মর্যাদা ও মাহাত্ম্য দান করেছিলেন। নিজ নিজ যুগে তারা ছিলেন বিশেষ ফজীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীনী। তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ

আর যখন ফেরেশতা বলল হে মারইয়াম!, আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আর তোমাকে বিশ্ব নারী সমাজের উর্ধ্বে মনোনীত করেছেন। (৩:৪২)

১২৫

ইসা আঃ কে কালিমাতুল্লাহ (আল্লাহর কালিমা) বলা হয়। কারন তিনি নিয়ম বহির্ভূতভাবে পিতা ছাড়াই আল্লাহর বিশেষ কুদরতে 'কুন' শব্দ দ্বারা সৃষ্টি হয়েছেন। খৃষ্টান পাদ্রীগন এই কালিমাতুল্লাহ শব্দটা দিয়েই প্রমান করার চেষ্টা করে যে ইসা আঃ নিজেই আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ)। বাইবেলে এই শব্দকে তারা কালাম, বানী, বা Word দিয়ে প্রকাশ করেছে। বাইবেল স্বীকার করে যে মহাবিশ্বের সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর বানী বা 'কালাম' দ্বারা। কিন্তু গসপেল যোহন এর প্রথমেই তারা এই 'বানীকে' এমনভাবে উপস্থাপন করেছে যাতে মনে হয় যে আল্লাহর 'বানী' এবং আল্লাহ একই। বাইবেলের নীচের বাক্যগুলি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। "John ১:১- প্রথমেই কালাম ছিলেন, কালাম আল্লাহর সাথে ছিলেন, কালাম নিজেই আল্লাহ ছিলেন। The word was first, The word was with God, The word was God." ইসলামিক দৃষ্টিকোন থেকে চিন্তা করলে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, " The word was God " এই অংশ টুকু বাইবেলে নতুন সংযোজন করা হয়েছে। এই অংশটুকু দিয়েই তারা word কেও আল্লাহ বানিয়ে ফেলেছে। যেহেতু ইসা আঃ আল্লাহর কালাম বা word , সেই হেতু তিনি নিজেই আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ)। যারা যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী, তারা নিশ্চয়ই খৃষ্টানদের এই Fallacy টা ধরতে পেরেছেন (Four Term Fallacy)। কোরআনের অনেক স্থানে যে বলা হয়েছে, ইসা আঃ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল, সেগুলি খৃষ্টানদের কাছে ধর্তব্য নহে। ইসা যে আল্লাহর কালাম, এটার অপব্যাখ্যা করতেই তারা উঠে পড়ে লেগেছে। অথচ বাইবেলেও রয়েছে, ইসা আঃ আল্লাহর দাস (Servant). "When God raised up his servant, Jesus,...." [Acts 3:26] . আল্লাহ আমাদের খৃষ্টানদের এই অপব্যাখ্যা থেকে হেফাজত করুন।

إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম আল্লাহ তোমাকে তাঁর এক বানীর (কালিমা) সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম, দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভূক্ত। (৩:৪৫)

১২৬
বাইবেলে আছে, ইসা আঃ দুই ফেরেশতার কাধে ভর দিয়ে আসমানে উঠে গেলেন। এখন খৃষ্ঠানগন তার ফিরে আসার প্রতিক্ষায় রয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাকে নিজের দিকে তুলে নিলেন। হাদিসের ভাষ্য অনুসারে তিনি আবার অবতরন করবেন কেয়ামতের এক নিদর্শন হিসাবে। সুতরাং তার আসমানে গমন ও ফিরে আসা সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রশ্ন হলো, তিনি ফিরে এসে কি কি দায়ীত্ব পালন করবেন। বাইবেল অনুসারে তিনি ফিরে এসে দাউদের সিংহাসনে বসবেন। দাউদের সিংহাসন বলতে আমরা জেরুজালেমকে বুঝি। অর্থাৎ তিনি প্রথমে ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট হবেন। পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে তিনি রাজাদের রাজা (king of the kings) হবেন এবং বিশ্বের সমস্ত রাজারা এসে তার পদচুম্বন করবেন (বাইবেল)। অর্থ্যাৎ বিশ্বের সমস্ত রাজ্য তার অনুগত থাকবে। এতে বোঝা যায় যে তিনি এক শক্তিশালী জাতি সংঘের মহাসচিব হবেন। হাদিসে আছে, তিনি অতিশয় ন্যায় পরায়ন বাদশাহ হবেন ও সমস্ত বিশ্বে ন্যায় ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করবেন। এখন প্রশ্ন হোল, এত বড় বিশাল দায়ীত্ব নিয়ে যিনি আসবেন তিনি ভবিষ্যত ঐ যুগের উপযোগী নেতৃত্ব দানে সক্ষম কিনা। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষায় যুগের উপযোগী হবেন কিনা। কারন তিনি যে যুগের মানুষ ছিলেন সেখান থেকে বিশ্ব আজ হাজার হাজার বছর এগিয়ে রয়েছে। প্রিয় পাঠকবৃন্দ, এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে নীচের আয়াতটি ভালোভাবে বুঝতে হবে। আল্লাহ ইসা আঃ কে কি কি শিক্ষা দিয়েছেন তার বর্ননা আছে এই আয়াতে। প্রথমেই আল্লাহ তাকে লেখা পড়া শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন। লেখা পড়ার সাথে সাথে তাকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও হিকমাত শিক্ষা দেওয়া হয়। এর পরেই আসে তৌরাত শিক্ষা। ৩০ বছর বয়স পর্য্যন্ত তিনি জেরুজালেম মসজিদে ইহুদী ইমামদের কাছে তৌরাত শিখেছেন যার বর্ননা বাইবেলে আছে। নবুওয়াত পাওয়ার পরের তিন বছর তিনি জিবরাইল আঃ এর কাছ থেকে ইনজিল শিখেছেন যা তিনি ইহুদীদের মাঝে প্রচার করতেন। এখন বাকী থাকে শুধু কোরআনের শিক্ষা। একজন খৃষ্ঠান যখন ইসলাম গ্রহন করেন, তখন কোরআন শিখে ইসলামের সব কিছু রপ্ত করতে তার কতদিন লাগে? আমার মনে হয় এক বছরের মধ্যেই সে এমন ভাবে ইসলামে পরিবর্ত্তিত হতে পারবে যে বোঝায় যাবে না সে কোনদিন খৃষ্ঠান ছিল। ইসা আঃ কে নিশ্চয়ই আসমানে কোরআন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তা না হলেও তার জন্য পৃথিবীতে এসে ইসলামকে রপ্ত করতে ছয় মাসের বেশী সময় লাগার কথা না। তৌরাত, ইনজিল, কোরআনে অভিজ্ঞ এক ব্যক্তি, যার উপর আল্লাহর সাহায্য রয়েছে সব সময়, তার জন্য এই বিশ্ব শাসন করা মোটেই কোন কঠিন কাজ হবে না। আল্লাহই সব কিছু জ্ঞাত আছেন।

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ

আর তাকে তিনি শিখিয়ে দেবেন লিখন, প্রজ্ঞা, তওরাত ও ইঞ্জিল। (৩:৪৮)

১২৭
নীচের আয়াতে ইসা আঃ এর বিভিন্ন মোজেজার বিস্তৃত বর্ননা দেওয়া হয়েছে। একই বর্ননা সুরাহ মায়েদার ১১০ নম্বর আয়াতেও আছে। আমি এখানে ইসা আঃ এর মোজেজা নিয়ে আলোচনা করবো না। আমার আলোচ্য বিষয় এই আয়াতের প্রথম অংশটুকু যেখানে আল্লাহ বলেছেন, "তিনি বনি ইসরাইলের জন্য তাকে রাসুল করবেন"।এতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ইসা আঃ একজন গোত্রীয় নবী ছিলেন। তাকে ইহুদী জাতীর জন্যই পাঠানো হয়েছিল। কোরআনে বহু স্থানে এর উল্লেখ আছে। বাইবেলেও ইসা আঃ নিজে বলেছেন যে তিনি শুধুমাত্র বনি ইসরাইলের হারানো মেষদের জন্য

এসেছেন। তিনি সাহাবীদেরও কড়া নির্দেশ দেন তারা যেন অ-ইহুদীদের কাছে না যায়, তারা যেন সামারীয়দের গ্রামে না যায়। বাইবেল--Mathew 15:24 Jesus said-"I am sent only to the lost sheep of Israel" Mathew 10:5-7 "Do not go to Non-Yahudi and the village of Shamaria. Only go to the lost sheep of Israel".--। কিন্তু আজ আমরা কি দেখছি ? খৃষ্টানদের বেশীরভাগ লোকই ইসরাইলী গোত্রের বাইরে থেকে এসেছে। ইউরোপের সমস্ত জনগনই অ-ইহুদী। এমন কি বর্ত্তমানেও খৃষ্টান ধর্মের প্রচার প্রসার বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের Tribal এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটা কি ইসা আঃ এর কড়া নির্দেশের পরিপন্থী নহে? নিশ্চয়ই তাই। আসলে বর্ত্তমান খৃষ্টান জগৎ ইসা আঃ কে অনুসরন করে না। তারা অনুসরন করে মহামান্য পোলকে যিনি কখনই ইসা আঃ এর সাহাবী ছিলেন না, যিনি ইসা আঃ এর একজন কট্টর শত্রু ছিলেন, যার সাথে ইসা আঃ এর কখনই সাক্ষাৎ ঘটে নি। এই জন্যই কোরআনে খৃস্টান জাতীকে বিভ্রান্ত জাতী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এখানে আর একটি প্রশ্ন এসে যায়। যখন ইসা আঃ আবার অবতরন করবেন, তখন তার মর্যাদা কি হবে? তখনও কি তিনি বনি ইসরাইলদের জন্য নবী থাকবেন? দজ্জালকে হত্যা করার পর ইসা আঃ এর প্রধান দায়ীত্ব হবে পৃথিবীর অবশিষ্ট ইহুদী ও খৃষ্টানদের ইসলামে বাইয়াত করা। সমস্ত ইহুদী ও খৃষ্টান ইসা আঃ কে অনুসরন করবে এবং তার হাতে বাইয়াত হয়ে মুসলমান হয়ে যাবে। সুরাহ নিসার ১৫৯ আয়াতে একই আভাষ দেওয়া হয়েছে, "আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর ইসার মৃত্যুর পূর্বে, আর কেয়ামতের দিন ইসা তাদের উপরে সাক্ষী হবেন" (সুরাহ নিসা আয়াত ১৫৯)। তাই যেদিন ইসা আঃ আবার দুনিয়াতে এসে আল্লাহর রাজত্ব কায়েমের পর মৃত্যুবরন করবেন, সেদিন দেখা যাবে যে দুনিয়াতে একজনও খৃষ্টান নেই, একজনও ইহুদী নেই। তারা সবাই মুসলমান হয়ে গেছে।

وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِىءُ الأَكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

আর বণী ইসরাঈলদের জন্যে রসূল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বললেন নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৩:৪৯)

১২৮

আল্লাহ বলেন, ইসা আঃ এসেছেন তৌরাতের সত্যায়নকারী রুপে। বাইবেলেও ইসা আঃ নিজেই বলেছেন, "আমি মুসার শরীয়তকে ধ্বংশ করতে আসিনি, বরং তাকে আরও শক্তিশালী করতে এসেছি।" বাইবেল-- Mathew 5:17-20 "Do not think that I come to destroy the Law and commandments of Moses, but to strengthen them."--। তাই মুসা আঃ এর শরীয়তে যে সব কর্ম ও খাদ্য হালাল, সেগুলি খৃষ্টানদের জন্যও সমভাবে হালাল। তবে নীচের আয়াতে ইসা আঃ বলেন, তিনি কিছু কিছু নিষিদ্ধকে বৈধ করবেন। কিন্তু কোন কোন খাদ্যকে তিনি বৈধ করেছেন, তা আমাদের জানা নেই। তবে মনে হয় চর্বি খাওয়া মুসার শরীয়তে হারাম ছিল, সেটাকে তিনি বৈধ করেছেন। বাইবেল-- Leviticus 7:22-23 The Lord said to Moses, "Say to the Israelites: 'Do not eat any of

the fat of cattle, sheep or goats.---। মদ খাওয়াও মুসার শরীয়তে নিষিদ্ধ ছিল। বাইবেল--. " whoredom, wine, and new wine, which take away the understanding." [Hosea 4:11] --। মদকেও ইসা আঃ হালাল করেছেন। কারন আমরা দেখেছি, ইসলামের প্রাথমিক যুগেও মদ হারাম ছিল না। শুকুরের মাংস মুসার শরীয়তে খুবই কড়াকড়ি ভাবে নিষিদ্ধ। এমন কি মৃত শুকরকেও স্পর্শ করা যাবে না। বাইবেল- . "And the pig, because it parts the hoof and is cloven-footed but does not chew the cud, is unclean to you. You shall not eat any of their flesh, and you shall not touch their carcasses; they are unclean to you." [Leviticus 11:7-8] --। ইসা আঃ শুকরকে হালাল করেছেন বলে কোথাও উল্লেখ নাই। এমন কি ইসা আঃ এর সাহাবীরা শুকর খেয়েছেন এমন কোন উদাহরনও কোথাও নাই। কিন্তু বর্ত্তমান খৃষ্টান জগৎ বলতে গেলে শুকরের মাংসের উপরেই বেচে রয়েছে। পারতপক্ষে খৃষ্টান গন মুসার শরীয়তের কোন খাদ্য বিধানই মানে না। এমন কিছু নাই যা তারা খাইনা। তাদের খাদ্যাভ্যাস অনেকটা চীনাদের মতই। যা পাও তাই খাও। এটা বিশ্ব স্বাস্থ্যের জন্য এক মহা হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে। ভাইরাসের উৎপত্তি হচ্ছে চীনদেশে, আর তা বিস্তারে সহায়তা করছে ইউরোপ ও আমেরিকা। সব কিছুই ভক্ষন করা যাবে, খৃষ্টানগন এই তত্ত্বের উদ্ভব করেছে ইসা আঃ এর এক বানীর অপব্যাখ্যা করে। জিহবাকে সংযত করতে হবে, কথা বলার সময় সতর্ক থাকতে হবে, এটা বোঝাতে যেয়েই ইসা আঃ বলেছেন যে মুখ দিয়ে যা প্রবেশ করে সেটা দেহকে অপবিত্র করেনা, কিন্তু মুখ দিয়ে যা বের হয় সেটাই দেহকে অপবিত্র করে। Mathew 15: 17-18 "Don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the body? But the things that come out of the mouth come from the heart, and these make a man `unclean.' এ রকম কথা হাদিসেও আছে, জিব্বা ও যৌনাঙ্গকে হেফাজত করতে বলা হয়েছে। কিন্তু খৃষ্টানরা ইসা আঃ এর এই কথাকে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বলে, মুখ দিয়ে যে কোন জিনিস প্রবেশ করানো যাবে অর্থ্যাৎ যা ইচ্ছে তাই খাওয়া যাবে, এতে দেহ অপবিত্র হবে না। অর্থ্যাৎ সব কিছু খাওয়া হালাল। ইসা আঃ এর বানীতে খারাপ বা কটু কথা না বলার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু খৃষ্টানরা এর অপব্যাখ্যা করে সব কিছু খাওয়াকে হালাল করে নিয়েছে, মুসার শরীয়তের খাদ্য বিধানকে তারা ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। এরকম ভুরিভুরি অপব্যাখ্যার ইতিহাস খৃষ্টান পাদ্রীদের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ আমাদের বোঝার তৌফিক দিন।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُواْ اللهَ وَأَطِيعُونِ

আর (আমি এসেছি) আমার পূর্ববর্তী কিতাব তৌরাতের সত্যায়নকারী রূপে, আর তা এজন্য যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেই কোন কোন বস্তু যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। কাজেই আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। (৩:৫০)

১২৯

ইসা আঃ এর বিরুদ্ধে যখন ইহুদীগন প্রবল বিরোধীতা ও ষড়যন্ত্র আরম্ভ করলো, তখন ইসা আঃ কিছু লোককে বিশেষ সাহায্যকারী হিসাবে নিয়োগ দেওয়ার চিন্তা করলেন। হাওয়ারীগন সামনে এগিয়ে আসলেন এবং ইসা আঃ ১২ জন সাহাবীকে তার সাহায্যকারী হিসাবে নিযুক্ত করলেন। বাইবেলে এই ১২ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাদেরকে অধিকার দেওয়া হলো যাতে তারা ইসা আঃ পক্ষে প্রচার কাজ চালাতে পারেন। এমনকি তাদেরকে কিছু কিছু মোজেজাও দেওয়া হলো, কেউ কেউ বলেন, হাওয়ারী শব্দের অর্থ ধোপা। কিন্তু এটা ঠিক নাও হতে পারে। কারন অধিকাংশ সাহাবীদের পেশা ছিল মাছ ধরা। তবে তাদের দায়ীত্ব ছিল মদীনার আনসারদের মত, যারা আমাদের রাসুলকে

সর্বোতভাবে সাহায্য করতেন। এই ১২ জন সাহাবীর একজন (এহুদা) টাকার লোভে রোমান সরকারের সাথে হাত মিলায় এবং ইসা আঃ কে তাদের হাতে ধরিয়ে দেয়। তবে সে পরে ক্ষোভে দুঃখে আত্মহত্যা করে। ইসা আঃ আসমানে উত্থিত হবার আগ মূহুর্তে আর এক সাহাবীকে হাওয়ারী পদে নিযুক্ত দিয়ে যান। ফলে ইসা আঃ দ্বারা নিযুক্ত হাওয়ারীর সংখ্যা ১২ জনই রয়ে যায়। সবচেয়ে মজার কথা হলো, বর্ত্তমান খৃষ্টান ধর্মের প্রবক্তা যে Mr. Paul, তার নাম কিন্তু এই ১২ জন হাওয়ারীর তালিকায় নেই। Mr. Paul ছিলেন Roman সরকারের এক Tax collector । জীবদ্দশায় তার সাথে ইসা আঃ এর কোন দিন দেখাও হয়নি। ইসা আঃ আসমানে উত্থিত হবার পর Mr. Paul দামেস্ক শহরে যেয়ে ইসা আঃ এর নামে অ-ইহুদীদের মাঝে এক নতুন বিধানের প্রচার শুরু করে, যার সাথে ইসা আঃ এর শিক্ষার কোন মিল ছিল না। ১৭ বছর পর পল জেরুজালেমে যান এবং হাওয়ারী সাহাবীদের কাছ থেকে তার নতুন বিধানের পক্ষে সত্যায়ন নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সাহাবীদের কেউই এই নতুন বিধান মেনে নেননি। তাই এটা খুবই স্পষ্ট যে বর্ত্তমানে খৃষ্টান জগত যে ধর্ম পালন করে সেটা Mr. Paul প্রবর্ত্তিত এক নতুন ধর্ম, ইসা আঃ এর বিধান নহে।

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

অতঃপর ঈসা (আঃ) যখন বণী ইসরায়ীলের কুফরী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেন, কারা আছে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? হাওয়ারীগন বললো, আমরা রয়েছি আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা হুকুম কবুল করে নিয়েছি। (৩:৫২)

১৩০

ইহুদীদের চক্রান্তে যখন ইসা আঃ চরমভাবে নাজেহাল হচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নীচের আয়াতটি নাজিল করেন। আল্লাহ বলেন, ইসার জীবনে নিশ্চয়ই নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি ঘটবে। তা হচ্ছে, (ক) পরিপূর্ণ জীবনে স্বাভাবিক মৃত্যু (ওফাত) (খ) আল্লাহর দিকে তুলে নেওয়া, (গ) কাফেরদের থেকে পবিত্রকরন, (ঘ) ইসাকে বিশ্বাসকারীগন কেয়ামত পর্য্যন্ত অবিশ্বাসকারীদের উপর বিজয়ী থাকবে এবং (ঙ) উপরের বিষয়ে যে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে, হাসরের সময় সেগুলির মিমাংশা করন। আমারা খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে উপরের বিষয়গুলি আলোচনা করবো। ইসা আঃ কে হত্যা করার জন্য ইহুদীগন উঠে পড়ে লাগে। যেহেতু তখন রোমান সরকার ক্ষমতায়, তাই তারা সর্বোতভাবে চেষ্টা করতে লাগলো সরকারকে বোঝাতে যে বিশৃংখলা বন্ধ করতে হলে ইসাকে মৃত্যু দন্ড দিতে হবে। যখন চরমভাবে জীবন সংশয় দেখা দিলো, তখন ইসা আঃ হাওয়ারীদের নিয়ে এক বাগানে আশ্রয় নিলেন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন এই অস্বাভাবিক ও অভিশপ্ত মৃত্যু থেকে উদ্ধার করার জন্য। আল্লাহ ইসাকে আশ্বাস দিলেন, তোমাকে কেউ হত্যা করতে পারবে না, তোমাকে কেউ শুলে মারতে পারবে না। বরং তোমার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে নিদিষ্ট সময়ে। এখন এই কাফেরদের থেকে পবিত্র করার জন্য তোমাকে আমার দিকে আসমানে তুলে নেব, যাতে তারা অভিশপ্ত শুলের মৃত্যু তোমার উপর কার্য্যকর করতে না পারে। উল্লেখ্য যে বাইবেলে শুলে দিয়ে মৃত্যুকে অভিশপ্ত মৃত্যু বলা হয়েছে। বর্ত্তমান যুগেও অনেকে বিতর্ক করে যে মৃত্যুর পরে সব আত্মাকেই তো আসমানের দিকে তুলে নেওয়া হয়। ইসাকে আসমানে তুলে নেওয়া হয়েছে মানে তার মৃত্যু হয়েছে। এটা ঠিক নহে। কারন এই একই আয়াতে " ওফাত" ও "আসমানে তুলে নেওয়া" এই দুইটি ঘটনা আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এই দুইটা আলাদা ঘটনা এবং আলাদা সময়ে ঘটবে। ইসা আঃ কে সশরীরেই আসমানে তুলে নেওয়া হয় এবং পৃথিবীতে ফিরে আসার পর

তার স্বাভাবিক মৃত্যু বা ওফাত হবে। এখন আসা যাক ইসাকে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের প্রশ্নে। ইসা আঃ কে নবী বা রাসুল বলে কারা কারা বিশ্বাস করে? বর্ত্তমানে পৃথিবীতে মাত্র দুইটি জাতী আছে যারা ইসা আঃ কে বিশ্বাস করেন। তারা হলেন খৃষ্টান ও মুসলিম জাতী। এমনকি ইহুদী জাতীরাও আজ পর্য্যন্ত ইসাকে নবী বলে মানে না। আল্লাহ বলেন, যারা ইসাকে বিশ্বাস করবে তাদেরকে তিনি কেয়ামত পর্য্যন্ত অন্যদের উপর বিজয়ী রাখবেন। বিশ্ব ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলেই আমরা এর সত্যতা বুঝতে পারবো। উপরে আমরা যা আলোচনা করলাম, এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতভেদ, বিভিন্ন মতবাদ, বিভিন্ন বিশ্বাস আছে ও থাকবে। এই মতভেদের কারনেই খৃষ্টানদের মধ্যে বহুদল উপদল গড়ে উঠেছে। মুসলমানদের মধ্যেও আছে বিভিন্ন দল। এমনকি কাদিয়ানীদের মত অনেক দল আছে যারা ইসা আঃ এর সশরীরে আসমানে গমন এবং অবতরনকে বিশ্বাস করে না। এটা আল্লাহ জানেন। তাই তিনি পরিশেষে বলেছেন যে তিনি সব মতভেদের অবসান ঘটাবেন হাসরের ময়দানে।

إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে ওফাত (স্বাভাবিক মৃত্যু) দেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নিবো-কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে রাখবো। বস্তুতঃ তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবো। (৩:৫৫)

১৩১

আল্লাহ বলেন, ইসার জন্ম আদমের জন্মের অনুরুপ। দুজনেরই কোন পিতা ছিলেন না। দুজনেরই জন্মের সূচনা হয় আল্লাহর এক আদেশ "কুন" শব্দ দ্বারা। পার্থক্য হলো, আদমের জন্ম মাটি থেকে আর ইসা আঃ এর জন্ম মরিয়মের পেট থেকে। আল্লাহর আদেশের সাথে সাথেই মরিয়মের পেটে গর্ভের সঞ্চার হয় এবং আস্তে আস্তে ভ্রূণ থেকে একটি পুর্নাঙ্গ মানুষ গড়ে উঠে। নির্দিষ্ট সময় পরে আল্লাহ তার মাঝে রূহ ফুকে দেন। তার অংগ প্রত্যঙ্গগুলি কাজ করতে শুরু করে এবং নয়-দশ মাস পরে ইসা আঃ মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে এই দুনিয়ায় পদার্পন করেন। একই ভাবে আদমকে সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু এখানে গর্ভাশয় মায়ের পেট নহে, বরং গর্ভাশয় ছিল মাটির অভ্যন্তর। বৃক্ষের বীজের মত আদমের ভ্রূণ মাটির নীচে বড় হতে থাকে। একটু সুঠাম হলে তাতে আল্লাহ রূহ ফুকে দেন। এর পর নির্দিষ্ট সময়ে একটি পুর্নাঙ্গ মানুষ রূপে আদম আঃ মাটি থেকে বেরিয়ে আসেন। ঠিক যেমন আমরা কেয়ামতের পর মাটি ফুড়ে বেরিয়ে এসে হাসরে জমায়েত হব। আসলে, আদমের জন্ম পদ্ধতি যদি আমরা বুঝতে পারি, তাহলে হাসরে পুনরুত্থানটি বুঝতে আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যায়। আল্লাহই সবকিছু ভাল জ্ঞাত আছেন।

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি থেকে তৈরী করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন। (৩:৫৯)

১৩২

ইসা আঃ কে নিয়ে খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সেই প্রথম থেকেই অনেক তর্ক বিতর্ক শুরু হয়। খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে, ইসা আঃ আল্লাহর সত্যিকারের পুত্র (Biological Son) । কেউ কেউ তাকে তিন খোদার এক খোদা বলে মনে করে। কেউ কেউ বলে, ইসা নিজেই খোদা। কোরআনে তাদের এই সব বিশ্বাসকে খন্ডন করা হয়েছে বিভিন্ন আয়াতে। এর পরেও ৯ম হিজরির দিকে নাজরান থেকে খৃষ্টানদের এক প্রতিনিধি দল মদিনায় আসে রাসুলের সাথে সরাসরি বাহাস করার জন্য। তর্কে বিতর্কে কোন সমাধান হয় না, তাই আল্লাহ মোবাহালার আয়াত নাজিল করেন। মোবাহালা হলো, দুই দল মিলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে যে যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর যেন আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়। এই আয়াত নাজিল হলে রাসুল সাঃ খৃষ্টানদের মুবাহালার জন্য আহবান জানান। খৃষ্টানগন ভীত হয়ে পড়ে এবং তারা মুবাহালা না করে রাসুলের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী হয়। যেহেতু তারা মুসলমান হতে রাজি ছিল না, তাই আল্লাহর রাসুল তাদের জন্য জিজিয়া কর নির্ধারিত করে দেন।

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

অতঃপর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এই কাহিনী সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ তর্ক করে, তাহলে বল- এসো, আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি যে তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত যারা মিথ্যাবাদী। (৩:৬১)

১৩৩ .
আমাদের উচিৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে একটি COMMON বিষয়ের দিকে আহবান করা যা আমাদের এই তিন জাতীর জন্যই প্রযোজ্য। তা হোল, আমরা আল্লাহ ছাড়া অবশ্যই আর কারো ইবাদত করবো না, আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করবো না এবং আল্লাহর দেওয়া বিধান (শরীয়ত) ছাড়া অন্য কারো বিধান মানবো না। বস্তুতঃ খ্রিস্টান জাতী এই তিনটি বিষয় থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। তারা ইসা আঃ কে আল্লাহর অংশ মনে করে এবং ইসার শরীয়তকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মিঃ পলের বিধানকে মেনে নিয়েছে। আমাদের প্রস্তাবনা যদি তারা না শোনে সে ক্ষেত্রে আমরা দৃঢ় ভাবে ঘোষনা করবো যে আমরা মুসলিম এবং আমরা আল্লাহ তা'লার নিকট সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পন করেছি।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَبَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

বলুনঃ 'হে আহলে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না।' তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, 'সাক্ষী থাক আমরা তো মুসলিম (অনুগত)।' (৩:৬৪)

১৩৪
কোরআন যখন ঘোষনা দিলো যে মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহিম আঃ, তখন ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে এক বিরাট হৈচৈ পড়ে গেল। তখন ইহুদীগন দাবী করে বসলো যে ইবরাহিম আঃ নিজেই ইহুদী

ছিলেন এবং তিনি তাওরাত অনুসরন করতেন। অন্য দিকে খৃষ্টানগন দাবী করলো যে ইবরাহিম আঃ ইনজিল অনুসরন করতেন। এই সব তর্ক-বিতর্কের উত্তরে আল্লাহ বলেন, ইবরাহিমের হাজার বছর পরে তাওরাত নাজিল হয়েছে এবং আরও হাজার বছর পরে ইনজিল এসেছে। এটা তাহলে কিভাবে সম্ভব যে ইবরাহিম আঃ তাওরাত ও ইনজিলকে অনুসরন করতেন। অথচ ইবরাহিম আঃ এক সহজ ও সরল পথ অনুসরন করেন এবং তিনি সামান্যতম শিরকের সাথেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। তাই ইহুদি ও খৃস্টানদের দাবী সম্পূর্ণ অমূলক। আল্লাহ ইবরাহিম আঃ কে নিজের বন্ধু হিসাবে গ্রহন করেছেন এবং তার উপাধী দিয়েছেন খলিলুল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকেও মিল্লাতে ইবরাহিম হতে বলেছেন (সুরাহ নাহল আয়াত ১২৩)। এবং নীচের আয়াতেও আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন যে আমরাই ইবরাহিম আঃ এর সব চেয়ে ঘনিষ্ঠতম।

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

ইব্রাহীম ইহুদী ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন 'হানীফ' অর্থাৎ, সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং আত্নসমর্পণকারী, এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না। মানুষদের মধ্যে যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল, তারা, আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম-আর আল্লাহ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু। (৩:৬৭-৬৮)

১৩৫
ইহুদীদের মধ্যে একটি ধারনা প্রবল ছিল যে অ-ইহুদীদের ধন সম্পদ যে কোন সময় আত্মসাত করা যাবে, তাদেরকে চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া যাবে। মধ্য যুগে সমস্ত ইউরোপে ইহুদী মহাজনদের অত্যাচারে সাধারন মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছিল। যারা Shakespeare এর The Merchant of Venice পড়েছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন, কিভাবে ইহুদী Money lender শাইলক মানুষকে টাকা ধার দিয়ে তা আদায়ের জন্য নির্যাতন করতো। ইহুদিদের নিয়ে এই ধরনের বহু নাটক নভেল এবং গল্প কাহিনী ইউরোপে প্রচলিত আছে। রাসুলের যুগেও তারা এই ধারনায়ই পোষন করতো এবং তা আজ পর্য্যন্ত বজায় আছে। তারা এই ধারনাকে আল্লাহর এক বিধান বলে চালিয়ে দিয়েছে। তারা মনে করতো, এতে কোন পাপ নেই। কিন্তু মহান আল্লাহ এই আয়াতে ঘোষনা দিচ্ছেন যে ইহুদীরা আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে চলেছে। এ ধরনের কোন বিধান আল্লাহ দিতেই পারেন না। বরং কোন অবস্থায় কোন ভাবেই অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা যাবে না, অন্যের কাছ থেকে সুদ গ্রহন করা যাবে না। সৎ-অসৎ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ইহুদী-খৃষ্টান, সংখ্যা গরিষ্ঠ- সংখ্যা লঘিষ্ট, হিন্দু-মুসলিম, দারুল হরব-দারুল ইসলাম, নির্বিশেষে সবার জন্যই আল্লাহর এই আইন সমভাবে প্রযোজ্য। এ সম্বদ্ধে হাদিসেও বিস্তৃতভাবে আছে।

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

কোন কোন আহলে কিতাব এমনও রয়েছে, তোমরা যদি তাদের কাছে বহু ধন-সম্পদ আমানত রাখ, তাহলেও তা তোমাদের যথারীতি পরিশোধ করবে। আর তাদের মধ্যে অনেক এমনও রয়েছে যারা একটি দীনার গচ্ছিত রাখলেও ফেরত দেবে না-যে পর্যন্ত না তুমি তার মাথার উপর দাঁড়াতে পারবে। এটা এজন্য যে, তারা বলে রেখেছে যে, উম্মীদের (অইহুদীদের) অধিকার বিনষ্ট করাতে আমাদের কোন পাপ নেই। আর তারা আল্লাহ সম্পর্কে জেনে শুনেই মিথ্যা বলে। (৩:৭৫)

১৩৬
নীচের আয়াতটি বেশী বড় নয়, হয়তো আমরা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতে পারি। কিন্তু এর গুরুত্ব বিশাল। একটু পর্য্যালোচনা করলেই আমরা দেখবো যে আমরা প্রায় সকলেই এই আয়াতে বর্ণিত ক্ষতি ও শাস্তির সন্মুখীন হতে পারি। আল্লাহ বলেন, যারা আল্লাহকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের শপথকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। এখানে দুই ধরনের শপথের কথা বলা হয়েছে। প্রথম অঙ্গীকার আল্লাহর সাথে। ইসলাম পূর্ববর্তী সকল জাতির জন্য এই অঙ্গীকার প্রযোজ্য। ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত জাতীই তাদের নবীর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছে যে তারা তাদের পরবর্ত্তী নবীকে মেনে চলবে। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন জাগতিক স্বার্থের জন্য তারা সেটা করেনি। ইহুদীরা অনেক নবীকে না মেনে হত্যা করেছে। তারা ইসা আঃ কে মানে নি, মুহাম্মদ সঃ কে মানে নি। খৃষ্টানরা আমাদের রাসুলকে মানে নি। এরা সকলেই আল্লাহকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে ভংগ করেছে। দ্বিতীয় ধরনের কসম বর্ত্তমান যুগেও আমাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য। আমরা অহরহ আমাদের কসমকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করছি। মিথ্যা কসম করে আমাদের খারাপ মালকে ক্রেতার হাতে গছিয়ে দিচ্ছি। ভালো মালের সাথে খারাপ মালের ভেজাল দিচ্ছি। পানিকে দুধ বলে চালিয়ে দিচ্ছি। মিথ্যা কভিড রিপোর্টকে আমরা সত্য বলে বিক্রয় করছি। এমনকি হাকিমের সামনে দাড়িয়েও আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করছি। এ রকম হাজার হাজার ঘটনা রয়েছে যেখানে আমরা আমাদের শপথকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করছি। আর এজন্য আল্লাহ আমাদের কি শাস্তি দিবেন? কেয়ামতে আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলবেন না, আমাদের দিকে ফিরেও চাইবেন না, আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। এমন হলে কি অবস্থা হবে বুঝতে পেরেছেন? সোজা জাহান্নাম। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং নিজেদের শপথ সামান্য মুল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কেন অংশ নেই। আর তাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না। তাদের প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও দেবেন না। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৩:৭৭)

১৩৭
ছোটকালে এমন একজনের কথা শুনেছিলাম যে বাংলা বাক্যকে এমন ভাবে পড়তো, মনে হতো যেন আরবী পড়ছে। এটা নতুন কিছু নয়। অতীতে ইহুদী জাতীর মধ্যে এই প্রবনতা খুব বেশী ছিল। তারা তাদের স্বার্থের জন্য অনেক নতুন নতুন বিষয় তাদের কেতাবে সংযোজন করেছে এবং তাদের বাক্য বিন্যাস ও উচ্চারন এমনভাবে করতো যেন তারা আল্লাহর কেতাব পড়ছে। এভাবে তারা সাধারন মানুষকে বিভ্রান্ত করতো। খৃষ্টানদের মধ্যেও এই প্রবনতা আছে। প্রথম যখন ল্যাটিন ভাষা থেকে বাইবেল ইংলিশে অনুবাদ করা হয় তখনও শব্দ চয়ন ও বাক্য বিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে যাতে সাধারন ভাবে ব্যবহৃত ভাষা থেকে এটা আলাদা হয়ে যায়। বাইবেলের নীচের বাক্যটি পড়ুন, দেখুন সাধারন ইংলিশ থেকে এটা কত আলাদা। বাইবেল--Mathew 19:21 KJV - Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go [and] sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. । বাইবেলের ভাষাকে এরকম একটা আলাদা বৈশিষ্ঠ্য দেওয়া হয়েছে যাতে

পাদ্রীগন সাধারন মানুষের উপর তাদের পান্ডিত্য জাহির করতে পারে। ইসলামের আবির্ভাবের পরে ইহুদী ও খৃষ্টানদের একমাত্র প্রচেষ্টা ছিল যাতে তাদের কেতাব থেকে ইসলামের সমস্ত ভবিষ্যৎবানী নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। রাসুলের যুগে তৌরাত ইনজিলে নতুন নবী আগমনের যে সব ইংগিত বা নিদর্শনের উল্লেখ ছিল, বর্ত্তমানে সেগুলিকে হয় বিয়োজন করা হয়েছে অথবা নতুন শব্দ চয়নে সেগুলির অর্থ পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। তাই মদীনার ইহুদী-খৃষ্টানরা রাসুলকে যেভাবে চিনতো, বর্ত্তমানের প্রজন্ম New version বাইবেল পড়ে সেগুলি বুঝতে পারে না। বর্ত্তমান বাইবেলে যার আসার কথা বলা হয়েছে, তাকে Comforter , Helper, Advocate প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এটা আসলে Muhammad বা আহমেদ শব্দের আভিধানিক অর্থ যেটা তারা ল্যাটিন বাইবেল থেকে নিয়েছে। অর্থাৎ অরিজিনাল আরামাইক ভাষার বাইবেলে 'আহমেদ' শব্দটিই ছিল, কিন্তু বর্তমান বাইবেলে শব্দটি বাদ দিয়ে তার অর্থকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর এভাবেই নতুন বাইবেলকে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে নতুন প্রজন্মের ইহুদী-খৃষ্টানরা ইসলামের নবীকে চিনতে না পারে।

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে জিহ্বা বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তার কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটি আল্লাহর কথা অথচ এসব আল্লাহর কথা নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে। (৩:৭৮)

১৩৮ .
অনেক খৃষ্টান যীশুকে তাদের প্রভু হিসাবে গ্রহন করেছে এবং তারা তার এবাদত করে। তাদের কেউ কেউ বলেন, যীশু দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে আগমনের পর তার এবাদত করতে হবে। এমন কিছু খৃস্টান আছে যারা বলেন, যীশু প্রধান ঈশ্বরের একটা অংশ, অর্থাৎ তিন জনের একজন। মহান আল্লাহ তা'লা বলেন, কেতাব ও হিকমত লাভের পর কোন নবীর পক্ষে এধরনের কথা বলা অসম্ভব। বরং যীশু (হযরত ইসা আ:) সর্বদাই নিজেকে প্রভুর একজন বিশ্বস্ত দাস হিসাবে দাবী করেছেন। বাইবেলেও ইসা আঃ কে Servant of God বলা হয়েছে। "The God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus." [Acts 3:13] । এ প্রসঙ্গে কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন ঃ-

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللّهِوَلَـكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ

কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও নবুওয়ত দান করার পর সে বলবে যে, 'তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও' - এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাও, যেমন, তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে।' (৩:৭৯)

১৩৯ .
আজকাল একদল লোকের আবির্ভাব হয়েছে যারা প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে- "নবীদের মর্যাদা রাসুলের উপরে। মুহাম্মাদ সঃ এর পরে পৃথিবীতে আর কোন নবী আসবেন না, এটা কোরআনে আছে। কিন্তু

রাসুল আসা বন্ধ করা হয় নি। কেয়ামত পর্যন্ত রাসুল আসতে থাকবে।" তাদের এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণ ভুল ও মিথ্যা। নীচের আয়াতটি ভালভাবে লক্ষ্য করুন। আল্লাহ সমস্ত নবীদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তারা যেন তাদের কাছে আগত রাসুলদের উপর ঈমান আনেন এবং তাদের সাহায্য করেন। অর্থাৎ নবীগন রাসুলের আনুগত্য করবে। এতেই প্রমান হয় যে রাসুলের মর্যাদা নবীদের উপরে। কোরআনে ৫ জন রাসুলের উল্লেখ পাওয়া যায় যাদের নাম সব সময় অন্য নবীদের থেকে আলাদাভাবে আলাদা ব্রাকেটে উচ্চারণ করা হয়েছে। তারা হচ্ছেন – নুহ আঃ, ইবরাহিম আঃ, মুসা আঃ, ইসা আঃ ও মুহাম্মদ সাঃ। রাসুলগন শরিয়তের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ পৃথিবীতে নবীদের আগমন বন্ধ করে দিয়েছেন। নবীই যদি না আসেন, তবে রাসুল আগমনের প্রশ্নই আসে না। কারন রাসুলের মর্যাদা নবীদের চেয়ে বেশী। সুতরাং এখন থেকে পৃথিবীতে না কোন নবী আসবেন, না কোন রাসুল। কেউ যদি নিজেকে নবী বা রাসুল বলে দাবী করে, তবে সে ভন্ড ও মিথ্যাবাদী। নায়েবে রাসুল হিসাবে এখন আলেম উলেমাগন ইসলামের প্রচার কাজ চালিয়ে যাবেন। আর পৃথিবীর সমস্ত জাতীর উপর এটা ওয়াজিব হয়ে গেছে যে তারা যেন সর্ব শেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মাদ সঃ এর উপর ইমান এনে ইসলামে প্রবেশ করে।

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّبِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَالشَّاهِدِينَ

আর স্মরণ করো! আল্লাহ্ নবীদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন -- ''নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের কিতাব ও জ্ঞান ভান্ডার থেকে প্রদান করেছি, তারপর তোমাদের কাছে যখন কোন রসূল আসবেন যিনি তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী হবেন, তোমরা নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে আর নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে।'' তিনি বলেছিলেন -- ''তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এই ব্যাপারে আমার শর্ত গ্রহণ করলে?'' তারা বলেছিল -- ''আমরা স্বীকার করলাম।'' তিনি বললেন -- ''তবে তোমরা সাক্ষী থেকো, আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষ্যদাতাদের অন্যতম। (৩:৮১)

১৪০ .
ইসলাম আল্লাহর দেওয়া একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। তাহলে আমরা কেন অন্য কোন জীবন বিধানের সন্ধান করে চলেছি? আমরা কেন সমাজতন্ত্র অথবা অন্য কোন তন্ত্রের পিছনে দৌড়াচ্ছি? মহান আল্লাহ বলেছেন যে, যখন বিশ্ব জগতের সব কিছুই তার নিকট আত্মসমর্পন করে তারই বিধান মেনে চলেছে, তখন তোমরা মানব জাতি কেন নানাবিধ তন্ত্রের (ইজম) অনুসন্ধানে লিপ্ত রয়েছ? আমরা যত শীঘ্র আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করে তার বিধান মেনে নেব, ততই আমাদের মঙ্গল। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন বিধানই আল্লাহর নিকট গ্রহন যোগ্য নয়।

َفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? কিন্তু আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হয়ে রয়েছে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে। (৩.৮৩)

১৪১ .

এমন অনেকেই রয়েছে যারা মানবতার ধর্মে বিশ্বাসী। তাদের ধারনা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটা সত্য যে, সকল ধর্মের উৎপত্তিস্থল একটিই। কিন্তু সেই মুল ধর্ম এখন কোথায়? সময়ের আবর্তনে প্রতিটি ধর্ম নানা বিষয়ের সংমিশ্রনে এতটাই ত্রুটিপূর্ন হয়ে গেছে যে, আল্লাহর কাছে তার কোন গ্রহন যোগ্যতা নেই। তাছাড়া প্রতিটি ধর্মের শরীয়ত ছিল আলাদা আলাদা। কারন বিভিন্ন জাতীর থাকার পরিবেশ, আবহাওয়া, খাদ্যাভ্যাস, জীবনোপকরন , ইত্যাদী সব কিছুই ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তাই আলাদা শরীয়তের দরকার ছিল। কিন্তু এখন আর সেই অবস্থা নাই। এখন বিশ্ব একটি ছোট্ট গ্রামে পরিণত হয়েছে। লন্ডনে বাস করলে জীবন ধারণের জন্য আপনি যে সব Facilities পাবেন, সুদুর সাইবেরিয়ার এক ইগলুতেও একই সুবিধা পাবেন আপনি। গরম পানি দিয়ে অজু গোসল করতে পারবেন সেখানে। তাছাড়া মানুষের গতিও বেড়ে গেছে অকল্পনীয় ভাবে। সকালে পৃথিবীর এই প্রান্তে তো বিকেলে ঐ প্রান্তে। সেই সাথে রোগ ব্যাধির গতিও। করোনার জন্ম চীনে, কিন্তু ২ লাখের বেশি লোক মারা গেল আমেরিকায়। বাদুর ইদুর খেল চীনারা, আর এদিকে আমরা মুসলিম হয়েও করোনা আতংকে হাল-বেহাল। তাই সারা বিশ্বে এখন একই বিধান দরকার। একই স্বাস্থ্য বিধান, একই খাদ্য বিধান, একই জীবন বিধান, একই শরীয়ত। আর আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহনযোগ্য জীবন বিধান কেবল ইসলাম। ইসলামেই আমাদের মঙ্গল , সমস্ত বিশ্বের মঙ্গল।

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন (জীবন বিধান) কে তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত।।(৩:৮৫)

১৪২ .
আমরা জানি যে, বিলগেটস এবং এমন আরো অনেক ধনী আছেন যারা বছরে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিভিন্ন জনহিতকর কাজে দান করে থাকেন। তারা কি আখিরাতে এর প্রতিদান পাবেন?এটা নির্ভর করবে তারা এক আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে কি না। এটা সত্য যে, কোন অবিশ্বাসী হাজার কোটি ডলার দান করলেও তার অবিশ্বাসী হবার শাস্তি আখিরাতে অনিবার্য । যদি অবিশ্বাসী অবস্থায় তিনি মৃত্যু বরণ করেন তবে তার এ অবিশ্বাসের কাফফারা হিসাবে কোটি বিলিয়ন কেন, পৃথিবীর সমান স্বর্ণ প্রদান করলেও তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। এ ব্যাপারে হাদিসে আরো বিস্তৃত এসেছে। এমনকি অতিথিপরায়ণ, দানশীল, পরোপকারী এবং খুবই ভাল একজন লোক আবদুল্লাহ ইবনে জাদআন সম্বন্ধে রাসুলকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এসব ভাল কাজ তার কোন উপকারে আসবে না, কারন সে তওবা করে নি। মহান আল্লাহ বলেনঃ

ِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ

যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তার পরিবর্তে দেয়া হয়, তবুও যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তওবা কবুল করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। পক্ষান্তরে তাদের কোনই সাহায্যকারী নেই। (৩:৯১)

১৪৩

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তার প্রথম সন্তানকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন কারন এ সন্তানই ছিল তার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। আমরা আমাদের সন্তানকে উৎসর্গ করতে পারবো না, সেটা করাও এখন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। । কিন্তু যে সম্পদ আমরা ভালবাসি, সেখান থেকে তো আমরা আল্লাহকে খুশি করার জন্য ব্যয় করতে পারি। নীচের আয়াতটি নাজিল হওয়ার সাথে সাথেই সাহাবীগন নিজেদের প্রিয় বস্ত দান করার প্রতিযোগীতায় লেগে যান। কেউ তার প্রিয় খেজুর বাগানটি সাদকাহ করে দেন, কেউ তার প্রিয় উটটি দান করে দেন, কেউবা তার সবচেয়ে প্রিয় দাসকে স্বাধীন করে দেন। তবে এর অর্থ এই নহে যে অন্যান্য ব্যবহৃত, অপ্রয়োজনীয় বা উদ্‌বৃত্ত বস্ত দান করা যাবে না। ভাল বা মন্দ, প্রিয় বা অপ্রিয়, সব ধরনের জিনিসই দান করা যাবে এবং আল্লাহ সেই অনুযায়ী প্রতিদান দিবেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ

তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর তোমরা যদি কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ তা জানেন।।(৩:৯২)

১৪৪
আল্লাহ বলেন, ইবরাহিম ধর্মে একনিষ্ট ছিলেন, তোমরা ইবরাহিমের ধর্মকে অনুসরন কর। তাই আল্লাহর রাসুল এবং মুসলিমগন ঘোষনা দিলেন যে তারা ইবরাহিম আঃ এর ধর্মকে অনুসরন করেন। সংগে সংগে মদীনার ইহুদীগন হৈচৈ করে উঠলো। তারা প্রশ্ন তুললো, মুসলমানরা কেন উটের গোশত ও দুধ খায়। এগুলিতো ইবরাহিমের ধর্মে নিষেধ ছিল। আল্লাহ বলেন, ইহুদীদের এই অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ইবরাহিমের দ্বীনে উট ও উটের দুধ কখনই হারাম ছিল না। এটা নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন ইয়াকুব আঃ যার অপর নাম ছিল ইসরাইল। পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে ইসরাইলীদের জন্য আরো কিছু হালাল খাদ্য হারাম করে দিয়েছিলেন মহান আল্লাহ তালা, তাদের অবাধ্যতা, জুলুম ও সীমালংঘনের কারনে। আর এসব ঘটনার অনেক বছর পর তাওরাত কিতাব নাজিল হয় এবং তাওরাতে এই সব নিষেধগুলি বহাল থাকে। তাওরাতে এ সমস্ত ঘটনা বিস্তৃত ভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং ইহুদীগন যা দাবী করছে তা পুরোপুরি মিথ্যা এবং পারতপক্ষে তারা আল্লাহর প্রতিই মিথ্যা আরোপ করছে।

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

তওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইয়াকুব (ইসরাইল) যেগুলো নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন, সেগুলো ব্যতীত সমস্ত আহার্য বস্তুই বনী-ইসরায়ীলদের জন্য হালাল ছিল। তুমি বলে দাও, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক। তাহলে তওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ কর। (৩:৯৩)

১৪৫
মহান আল্লাহ তা'লা এই ঘোষনা দেওয়ার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি সদা সত্য বলেন (সাদাকাল্লাহ)। কোরআনে বর্ণিত এই আয়াতটির উপর ভিত্তি করে ইসলামের বিজ্ঞ পন্ডিতগণ কোরআন তেলাওয়াতের পর "সাদাকাল্লাহুল আজীম" বলে তেলাওয়াতের সমাপ্তি টানেন। এটা দীর্ঘ দিনের প্রচলন বলে আমরা জানি। কিন্তু ইদানিং কিছু কিছু মানুষ এ আয়াতটির ব্যবহার সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষন করেছেন। তারা এটাকে বিদআত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাদের এই ফতোয়া কখনই সত্য হতে পারে না। উপযুক্ত স্থানে কোরআনের আয়াত সমুহ ব্যবহারে কোন ক্ষতি নেই। বরং সেটা

করাই উত্তম। কাউকে দাফন করার সময় আমরা যে তিনটি দোয়া উচ্চারন করি (মিনহা খালাকনাকুম.....), সেগুলোও কোরআনের আয়াত। আল্লাহর রাসুল ও সাহাবীগন এভাবেই বিভিন্ন অবস্থায় Related আয়াত সমূহ ব্যবহার করতেন এবং এটাই সঠিক। নীচের আয়াতে আরো একটি নির্দেশ রয়েছে আমাদের জন্য। মহান আল্লাহ সুবহানু তা'লা আমাদের আবার তাগিদ দিচ্ছেন, আমরা যেন ইবরাহিম আঃ এর ধর্মের অনুগত হয়ে যাই, কারন তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সত্য ধর্মের অনুসারী।

قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

বল, আল্লাহ সত্য বলেছেন। এখন সবাই ইব্রাহীমের ধর্মের অনুগত হয়ে যাও, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ভাবে সত্যধর্মের অনুসারী। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।।(৩:৯৫)

১৪৬

মদীনার ইহুদীদের দাবী ছিল, জেরুজালেমের বাইতুল মোকাদ্দিসই হলো আল্লাহর দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর প্রথম এবাদতখানা। তাহলে কেন মুসলমানেরা তাদের কেবলা পরিবর্ত্তন করে মক্কার দিকে মুখ ফেরালো? নীচের আয়াতে আল্লাহ ইহুদীদের এই দাবী খন্ডন করে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানুতালা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষনা করছেন যে মানব জাতীর জন্য প্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা মক্কায় অবস্থিত। প্রথম কখন এই গৃহ নির্মান হয়েছে, সে ব্যাপারে অনেক মতবাদ আছে। আমরা সেই বিতর্কে যাবো না। তবে কোরআনের অন্য আয়াতে বিস্তৃত ভাবে বর্ননা করা হয়েছে, কিভাবে ইবরাহিম আঃ পুত্র ইসমাইলকে সাথে নিয়ে এই গৃহ পুনঃনির্মান করেন। আমরা কাবা গৃহ নির্মানের বর্ননা বর্ত্তমান তৌরাতে পাই নাই। কিন্তু হাজেরা ও ইসমাইল আঃ কে বাক্কাহ প্রান্তরে নির্বাসন দেওয়া এবং ইসমাইল আঃ এর পায়ের গোড়ালীর নীচ থেকে জমজমের পানি উৎসরিত হওয়া, এসব ঘটনা বর্ত্তমান তৌরাত ও ইঞ্জিলে বর্নিত আছে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে ইসমাইল আঃ এর সময়েই কাবা ঘর প্রথম নির্মান করা হয়, তবে সেটাও বাইতুল মোকাদ্দেস নির্মানের ১৫০০ বছর আগের ঘটনা। কাবা ঘর যখনই নির্মান করা হোক না কেন, মহান আল্লাহ ঘোষনা দিয়েছেন যে কাবা ঘরই বিশ্বের প্রথম এবাদতখানা। সুতরাং বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত এবাদতখানা কাবা ঘরের পরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটা বাইতুল মোকাদ্দেস হোক বা ইন্দোনেশীয়ার বড়বুদুর হোক বা ভারতের কাশী-বারানসী হোক বা মায়ানমারের গোল্ডেন প্যাগোডা হোক। এতে কোন সন্দেহ নেই।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। (৩:৯৬)

১৪৭

পবিত্র কাবা ঘরের একটি নিদর্শনের কথা নীচের আয়াতে বর্ননা করা হয়েছে। মাকামে ইবরাহিম। এটা একটা পাথর যার উপর দাড়িয়ে ইবরাহিম আঃ কাবা ঘর নির্মান করেছিলেন। এই পাথরের একটা বৈশিষ্ট ছিল যে এটা লিফটের মত উপরে নীচে উঠানামা করতো। এটার সাহায্যে ইবরাহিম আঃ যে কোন উচ্চতায় দাড়িয়ে কাজ করতে পারতেন। কাবা ঘরের ঠিক পূর্ব দিকে এক সুদৃশ্য জাফরির মধ্যে হাজীদের দেখার জন্য এই পাথরটি সংরক্ষিত আছে। কাবা ঘরের আর একটি নিদর্শন হচ্ছে হাজরে

আসওয়াদ। এটাও একটা পাথর যা বেহেশত থেকে পাঠানো হয়েছিল। কাবা ঘরের দক্ষিন-পূর্ব কোনার সাথে এটা সংযুক্ত। হাজীগন এই পাথর বরাবর থেকে প্রতিটি তাওয়াফ শুরু করেন এবং এখানেই তাওয়াফ শেষ করেন। জম জম কুপ কাবা ঘরের আর একটি নিদর্শন যা ইসমাইল আঃ এর পায়ের আঘাতে সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুত এই কুপকে ঘিরেই মক্কা নগর গড়ে উঠেছে সেই প্রাচীন কাল থেকে। অবিরত ধারায় পানি প্রবাহিত হয় এই কুপে যা মক্কা-মদীনার লক্ষ লক্ষ হাজীদের প্রয়োজন মিটিয়েও উদ্‌বৃত্ত থাকে। Chemical Analysis করে দেখা গিয়েছে, এই পানি সাধারন পানির মত নহে। এতে অনেক উপাদান রয়েছে যা সাধারন পানিতে নাই। একজন মানুষ শুধু মাত্র কিছু খেজুর ও যমযমের পানি খেয়েই সারা জীবন টিকে থাকতে পারে। এর পরেই আছে সাফা-মারওয়া পাহাড়, যেখানে বিবি হাজেরা পানির খোজে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। হজ ও ওমরাহ করার জন্য আজও হাজীগন এই দুই পাহাড়ের মাঝে সাত বার সায়ই করেন যা করা বাধ্যতামুলক। কাবা ঘরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট হলো এই ঘর ও এর আশে পাশের এলাকাকে আল্লাহ সবার জন্য নিরাপদ ঘোষনা করেছেন। এখানে যুদ্ধ করা নিষেধ, শিকার করা নিষেধ, ঝগড়া-ফাসাদ করা নিষেধ, মশা-মাছি পোকা-মাকড় মারা নিষেধ, এমনকি গাছ কাটা বা গাছের পাতা ছেড়াও নিষেধ। তাই এটাকে হারাম এলাকা বলা হয়। আর আল্লাহর নির্দেশ, যাদের মক্কায় পৌছার সামর্থ আছে তারা যেন আল্লাহর এই ঘরের হজ্জ করে, জীবনে অন্ততঃ একবার।

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

এতে রয়েছে মকামে ইব্রাহীমের মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে, লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর এ ঘরের হজ্ব করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের সামর্থ রয়েছে এ পর্যন্ত পৌছার। আর যে লোক তা মানে না। আল্লাহ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরোয়া করেন না। (৩ঃ৯৭)

১৪৮

আল্লাহ তা'লা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না। প্রথমে মুসলিম হও, এরপর মৃত্যু বরণ করো। কিন্তু মৃত্যুর দিনক্ষন কি আমাদের জানা আছে? আপনি কি জানেন যে, শুক্রবারে আপনার মৃত্যু হবে-যাতে আপনি বৃহস্পতিবার মুসলিম হয়ে যেতে পারেন? না ভাই, মৃত্যুর দিনক্ষন আমাদের জানা নেই। তাই এক্ষুনি আমাদেরকে মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্ম সমর্পণ) হতে হবে। এক্ষেত্রে বিলম্বের কোন অবকাশ নেই। কারন পর মুহুর্তটিতেই আমাদের মৃত্যু হতে পারে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (৩:১০২)

১৪৯

আল্লাহ আমাদের অন্তরকে পরস্পর সংযুক্ত করে দিয়েছেন- সে জন্য আমরা ইসলামে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছি। তাই আমরা একে অপরের সুখে আনন্দিত হই, দুঃখে কাতর হই। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন মুসলমান যখন বিপদে পড়ে, তাকে সাহায্য করার জন্য তখন আমাদের হৃদয় আকুল হয়ে উঠে। আমাদের এই আবেগ, এই সহমর্মিতা ধরে রাখতে হবে। আমাদের একত্রিত থাকতে হবে। সকল মুসলিম মিলে চিরকালের জন্য আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারন করে রাখতে হবে। যতক্ষন পর্যন্ত আমরা একতাবদ্ধ থাকতে পারবো- ততক্ষন পর্যন্ত বিশ্বের কোন শক্তিই আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য আসতে থাকবে অবারিত ধারায়।

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْفَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমুহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার। (৩:১০৩)

১৫০ .
কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে ইসলাম অনুমোদন দিয়েছে। ইসলামে একটি দল থাকবে যারা ইসলামী জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ হবে, তারা চারি দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাবেন। ইসলামি বিচার কাজেও তারা তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে সাহায্য করবে। ইসলাম বিষয়ে বিভিন্ন রিসার্চ কাজ তারা করবে। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েম হবার আগ পর্যন্ত এই সব বিশেষজ্ঞদের বিশেষ মর্যাদা ও মূল্যায়ন ছিল। বিভিন্ন সরকারী পদে তাদের নিয়োগ দেওয়া হতো। কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্বে তাদেরকে পদচ্যুত করে ইংরেজী জানা এবং ইংরেজ ঘেষা লোকদের চাকুরী দেওয়া হয়। এতে হাজার হাজার ইসলামী বিশেষজ্ঞ বেকার হয়ে পড়ে। আজও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। মাদ্রাসায় পড়া মানেই নিজের জীবনকে নষ্ট করা বলে আমরা মনে করি। কিন্তু মহান আল্লাহ বলেন, আমাদের এক দলকে ইসলামে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। সামনের দিকে আমরা আরো এরকম আয়াত পাবো যেখানে আল্লাহ তা'লা ইসলামের একটি বিশেষ দলকে শুধুমাত্র যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হতে বলেছেন, যারা যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত থাকবেন। সুরাহ তাওবার ১২২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন- "আর মু'মিনদের এটাও সমীচীন নয় যে, (জিহাদের জন্য) সবাই একত্রে বের হয়ে পড়ে; সুতরাং এমন কেন করা হয়না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল (জিহাদে) বহির্গত হয়, যাতে অবশিষ্ট লোক ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে,-----"। সুতরাং, আজকের এই আধুনিক প্রযুক্তির যুগে Specialization বা 'বিশেষ দক্ষতা' অর্জনের গুরুত্ব অসীম যা ১৫০০ বছর আগেই ইসলাম অনুধাবন করেছে। তাই আমাদের সব ধরনের বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়ন করতে হবে, সেটা যুদ্ধ-বিদ্যাই হোক বা ধর্ম-বিদ্যা।

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُالْمُفْلِحُونَ

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম। (৩:১০৪)

১৫১
আফ্রিকার গভীরতম জঙ্গল থেকে উঠে আসা এক কৃষ্ণ মানুষকে দেখাবে উজ্জ্বল, তার মুখমন্ডল হবে শুভ্র ও দ্যুতিময়। পক্ষান্তরে অন্ধকারাচ্ছন্ন মলিন মুখের অনেককে দেখা যাবে, যে হয়তো একজন লাল ফর্সা সুন্দর মুখের মানুষ ছিল এই পৃথিবীতে, জার্মান বা ইংল্যান্ডের, তার শরীরে প্রবাহিত হতো সম্ভ্রান্ত নীল রক্ত। হ্যাঁ, প্রিয় ভাই ও বোনেরা, হাশরের ঐ কঠিন দিনে দু ধরনের মুখই দেখা যাবে। কালো-মলিন অথবা শুভ্র- সাদা। তবে তা কোন অঞ্চল বা বর্ণের উপর নির্ভর করবে না, বরং সেটি হবে কে বিশ্বাসী (ঈমানদার) আর কে অবিশ্বাসী তার উপর ভিত্তি করে। তাই আসুন, আমরা চেষ্টা করি, হাশরের মাঠে আমাদের যেন লাঞ্ছিত না হতে হয়,আমাদের সুন্দর মুখমণ্ডলগুলি যেন আরো সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে।

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَبِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

সেদিন কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো। বস্তুতঃ যাদের মুখ কালো হবে, তাদের বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গিয়েছিলে? এবার সে কুফরীর বিনিময়ে আযাবের আস্বাদ গ্রহণ কর। আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে রহমতের মাঝে। তাতে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (৩:১০৬-১০৭)

১৫২
মহান আল্লাহর ঘোষনা, আমরা বিশ্বের উত্তম জাতী এবং মানবতার কল্যাণের জন্যই আমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। কিন্তু এটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য আল্লাহ আমাদের দুটি দায়িত্ব দিয়েছেন। এই দায়িত্ব রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তি, সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। দায়িত্ব বা করনীয় দুটি হোল, ভালো কাজের জন্য মানুষকে আদেশ দেওয়া ও মন্দ কাজ থেকে তাদের বিরত রাখা। যতক্ষন পর্যন্ত আমরা এদুটি কর্তব্য পালন করে যাবো ততক্ষন পর্যন্তই আমরা উত্তম, অন্যথায় নয়। হাদিসে এসেছে, কেউ মন্দ কাজ করলে তাকে হাত দিয়ে বাধা দাও, শক্তি না থাকলে তাকে মুখ দিয়ে নিষেধ করো, তাও না পারলে ঐ কাজকে ঘৃণা করো। এটাই ইমানের নিম্নতম ধাপ। আজ আমাদের ইমান একেবারে তলানীতে এসে ঠেকেছে। প্রতিদিন হাজার হাজার অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে আমাদের চারিদিকে। বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, আমরা এর প্রতিবাদও করি না। এইভাবে চলতে থাকলে বিশ্বের উত্তম জাতী থেকে অচিরেই আমরা অধম জাতীতে পরিণত হব। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, রমজানে রোজা রাখি, দান খয়রাত ও অন্যান্য ভাল কাজ করি। এতেই আমরা সন্তুষ্ট যে আমরা ইসলামের হক পরিপূর্ন ভাবে আদায় করছি। কিন্তু ভেবে দেখেছি কী যে আমাদের জন্য নির্ধারিত প্রধান ৪টি কাজের মাত্র দুটি আমরা পালন করছি? বাকি দুটি কর্ম আমাদের জীবন থেকে সম্পূর্ন রূপে হারিয়ে গেছে। সেই কাজ দুটিই হল, ভাল কাজের জন্য আদেশ করা এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখা। এ কাজ দুটি করতে আমরা বড়ই লজ্জা বোধ করি। কিন্তু এই দুই কাজের উপরই নির্ভর করবে, আমরা মুসলিম জাতী এই বিশ্বের জন্য কল্যাণকর কি না। এই সুরার ১১৪ নম্বর আয়াতেও একই তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ আমাদের বুঝ দান করুন।

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَأَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতী, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী। (৩:১১০)

১৫৩

অনেক অবিশ্বাসী ব্যক্তি অনেক ভাল ভাল কাজ করেন। মানব কল্যানে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার দান করেন তারা। আমাদের মনে একটি প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, এসব ভাল কাজের বিনিময়ে তারা পুরস্কৃত হবেন কিনা? আল্লাহ তা'লা তাদের এ ভাল কাজ সম্পর্কে একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। বরফ শীতল বাতাসে যেন তাদের ফসল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই এ ফসল নিয়ে তারা বাড়ি ফিরতে পারবে না। দুনিয়াতে তারা হয়তো নাম যশ খ্যাতি অর্থ উপার্জন করবে। কিন্তু আখিরাতে তারা কোনই প্রতিদান পাবে না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللهِ شَيْئًا وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَاخَالِدُونَ
مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هِـذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْفَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَـكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

নিশ্চয় যারা কাফের হয়, তাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কখনও কোন কাজে আসবে না। আর তারাই হলো দোযখের আগুনের অধিবাসী। তারা সে আগুনে চিরকাল থাকবে। এ দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ব্যয় করা হয়, তার তুলনা হলো ঝড়ো হাওয়ার মতো, যাতে রয়েছে তুষারের শৈত্য, যা সে জাতির শস্যক্ষেত্রে গিয়ে লেগেছে যারা নিজের জন্য মন্দ করেছে। অতঃপর সেগুলোকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের উপর কোন অন্যায় করেননি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করছিল।।(৩:১১৬-১১৭)

১৫৪

আমরা কি জানি,, ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাসী কাফের মুশরিকদের মনোভাব কি? তারা ইসলামের ধ্বংসের জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালাবে। মুসলমানের ক্ষতি করার জন্য তারা আপ্রান চেষ্টা চালাবে। তারা আমাদের প্রতি পদক্ষেপে বাধা দেবে। তাদের বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, তারা ইসলামকে কতটা ঘৃণা করে। কিন্তু যা তারা ব্যক্ত করে তার চেয়ে অনেক বেশী তারা তাদের অন্তরে গোপন করে। আমরা এবং আমাদের নেতৃবৃন্দ কী তা অবহিত আছি? আল্লাহ তালা খুবই স্পষ্ট ভাষায় তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন নীচের আয়াতে। এ ধরনের আরো অনেক আয়াত আছে কোরআনে। এগুলির ভিত্তিতে ফকিহ ও উলেমাগন লিখেছেন যে কোন মুসলিম দেশে অমুসলিমদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত দেওয়া জায়েজ নহে। আবু মুসা আশআরী রাঃ একজন অমুসলিমকে সেক্রেটারি নিযুক্ত করেছিলেন। উমার রাঃ সেটা জানতে পেরে তাকে কঠোর ধমক দিয়ে বলেন, "তুমি তদের কাছে টেনো না, আল্লাহ যাদের দূর করে দিয়েছেন। তুমি তাদের সম্মান দান করো না, আল্লাহ যাদের লাঞ্ছিত করেছেন। তুমি তাদের বিশ্বস্ত মনে করো না, আল্লাহ যাদের বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করেছেন।" কিন্তু বর্তমান মুসলিম দেশের নেতৃবৃন্দ কোরআনের এই নির্দেশনার

উল্টো কাজ করে চলেছেন। আর এতে দেশ ও জাতী চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর কত ক্ষতি হলে আমাদের চোখ খুলবে?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না-তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। (৩:১১৮)

১৫৫

আমরা অনেক সময় সত্যকে প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ করি, পাছে অন্যরা আমাদের সাম্প্রদায়িক ভাবতে পারে। কিন্তু যা সত্য তা বলতে আল্লাহ কখনো লজ্জা বোধ করেন না। তাই আল্লাহ তা'লা ইসলামের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের ঘৃন্য মনোভাব প্রকাশ করে দিয়েছেন নীচের আয়াতে। মুসলীমগণ অন্যদের কিতাবকে বিশ্বাস করে , আমরা তাদের নবীকে বিশ্বাস করি । আমরা মুক্ত মন নিয়ে তাদের কাছে এগিয়ে যায়। কিন্তু এর পরেও অবিশ্বাসীগন আমাদের প্রতি আক্রোশে আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। সুযোগ পেলেই তারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে তৎপর হয়ে উঠে। মহান আল্লাহ তালা তাদের আক্রোশ থেকে আমাদের হেফাজত করুন।

هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে, আমরা ঈমান এনেছি। পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক। আর আল্লাহ মনের কথা ভালই জানেন। (৩ঃ১১৯)

১৫৬

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধ হচ্ছে বদরের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য জীবন মরণের যুদ্ধ। মাত্র ৩১৩ জন যোদ্ধা, সাথে দুইটা ঘোড়া আর ৭০ টি উট। যুদ্ধ সামগ্রীও ছিল অতীব স্বল্প। সেই তুলনায় কোরেশদের বিশাল বাহিণী। পূর্ণ ক্রোধ আর রোষ নিয়ে তারা মুসলিমদের বিশ্বের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। এই অবস্থায় মুসলিমরা কিছুটা হতবুদ্ধি ও অস্থির অবস্থায় ছিল। মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলেন রাসুল। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথমে এক হাজার, পরে তিন হাজার এবং সর্ব শেষে ৫০০০ ফেরেশতা দিয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আসলো । জীবন পণ করে লড়লেন সাহাবীরা। আর অতি আশ্চর্য জনক ভাবে কোরেশদের বিশাল বাহিনীকে পরাস্ত করলেন তারা। আর একবার প্রমাণিত হোল, সত্যের পক্ষে আল্লাহর সাহায্য অবশ্যম্ভাবী।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। (৩ঃ১২৩)

১৫৭

বদরের যুদ্ধে ৩১৩ জন মুসলিম সেনাকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ ফেরেশতা পাঠান। সুরা আনফালের ৮:৯ নং আয়াতে এই সংখ্যা ১০০০ বলা হয়েছে। এই সুরার ১২৪ নং আয়াতে ৩০০০ হাজার ফেরেশতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু নীচের আয়াতে এই সংখা বাড়িয়ে ৫০০০ হাজারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আসলে এই সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে অনেকটা মনস্তাত্বিক কারনে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে একজন ফেরেশতা দিয়েই সমস্ত কাফের বাহিনীকে ধ্বংশ করতে পারতেন। খন্দকের যুদ্ধে এক রাতের ঝঞ্ঝাবায়ু কাফেরদের উচ্ছেদ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আল্লাহ চেয়েছেন মুসলমানরা সামনা সামনি যুদ্ধ করে নিজেদের শক্তিকে প্রকাশ করুক, তাদের সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি পাক। জনবল ও যুদ্ধ সামগ্রীর স্বল্পতাকে ঢেকে দেওয়ার জন্য আল্লাহ ১০০০ ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ৩১৩ জন মুসলমানের সাথে যোগ দিলেন ১০০০ ফেরেশতা। এই সংখ্যাটাই মুসলমানদের মনে এক অদম্য সাহসের সঞ্চার করলো। মনোবল ও সাহস আরও বাড়ানোর জন্য আল্লাহ এই সাহায্যের পরিমান তিন গুন বাড়িয়ে দিলেন। আল্লাহর এই সাহায্য এখানেই থেমে থাকে নি। মুসলিমগন যদি ধৈর্য্য আর সাহসের সাথে দৃঢ়পদ থাকে, আর যদি শত্রুরা দ্রুত গতিতে আক্রমন করে, তবে আল্লাহ এই সাহায্য ৫ গুন করে দিবেন বলে সুসংবাদ দিলেন। এই সুসংবাদ ৩১৩ জন হীনবল মুসলিম সেনার জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল। এখন তাদের মনে আর সংখ্যা-স্বল্পতার ভয় নাই। তাদের সাথে রয়েছে হাজার হাজার অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত ফেরেশতাগন। জয় তাদের সুনিশ্চিত। বাস্তবে তায়ই ঘটলো। কোরেশ বাহিনী সম্পর্নভাবে পরাভূত হলো বদরের প্রান্তরে।

بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ

অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাবেন। (৩:১২৫)

১৫৮

সুরাহ বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষনা দিয়েছেন যে সুদকে আল্লাহ হারাম করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল করেছেন। সমস্ত উলেমাগন এই আয়াতের আলোকে একযোগে ঘোষনা দিয়েছেন যে সব ধরনের সুদ হারাম। কিন্তু নীচের আয়াতে আল্লাহ বলেন যে তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়োনা। সুবিধাবাদী যারা তারা এই আয়াতকে ঢাল বানিয়ে বলতে চায় যে শুধুমাত্র চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ হারাম, অন্য ধরনের সুদ খাওয়া যাবে। এটা নিতান্তই একটি কুতর্ক। এখানে বিশেষভাবে চক্রবৃদ্ধি হারের কথা বলা হয়েছে কারন সেই সময় চক্রবৃদ্ধি সুদটাই সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল। ইহুদীগন ব্যাপকভাবে চক্রবৃদ্ধি সুদের ব্যবসা করতো। মক্কার কাফেররাও এই ব্যবসাতে অভ্যস্থ ছিল। সুদ হারাম হবার আগ পর্য্যন্ত অনেক মুসলমানগনও সুদের কারবারী ছিল। এমনকি নিকট অতীতেও কাবলীওয়ালাদের মধ্যে এই ব্যবসা প্রচলিত ছিল বলে আমরা গল্পে পড়েছি। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের

কবলে পড়ে অনেক পরিবার সর্বশ্রান্ত হয়েছে। এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসা একরকম অসম্ভব। এইসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ নীচের আয়াতে বিশেষভাবে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সার্বিকভাবে সব ধরনের সুদকেই হারাম করা হয়েছে সুরাহ বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে। আল্লাহ আমাদের বুঝার তওফিক দিন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো। (৩:১৩০)

১৫৯
জন্মের সুচনা থেকেই আমরা প্রতিযোগীতার মধ্যে রয়েছি, একটা দৌড়ের মধ্যে রয়েছি। মায়ের গর্ভে যে শুক্রকীটটি দৌড়ে প্রথম হয়ে মায়ের ডিম্বের কাছে পৌছালো, তারই কারনে আমার এই জন্ম লাভ। জন্মের পরেও সেই দৌড়ের শেষ হয় নি। মা বাবার কড়া শাসনের মধ্যে স্কুল জীবনেও সেই দৌড়ের মধ্যে ছিলাম। প্রতিটি পরীক্ষায় A গ্রেড পেতেই হবে। কর্ম জীবনেও নিস্তার নাই। যশ খ্যাতি সম্পদে সবাইকে হার মানাতে হবে। এদিকে মহান আল্লাহও আমাদের দৌড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ দিয়েছেন তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিতে ধাবিত হতে। এ দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অন্যদের সাথে প্রতিযোগীতা করতে বলা হয়েছে। আর এই প্রতিযোগীতাই হবে জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা, জীবনের শ্রেষ্ঠ দৌড়। এর বিনিময়ে আপনি পাবেন মহান আল্লাহর অশেষ ক্ষমা আর জান্নাত। ধারনা করুন, জান্নাতের বিশালতা সম্পর্কে। আকাশ ও পৃথিবী এর সীমানা, এত বিশাল এর বিস্তৃতি। । আমরা যদি মুত্তাকী হই , তাহলে এ জান্নাত আমাদের জন্যই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন:

وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য।।(৩:১৩৩)

১৬০
আগের আয়াতে আমরা আলোচনা করেছি কিভাবে আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাত পাওয়ার জন্য আমাদের প্রতিযোগিতা করতে হবে। নীচের দুই আয়াতে আল্লাহ Specify করে দিয়েছেন কারা আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাত পাবার যোগ্য। জান্নাতীদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা সুখে দুঃখে, সচ্ছল অসচ্ছল অবস্থায়, সর্ব ক্ষেত্রে, প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর পথে দান খয়রাত করে থাকে। কঠিন দারীদ্রতাও তাদের দানের হাতকে সংকুচিত করতে পারে না। এর পরেই আসে নিজের ক্রোধকে সংবরণ করা। হাদিসে এসেছে, মহা শক্তিমান সেই ব্যক্তি যে নিজের ক্রোধকে দমিয়ে রাখতে পারে। আর সর্বাবস্থায় রাগ দমন করতে পারলেই মানুষ মানুষকে ক্ষমা করতে পারে। নিজের শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দেয়, তারা মহৎ গুনের অধিকারী যা তাদের জান্নাতের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। যদি আমরা অন্যদের ক্ষমা করতে না পারি, তবে আল্লাহর ক্ষমা আমরা কিভাবে আশা করতে পারি। জান্নাতীদের আর এক বৈশিষ্ট্য হল, কোন অবস্থায় যদি প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন পাপ করে ফেলে, তবে অতি সত্ত্বর তারা তাওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, কোন সময়ই

তারা নিজেদের পাপে অটল থাকে না । এগুলিই হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া মানদন্ড এবং এসব লোকদেরই আল্লাহ তা'লা ভালবাসেন। এদের জন্যই রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাত।

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন।
তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না।
তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান। (৩:১৩৪-১৩৬)

১৬১
আমাদের অনেকেই প্রতি বছর নতুন নতুন দেশের নতুন কোন স্থান ভ্রমনের পরিকল্পনা করে থাকেন। এ ভ্রমনের উদ্দেশ্য কী? নতুন স্থান দেখা, নতুন লোকজনের সাথে পরিচিত হওয়া, নানা ধরনের খাদ্যের স্বাদ গ্রহন করা? ঠিক তাই। কিন্তু আল্লাহ তা'লাও আমাদের ভ্রমনের নির্দেশ দিয়েছেন- বিভিন্ন সভ্যতার ধ্বংশের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার জন্য, তাদের ইতিহাস জানার জন্য এবং তাদের পাপের জন্য কীভবে তাদের ধ্বংশ করা হয়েছিলো, তার তথ্য উদঘাটন করার জন্য। শুধু অতীতে নয়, বর্তমানেও এরকম বহু ঘটনা ঘটে চলেছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। ধ্বংশ প্রাপ্ত এই সব জাতির ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেন:-

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

তোমাদের আগে অতীত হয়েছে বহু ঘটনা । তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে।(৩:১৩৭)

১৬২
বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের পর মক্কার মুশরিকগন প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। এবার তারা সরাসরি মদিনা আক্রমনের পরিকল্পনা করে। আল্লাহর রাসুল সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে মদীনার বাইরেই কাফেরদের প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেন। ৭০০ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে তিনি ওহুদ প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করেন। ৫০ জনের এক তীরন্দাজের দলকে তিনি বাহিনীর পশ্চাদভাগ রক্ষার দায়ীত্ব দেন। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্য্যায়ে মুসলিম বাহিনী বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌছে যায়। কাফেররা পালাতে শুরু করে। বিজয় নিশ্চিত জেনে পিছনের তীরন্দাজ দল তাদের অবস্থান ছেড়ে মূল বাহিনীর সাথে যোগ দিতে যায়। এতেই শুরু হয় মুসলিম বাহিনীর বিপর্য্যয়। কাফেরদের ঘোড়সওয়ার বাহিনী খলিদ বিন ওলিদের নেতৃত্বে অরক্ষিত পশ্চাৎভাগ দিয়ে মুসলমানদের আক্রমন করে। ৭০ জন মুসলিম শহীদ হন। রাসুল নিজেও আহত হন। যুদ্ধের পরে মুসলিমদের অনেকটা সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই

নীচের আয়াতগুলি আল্লাহ নাজিল করেন। আল্লাহ বলেন, মানুষের বিপদের দিনগুলি পর্য্যায়ক্রমে অদল বদল হতে থাকে। বদরে মুসলমানগন বিজয়লাভ করেছে, কিন্তু ওহুদে তারা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে। এতে ভেঙ্গে পড়ার কিছু নাই। বরং এখান থেকেই শিক্ষা নিতে হবে। নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করতে হবে। আর এভাবেই আল্লাহ মুসলমানদের পরিশুদ্ধ করেন। আল্লাহ এই যুদ্ধে কিছু মুসলমানকে শহীদের দরজা দিয়েছেন, মুনাফিকদের আলাদা ভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন, এবং ইমানদারদের আরও দৃঢ়পদ ও মনোবলে সমৃদ্ধ করেছেন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক ভবিষ্যৎ বানী আল্লাহ করেছেন এই আয়াতে। এই যুদ্ধের মধ্যেই কাফেরদের সমুলে ধ্বংস হবার বীজ নিহিত আছে। ওহুদে কাফেররা নিরংকুশ বিজয় লাভ করতে পারে নি। কিন্তু ভবিষ্যতে বিজয়ের এক ক্ষীন আশা তাদের মনে বাসা বাধে। তাই পরবর্ত্তী বছরে তারা আবার মদীনা আক্রমন করতে প্ররোচীত হয়। কিন্তু ১০ হাজার সেনার বিশাল বাহিনী নিয়ে এসেও খন্দকের যুদ্ধে তারা মদীনা দখল করতে পারেনি। বিপর্যস্ত অবস্থায় তারা পালিয়ে যায়। আর মদীনা দখলের শেষ আশাটুকু তাদের দপ করে নিভে যায়।

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ

তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার, আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না।
আর এ কারণে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাফেরদেরকে ধবংস করে দিতে চান। (৩ঃ১৪০-১৪১)

১৬৩
নীচের আয়াতটিও ওহুদ যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে। নিজেদের সামান্য ত্রুটির জন্য মুসলিম বাহিনী যখন বিপর্যয়ের মুখে পড়ে, তখন অনেকে হতাশ হয়ে যায়। আল্লাহ মুসলিমদের মনোবল বাড়ানোর জন্য এই আয়াতে বলেন, তোমরা কি মনে করো যে কোন রকম পরীক্ষা ছাড়াই তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সবাইকে পরীক্ষা করবেন। এর আগের উম্মতদের আরো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তোমাদেরও আল্লাহ পরীক্ষা করবেন কারা আল্লাহ তা'লার পথে টিকে থাকার চেষ্টা করে এবং কারা যুদ্ধে দৃঢ় থাকে। সব কিছু নির্ভর করবে এই যুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়া এবং কার্যকারিতার উপর । কেমন ভাবে এই যুদ্ধকে তারা গ্রহন করে তার উপরই নির্ভর করছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে কি না? এ পরীক্ষায় তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হবার সাথে সাথে নির্ধারিত হবে জান্নাতের কোন স্তর তারা লাভ করবে। সুতরাং হতাশ হবার কোন কারন নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। বর্তমানেও এই আয়াত আমাদের জন্য প্রযোজ্য। প্রতি পদে পদে আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছি। পরীক্ষা ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য্যশীল।।(৩:১৪২)

১৬৪
অহুদের যুদ্ধের শেষদিকে যখন মুসলিমরা পশ্চাৎপসারন করে পাহাড়ে আশ্রয় নেন, তখন কাফেররা রটিয়ে দিল যে তারা মুহাম্মদ (সঃ) কে হত্যা করে দিয়েছে, এই রটনায় অনেক মুসলমান হতাশ হয়ে পড়ে, অনেকে যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ নীচের আয়াত নাজিল করেন। আল্লাহ বলেন, মুহাম্মদ (সঃ) একজন মানুষ ও রাসুল মাত্র। সমস্ত মানবীয় গুনের অধিকারী তিনি। অতীতের সমস্ত নবী-রাসুলগন মৃত্যু বরন করেছেন। অনেক নবী-রাসুলকে হত্যা করা হয়েছে। তোমাদের এই রাসুলের যদি মৃত্যু হয়, তবে কি তোমরা পিছু হটে আসবে? যারা পিছু হটবে, তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। এতে আল্লাহর কোন ক্ষতি হবে না। বরঞ্চ তোমাদের উচিৎ হবে আরও দ্বিগুন উৎসাহে দ্বীনের সাহায্যের জন্য ঝাপিয়ে পড়া এবং রাসুলের মিশনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই আয়াত নাজিল হবার পর মুসলিমরা যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো। নতুন উৎসাহ উদ্দীপনায় তারা নতুন ভাবে সংগঠিত হলো। এই সময় গুজব উঠলো যে মক্কার কাফেররা অর্ধেক পথ থেকে আবার ফিরে আসছে মদীনা আক্রমনের জন্য। রাসুল তখন তার নতুন সংগঠিত বাহিনী নিয়ে কাফেরদের বাধা দেওয়ার জন্য ছুটলেন। কিছুদুর যাবার পর যখন নিশ্চিত হলেন যে কাফেররা আর ফিরে আসবে না, তখন তারা আবার মদীনায় ফিরে আসলেন। এতে মুসলিমদের মনোবল আরো বৃদ্ধি পেলো। পরবর্তী পর্যায়ে বিদায় হজের কিছুদিন পরে রাসুল যখন সত্যি সত্যিই ইনতিকাল করলেন, তখন ওমর রাঃ উদভ্রান্তের মত হয়ে গিয়েছিলেন। আবু বকর রাঃ সবার সামনে তখন এই আয়াত পাঠ করেন। এতে ওমর রাঃ সম্বিত ফিরে পেলেন। সবাই নতুন করে উপলব্ধি করলেন যে কোন রাসুলই চিরস্থায়ী নহে, সবাইকে মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হবে। এক মাত্র মহান আল্লাহই অমর ও চিরঞ্জীব।

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ

আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন। (৩:১৪৪)

১৬৫
মৃত্যুর সময় ও স্থান সুনির্ধারিত। .নির্ধারিত ক্ষণের পূর্বেও কারো মৃত্যু হয়না, নির্ধারিত সময়কে অতিক্রমও কেউ করতে পারে না।। মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে মানুষ তার জন্য নির্ধারিত স্থানে যেয়ে হাজির হয়। সুরক্ষিত দুর্গে পালিয়ে থেকেও কেউ মৃত্যুকে রদ করতে পারে না। সুতরাং মৃত্যু ভয়ে সৎকাজ থেকে বিরত থাকা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। মৃত্যু তো তার নির্ধারিত সময়ে আসবেই। যারা এই মৃত্যুকেই আখিরাতের পাথেয় বানিয়ে নেয়, তারাই সবচেয়ে বুদ্ধিমান। মুলতঃ এই আয়াতগুলি আল্লাহ নাজিল করেছেন মুমিনদের জিহাদে উৎসাহ দেবার জন্য। মৃত্যু ভয়ে কেউ যেন জ্বিহাদকে পরিহার না করে, এটাই এই আয়াতের উদ্দেশ্য। এর আগেও অনেক নবী রাসুল সশরীরে যুদ্ধ করেছেন। বিশ্বাসীরা তাদের সাথে ছিলেন। শত বিপর্যয়ের মধ্যেও তারা সাহস হারান নি, হীনবল হন নি। সেই তুলনায় অহুদের বিপর্যয় অতি সামান্য।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ:

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না-সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুতঃ যে লোক দুনিয়ায় বিনিময় কামনা করবে, আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দান করব। পক্ষান্তরে-যে লোক আখেরাতে বিনিময় কামনা করবে, তা থেকে আমি তাকে তাই দেবো। আর যারা কৃতজ্ঞ তাদেরকে আমি প্রতিদান দেবো।
আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জেহাদ করেছে; আল্লাহর পথে-তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।
(৩ঃ১৪৫-১৪৬)

১৬৬
আল্লাহই আমাদের একমাত্র অভিভাবক, আমাদের সর্বোত্তম সাহায্যকারী এবং সংরক্ষণকারী। আমরা তাকেই মান্য করবো, তার নিকটই সাহায্য চাইব, তারই আশ্রয় গ্রহণ করবো। এর বাইরে অন্য কাউকে আমাদের অভিভাবক হিসাবে নেওয়া যাবে না। আর সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় প্রভৃতি কোন ব্যাপারেই কাফেরদের মান্য করা যাবে না। তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে না এবং আমাদের সংরক্ষক হিসাবেও গ্রহন করা যাবে না। আমরা যদি তা করি তাহলে আমরা সবদিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্থ হবো। তারা আবার আমাদের শিরকের মাঝে লিপ্ত করে দেবে, আমাদের দুনিয়া ও আখেরাত ধ্বংস হয়ে যাবে। এরশাদ হচ্ছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَبَلِ اللّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফেরদের কথা শোন, তাহলে ওরা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে, তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীণ হয়ে পড়বে। বরং আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী, আর তাঁর সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য।(৩:১৪৯-১৫০)

১৬৭
Islam Phobia বা ইসলাম ভীতি, এই শব্দটি বর্ত্তমানে সারা বিশ্বে বহুল পরিচিত একটি শব্দ। সমস্ত বিশ্ব এখন ইসলাম ভীতিতে ভুগছে। বিশ্বের সমস্ত অমুসলিম নেতাদের প্রধান এজেন্ডা একটিই, কিভাবে ইসলামকে প্রতিহত করা যায়, কিভাবে ইসলামের প্রসার বন্ধ করা যায়, কিভাবে মুসলিম রাষ্ট্রকে দমিয়ে রাখা যায়। তাদের ভাব এমন যে যদি মুসলিমরা ছাড়া পায়, তাহলে যেন তারা সারা বিশ্বকে চিবিয়ে খেয়ে নেবে। তারা মুসলিমদের নিয়ে সদা সর্বদা মহা আতংকে থাকে। এই আতংক শুধু আজকের নয়। অতীতেও তারা মুসলিম আতংকে ভুগতো। মধ্য যুগেও সমস্ত ইউরোপ তুর্কি আতংকে সন্ত্রস্ত ছিলো, বিশাল ভারত আফগানদের ভয়ে কাপতো। রাসুলের যুগ থেকেই এটা চলে আসছে। আল্লাহ বলেন, আমি কাফেরদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবো। হাদিসে এসেছে, রাসুল বলেন, এক মাসের দুরুত্বে অবস্থিত শত্রুর অন্তরে আমার ত্রাস ঢুকিয়ে দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। অহুদের যুদ্ধেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। জয়ের প্রান্তসীমায় এসেও কাফেররা মুসলিম বাহিনীকে

সম্পুর্ন ধ্বংশ করতে পারে নি। ফিরে যাবার পথে আবার তারা মদীনা আক্রমনের চিন্তা করে। কিন্তু অধিকাংশ কাফের নেতারা একটা আতংকে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তাই মদীনা আক্রমনের সাহস তারা পায়নি। আল্লাহ বলেন, এর কারন হচ্ছে তারা আল্লাহর সাথে শিরক করে, তারা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছে। শিরককারীরা অন্যের ভয়ে সদায় ভীত থাকে। অন্যদিকে মুসলমানরা যতদিন শিরক থেকে মুক্ত থাকবে, ততদিন সমস্ত বিশ্ব তাদের ভয়ে ভীত থাকবে।

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ

খুব শীঘ্রই আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করবো। কারণ, ওরা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে যে সম্পর্কে কোন সনদ অবতীর্ণ করা হয়নি। আর ওদের ঠিকানা হলো দোযখের আগুন। বস্তুতঃ জালেমদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। (৩:১৫১)

১৬৮

আল্লাহ তা'লা ততক্ষণ আমাদের সাহায্য করেন যতক্ষন আমরা তাকে এবং তার রাসূল (সঃ) কে মান্য করবো। ওহুদ যুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ শত্রুকে পদদলিত করে অগ্রসর হচ্ছিল এবং যখন তারা একেবারেই জয়ের দ্বারপ্রান্তে, ঠিক সেই মুহুর্তে কিছু যোদ্ধা আনন্দের আতিশর্যে রাসুল (সঃ) এর নির্দেশ ভুলে গিয়েছিল। তারা যে স্থানটি পাহারা দিচ্ছিল, সে স্থান ত্যাগ করে যুদ্ধলব্ধ মালামাল সংগ্রহে লিপ্ত হয়েছিল। রাসূল (সঃ) এর নির্দেশ ভুলে পার্থিব মালামালের প্রতি ধাবিত হওয়া আল্লাহ তা'লা পছন্দ করলেন না। ফলে যা হবার তাই হলো। মুসলমানদের এ যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেল। তবে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'লা মুসলমানদের ক্ষমা করলেন এবং রক্ষা করলেন। বস্তুতঃ পুরো অহুদ যুদ্ধটিই ছিল মুসলমানদের জন্য এক বিরাট শিক্ষনীয় বিষয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের ভাষ্যঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنبَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْوَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে তাঁর অঙ্গীকার পালন করেছিলেন যখন তোমরা তাঁর ইচ্ছায় তাদের টুকরো- টুকরো করছিলে। যতক্ষণ না তোমরা দুর্বলচিত্ত হয়ে পড়লে, আর তোমরা আদেশ সম্বন্ধে বিরোধ করলে ও অবাধ্য হলে যা তোমরা ভালোবাস তা (সেই বিজয়) তোমাদের দেখাবার পরে। তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল যারা এই দুনিয়া চাচ্ছিল, আর তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল যারা পরকাল চাচ্ছিল, তারপর তিনি তোমাদের তাদের থেকে পলায়নপর করলেন যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। আর তিনি নিঃসন্দেহ তোমাদের অপরাধ মার্জনা করলেন। আর আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের প্রতি অশেষ কৃপাময়। (৩:১৫২)

১৬৯

অহুদের যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য এক অপূর্ব কষ্টি পাথর ছিল। সাহাবীদের মধ্যে কার অবস্থান কোথায়, সেটা অতি সুক্ষভাবে নির্ধারন করে দিয়েছে এই যুদ্ধ। কিছু সাহাবী ছিলেন যারা রাসুলকে রক্ষার জন্য একটি মানব ঢাল তৈরী করেছিলেন। শত্রুর তীরকে তারা নিজের পিঠ দিয়ে ঠেকিয়েছিলেন। তরবারীর আঘাতকে তারা হাত দিয়ে প্রতিহত করেছেন। তালহার আঙ্গুলগুলি ছেদন হবার পরেই শত্রুর তরবারীর আঘাত রাসুলের হেলমেটে আঘাত করে। এ রকম ছিলেন একদল

সাহাবী। আবার একদল নিজেদের জীবন বাচাতে ব্যস্ত ছিলেন। রাসুলের ডাককে উপেক্ষা করে তারা দৌড়াচ্ছিলেন। আর একদল যুদ্ধের মাঠে তখনও দৃঢ়পদ ছিলেন। তাদের কেউ শহীদ হলেন। যারা বেচে ছিলেন আল্লাহ তাদের উপর এক প্রশান্তির তন্দ্রা দিয়ে আছন্ন করলেন। কেউ কেউ মনে করেছিলেন মদিনার বাইরে এসে যুদ্ধ না করলে হয়তো তাদের এত লোক ক্ষয় হতো না। আল্লাহ বলেন, মৃত্যুর দিন ক্ষন এবং স্থান পূর্ব নির্ধারিত। এখন যে যেখানে শহীদ হয়ে পতিত রয়েছেন, নিজেদের ঘরে বন্ধ করে রাখলেও তারা নির্দিষ্ট সময়ে এইখানে এসে হাজির হতো। অহুদ যুদ্ধের উপর এইরুপ অনেকগুলি আয়াত নাজিল হয়েছে এই সুরাতে। এই আয়াতগুলি দ্বারা আল্লাহ সমস্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন, সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছেন, মুমিনদের মনের কালিমা দূর করেছেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেছেন, ইমানকে আরও মজবুত করেছেন, পরিশেষে যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী সবাইকে তাদের ভুলত্রুটিগুলি ক্ষমা করে দিয়েছেন।

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

অতঃপর তোমাদের উপর শোকের পর শান্তি অবতীর্ণ করলেন, যা ছিল তন্দ্রার মত। সে তন্দ্রায় তোমাদের মধ্যে একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল। আর একদল নিজেদের জান নিয়েই ব্যস্ত ছিল। আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণা হচ্ছিল মুর্খদের মত। তারা বলছিল আমাদের হাতে কি কিছুই করার নেই? তুমি বল, সবকিছুই আল্লাহর হাতে। তারা যা কিছু মনে লুকিয়ে রাখে-তোমার নিকট প্রকাশ করে না সে সবও। তারা বলে আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। তুমি বল, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে তবুও তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসত নিজেদের অবস্থান থেকে যাদের মৃত্যু লিখে দেয়া হয়েছে। তোমাদের বুকে যা রয়েছে তার পরীক্ষা করা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা, আর তোমাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে তা পরিষ্কার করা ছিল তাঁর কাম্য। আল্লাহ মনের গোপন বিষয় জানেন। (৩:১৫৪)

১৭০

কিছুদিন আগেও করোনা পরিস্থিতিতে আমরা সব সময় এক মৃত্যু আতংকে ছিলাম। কখন যে কাকে মৃত্যু এসে হানা দেবে তা আমরা বলতে পারি না। কারো মৃত্যু হলে আমরা তা নিয়ে পর্য্যালোচনা করতে বসি। এটা করলে হয়তো তার মৃত্যু হতো না, ওখানে না গেলে হয়তো সে বেচে থাকতো, করোনা রুগির সেবা না করলে হয়তো সে আক্রান্ত হোত না। আল্লাহ বলেন, এটা কাফেরদের চিন্তা চেতনা। সমস্ত মানুষকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে। মৃত্যুর দিন ক্ষন স্থান সুনিদিষ্ট। সুরাহ নিসার ৪:৭৮ আয়াতেও আল্লাহ বলেছেন, সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে অবস্থান করলেও মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবে। তাই কোন মুমিন মৃত্যুকে নিয়ে আতংকে থাকতে পারেনা। সে মৃত্যু যুদ্ধের ময়দানেই হোক, বা করোনা রুগির সেবা করার জন্যই হোক। এর অর্থ এই না যে আমরা মৃত্যু থেকে সাবধান হবো না। যুদ্ধে গেলেও বর্ম, হেলমেট বা বাংকারের মত সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। করোনা যোদ্ধাদেরও সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এটাই আল্লাহর নির্দেশ ও রাসুলের সুন্নাত। এর পরেও যদি মৃত্যু আসে, তবে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর মহা ক্ষমা ও দয়া।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيِـي وَيُمِيتُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

হে ঈমাণদারগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কাফের হয়েছে এবং নিজেদের ভাই বন্ধুরা যখন কোন অভিযানে বের হয় কিংবা জেহাদে যায়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো, তাহলে মরতোও না আহতও হতো না। যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে। অথচ আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তোমাদের সমস্ত কাজই, তোমরা যা কিছুই কর না কেন আল্লাহ সবকিছুই দেখেন। (৩:১৫৬)

১৭১ .
আজ অথবা কাল, প্রত্যেকেরই মৃত্যু হবে। মৃত্যু থেকে কেউ পালিয়ে বাচতে পারবে না। তাই আমাদের মৃত্যু থেকে না পালিয়ে এমন এক মৃত্যুর অন্বেষণ করতে হবে যা হবে সব চেয়ে উত্তম মৃত্যু, যে মৃত্যু হবে সবচেয়ে লাভজনক। আল্লাহ আমাদের এমনই এক মৃত্যুর সন্ধান দিয়েছেন নীচের আয়াতে। একজন মানুষ সারা জীবনে যে নেকী জমা করতে পারে, এই মৃত্যু তার থেকেও শ্রেয়। এটা হল জেহাদের পথে মৃত্যু। জেহাদে যদি কেউ শহীদ হন অথবা জেহাদ অবস্থায় অন্য কোন কারনে মৃত্যু বরন করেন, তবে সেই মৃত্যু নিয়ে আসবে আল্লাহর মহা ক্ষমা ও দয়া, সেটাই হবে সর্ব উত্তম মৃত্যু। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত এবং আল্লাহ তাদের নিয়মিত আহার যোগান। অনেকে হয়তো নিরাশ হয়ে বলবেন, কিভাবে আমরা শহীদী মৃত্যু পাবো? সারা জীবনেও আমরা কোন যুদ্ধ পেলাম না। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, বাংলাদেশের মিলিটারী সার্ভিসে যারা আছেন ও ছিলেন তাদের জন্য কিন্তু এই সুযোগ সব সময়ই রয়ে গেছে। আমরা সব সময়ই জেহাদের প্রস্তুতির মধ্যে আছি। শুধু আপনার নিয়তকে ঠিক করে নিতে হবে। আপনি মনে করবেন, বাংলাদেশের ১৭ কোটি মুসলমানের এই দেশ এবং এর জান মাল ইজ্জত রক্ষার জন্য আমার এই যুদ্ধ প্রস্তুতি। আল্লাহ আমার জ্বিহাদকে কবুল করুন। আপনি এটা মুখে বলুন এবং মনে প্রানে প্রচন্ড ভাবে বিশ্বাস করুন। ইনশা আল্লাহ, আপনি জিহাদের পরিপূর্ণ প্রতিদান পাবেন। মহান আল্লাহর ক্ষমা দয়ায় সিক্ত হবেন আপনি।

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ

আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর তবে আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও করুণা পাবে, যা সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম যা তোমরা জমা করেছ। আর তোমরা মৃত্যুই বরণ কর অথবা নিহতই হও, অবশ্য আল্লাহ তাআলার সামনেই সমবেত হবে। (৩:১৫৭-১৫৮)

১৭২
অধীনস্তদের সাথে কোন ধরনের ব্যবহার করতে হবে, তার এক সুন্দর আচরনবিধি আল্লাহ দিয়েছেন নীচের আয়াতে। যদিও আয়াতটি অহুদের যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত, তবুও এটা এক সার্বজনীন আয়াত। সব যুগের সমস্ত কমান্ডারদের জন্য আয়াতটি প্রযোজ্য। কমান্ডারের প্রথাম গুন হবে কোমল হৃদয়, দয়াময়। তারা রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হলে অধীনস্তগন সর্বদা এক আতংকের মধ্যে থাকবে, মন খুলে তারা কথা বলতে ভয় পাবে এবং সব সময় দুরে দুরে থাকার চেষ্টা করবে। এতে অনেক বিষয় কমান্ডারের গোচরে আসবে না, পরিস্থিতির পূর্ণ চিত্র কমান্ডার জানতে পারবেন না। কমান্ডারের উচিত অধীনস্তদের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে তাদের ভুলটি ধরিয়ে দেওয়া এবং আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া। এতে অধীনস্তগন সংশোধন হবার সুযোগ পাবে এবং কমান্ডারকে তার পূর্ণ সহযোগীতা প্রদান করবে। কোন ব্যাপারে Final Decision নেওয়ার আগে কমান্ডারের উচিত

অধিনস্তদের সাথে পরামর্শ সভায় বসা, তাদের মতামত নেওয়া, বিশেষ করে অভিজ্ঞদের মতামত জিজ্ঞেস করা। এতে অধিনস্তদের মূল্যায়ন করা হবে এবং তারা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। সব কিছু বিচার বিবেচনা করে Final Decision নিবেন কমান্ডার নিজে আল্লাহর উপর সম্পূর্ন ভরসা রেখে। একবার Decision নেওয়া হয়ে গেলে সেটা সম্পন্ন করা সংশ্লিষ্ট সবার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, সফলতা নির্ভর করবে আল্লাহর উপর। আমরা শুধু নির্দিষ্ট দায়ীত্বটি নিষ্ঠার সাথে পালন করবো।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন, পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন। আল্লাহ তাওয়াক্কুল কারীদের ভালবাসেন। (৩:১৫৯)

১৭৩

কয়েকদিন আগে এক উপ্সম্পাদকীয় পড়লাম সৌদী রাজশক্তির উপর। লেখক সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন কীভাবে সৌদী রাজ শক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরাশক্তির উপর নির্ভর করে টিকে আছে। বর্তমানে তাদের অবস্থা এমন দাড়িয়েছে যে তারা ইসলামের পরম শত্রু ইসরাইলের সাহায্য নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। ইসলামের দুই হারাম শরীফের হেফাজতের দাবীদার সৌদী আরবের অবস্থা যদি এই হয়, তবে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলির কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়। অথচ আল্লাহ বলেন, আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা রাখতে হবে এবং তারই নিকট সাহায্য চাইতে হবে। তিনিই সর্বোত্তম সাহায্য কারী। আল্লাহ যদি আমাদের উপর থেকে তার সাহায্য প্রত্যাহার করেন তবে কেউই আমাদের সাহায্য করতে পারবে না। কোরআনের আরো অনেক আয়াতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা মুশরিক কাফেরদের তোমাদের অভিভাবক বানিও না। অথচ আমরা চলেছি সম্পূর্ণ উলটা দিকে। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

إِن يَنصُرْكُمُ اللهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ

যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহর ওপরই মুসলমানগনের ভরসা করা উচিত। (৩:১৬০)

১৭৪

মানুষ মানুষের জন্য। একজন মানুষ আর একজন মানুষকে যেমন ভাবে বুঝতে পারে, তার হৃদয়ের অনুভুতিগুলিকে উপলব্ধি করতে পারে, তার দুঃখ কষ্টকে জান প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে পারে, তার সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করতে পারে, অন্য কোন জীব সেটা পারে না। এমনকি ফেরেশতারা মানুষের এত হৃদয়ের কাছে আসতে পারে না। তাই আল্লাহ মানুষকেই অন্য মানুষদের জন্য নবী-রাসুল করে

পাঠিয়েছেন, যাতে তারা অতি কাছ থেকে নিজেদের ভাষায় নিজেদের মানুষকে পথ দেখাতে পারেন। এটা আল্লাহর এক বিশেষ রহমত যে মানুষদেরই আল্লাহ নবী বানিয়েছেন। আমাদের রাসুলকে আল্লাহ কোরআন দিয়ে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ রাসুলের জন্য চারটি কাজকে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই চারটি কাজের কথা সুরাহ বাকারার ১৫১ নং আয়াতেও রয়েছে। Priority অনুসারে এই চারটি কাজ হলো, (১) কোরআন আবৃত্তি করা (২) ইমানদারদের পরিশুদ্ধ করা; (৩) কোরআন শিক্ষা দেওয়া, (৪) জ্ঞান, হিকমাত শিক্ষা দেওয়া। এখানে কোরআন তেলাওয়াত করাকে এক নম্বরে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং কোরআন শিক্ষাকে তিন নম্বরে। বোঝা যাচ্ছে যে তেলাওয়াত ও শিক্ষা করা দুইটি আলাদা বিষয়। আসলে কোরআন তেলাওয়াত সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। চাষী-মজুর, শ্রমিক-নেতা, শিক্ষিত অশিক্ষিত, বুঝদার-অবুঝদার, সাক্ষর-নিরক্ষর ইত্যাদী আপামর সমস্ত জনসাধারনের জন্য কোরআন আবৃত্তিকে একটা অভ্যাসে পরিনত করতে বলা হয়েছে। তাই প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামাজে কোরআনের কিছু অংশ পাঠ করতেই হবে, না হলে নামাজ হবে না। কোরআন তেলাওয়াতে প্রতিটি শব্দের জন্য আল্লাহ ১০টি নেকির ঘোষনা দিয়েছেন। এই তেলাওয়াত বুঝেও হতে পারে, না বুঝেও হতে পারে। এইটুকু করলেই একটি হৃদয় পরিশুদ্ধ হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তাই অন্তর পরিশুদ্ধ করাকে ২ নম্বরে রাখা হয়েছে। এর পরেই আসে কোরআন শিক্ষা। কোরআনের প্রতিটি আয়াতের মর্মার্থ উপলব্ধি করা, বিশ্লেষণ করা, ব্যাখ্যা করা, শানে নজুল জানা এবং কোরআনের অন্যান্য বিষয় নিয়ে গবেষনা করা, ইত্যাদী বিষষগুলি আসে কোরআন শিক্ষার আওতায়। শিক্ষিত, অভিজ্ঞ এবং জ্ঞান-প্রজ্ঞায় পরিপক্ক ব্যক্তিদের জন্যই এটা প্রযোজ্য। বর্ত্তমানে একদল লোক বলে বেড়াচ্ছে, সবাইকে কোরআন বুঝে পড়তে হবে, না হলে কোন সওয়াব নাই। এটা ঠিক নহে। অশিক্ষিত নিরক্ষর লোক না বুঝে কোরান তেলাওয়াত করলেও নেকী আছে, প্রতি শব্দে ১০টি করে। তবে আমরা যারা শিক্ষিত, অধিক জ্ঞান লাভের জন্য কোরআন হাদিস বুঝে পড়াই উচিত। এতে আরো বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে। তাই আমাদের কথা, সবাই কোরআন পড়ুন। বুঝেন আর না বুঝেন, পড়তে থাকুন। আল্লাহ সওয়াব দেবেন, ইন্‌শা আল্লাহ। ইসলামের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বোঝানোর জন্য মসজিদের ইমাম রয়েছেন, শিক্ষিত আত্মীয় স্বজন রয়েছেন, অভিজ্ঞ প্রতিবেশী রয়েছেন। কিন্তু কোরআন পড়াটা সম্পূর্ন আপনার নিজ দায়ীত্ব, আপনি নিরক্ষর হলেও।

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ

আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট। (৩:১৬৪)

১৭৫

যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছেন আল্লাহ তাদের জীবিত বলেছেন। শুধু তাই নয়, তারা আল্লাহর কাছ থেকে নিয়মিত রিজিক প্রাপ্ত হন। কি ভাগ্যবান তারা। আমাদের দৃষ্টিতে নিহত, অথচ তারা জীবিত। আমাদের দৃষ্টিতে মৃত, অথচ তারা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেন। সুরাহ বাকারার ১৫৪ নম্বর আয়াতেও একই রকম বর্ণনা এসেছে। কিন্তু কেমন হবে এই শহীদি জীবন, তার প্রকৃত ধারণা এই দুনিয়াবাসীর নাই। তবে এটা বোঝা যায় যে তারা কোন না কোন ধরনের দেহকে ধারন করবে যাতে বেহেশতী খাদ্য পানীয়ের স্বাদ তারা গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য এক হাদিসে এসেছে, শহীদের আত্মা গুলিকে সবুজ রংয়ের পাখীর দেহ দান করা হবে এবং তারা বেহেশতে যথেচ্ছ উড়ে বেড়াতে পারবে,

ফল ফলাদি উপভোগ করতে পারবে। বস্তুত শহীদেরা এতই আনন্দে থাকবে যে তারা বার বার পৃথিবীতে আসতে চাইবে শুধু আর একবার শহীদ হবার জন্য।

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। (৩ঃ১৬৯)

১৭৬

রাসুলের জীবদ্দশায় মুসলিমগন সবচেয়ে বেশী ক্ষতির সন্মুখীন হন অহুদের যুদ্ধে , রাসুলের একটি নির্দেশ যথাযথ পালন না করার কারনে। এই যুদ্ধে রাসুলের চাচা হামজা রাঃ সহ ৭০ জন সাহাবী নিহত হন এবং অনেকে আহত হন। রাসুল নিজেও আহত হয়েছিলেন। রাসুল বাকী সাহাবীদের নিয়ে মদীনায় ফিরে আসলেন। মুশরিকরা মক্কায় ফেরার পথে। হঠাৎ তাদের খেয়াল হলো, তারা এই সুযোগে মদীনা আক্রমন করে মুসলিমদের সমূলে উচ্ছেদ করতে পারে। চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে কাফেররা মদীনা আক্রমন করতে আসছে। মদীনার মুসলমানেরা তখন নিহত ও আহতদের কারনে মর্মাহত ও মনোকষ্টে ছিলেন। এত কষ্টের মধ্যেই রাসুর জিহাদের ডাক দিলেন। অহুদের যুদ্ধে জীবিত ফিরে আসা সকল সাহাবীকে যুদ্ধে যোগদানের নির্দেশ দিলেন তিনি। অনতিবিলম্বে মুসলিমগন যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে রাসুলের পশ্চাতে সমবেত হলেন। রাসুল তাদেরকে নিয়ে মদীনা থেকে ৮ মাইল দুরে হামরাউল আসাদে এসে কাফেরদের মোকাবিলার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন। ইতিমধ্যে কাফেররা রাসুলের প্রস্তুতির খবর পেলো। আল্লাহও তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। ভীত সন্ত্রস্ত কাফেররা তাড়াহুড়ো করে মক্কার পথ ধরলো। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ নীচের আয়াত নাজিল করে যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী সাহাবীদের প্রশংসা করলেন এবং তাদের জন্য এক মহা পুরুষ্কারের ঘোষনা দিলেন। মুসলিমদের ইমান ও মনোবল আরও বৃদ্ধি পেলো।

الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেযগার, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরুস্কার। (৩:১৭২)

১৭৭

আমরা আগেই বলেছি, অহুদ যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য একটি কষ্টি পাথর। সাহাবীদের কার বিশ্বাসের মাত্রা কোন পর্যায়ের, তা অতি পরিস্কার ভাবে ফুটে উঠে এই যুদ্ধে। যুদ্ধ যাত্রার প্রথমেই ৩০০ জনের এক দলকে সাথে নিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যুদ্ধ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে। যুদ্ধ যখন জয়ের দ্বারপ্রান্তে তখন কিছু সাহাবি নিজেদের দায়ীত্ব পালনে দৃঢ় ছিলেন না। ফলে এক বড় বিপর্যয় নেমে আসে মুসলিম শিবিরে। যুদ্ধে যখন ৭০ জন সাহাবী নিহত হলেন, অনেকে আহত হলেন, তখন কারো কারো বিশ্বাস একদম তলানীতে এসে ঠেকে। মদীনাতে ফিরে এসে যখন রাসুল আবার যুদ্ধ প্রস্তুতির ডাক দিলেন, তখনও অনেকে এটাকে আত্মহত্যার শামিল বলে মনে করেছিলেন। এই সব ঘটনায় রাসুল খুবই মর্মাহত হন, মনে খুবই কষ্ট পান। আল্লাহ রাসুলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এই সব আচরনে আপনি দুঃখ পাবেন না। তারা কোনভাবেই আল্লাহ ও রাসুলের কোন

ক্ষতি করতে পারবে না। যারা তাদের অবিশ্বাসে অটল থাকে, নিশ্চয়ই পরকালে তাদের কোন অংশ নাই। বরং এমন কিছু সাহাবী আছেন, যারা সব সময় রাসুলের চারিদিকে দৃঢ়পদে অটল থাকেন, শত তীর বা তরবারীর আঘাত তাদেরকে এতটুকুও পদচ্যুতি করতে পারে না। অহুদের মাঠে তারা তাদের বিশ্বাসের চরম ও চুড়ান্ত পরীক্ষা দিয়েছেন।

وَلاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ اللّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

আর যারা দ্রুত গতিতে অবিশ্বাস করে, তাদের আচরণ যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়। তারা নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আখেরাতে তাদেরকে কোন কল্যাণ দান না করাই আল্লাহর ইচ্ছা। বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে মহা শাস্তি। (৩:১৭৬)

১৭৮ .
কখনো কখনো আমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি যে, কেন আল্লাহ তা'লা অবিশ্বাসী পাপী ব্যক্তিদের এত সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন। তারা কেন সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের তুলনায় দীর্ঘ জীবন লাভ করে? কেন এত আরাম আয়েশ ভোগ করে? কেন পৃথিবীতে তাদের শাস্তি হচ্ছে না? কিন্তু আল্লাহ বলেন যে, এটা তাদের জন্য মোটেই আল্লাহর অনুগ্রহ নহে। বরং তাদের লাগাম আলগা করে দেয়া আছে, তাদেরকে অবসর দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ হয়তো ফিরে আসতে পারে। কিন্তু অধিকাংশই আরো বেশী বেশী পাপ করে তাদের পাপের ভাটা পূর্ণ করে । পরে তারা ইহকালেও ধরা খেয়ে লাঞ্ছিত হয় এবং আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাময় শাস্তি। একই রকম বানী রয়েছে সুরাহ মুমিনুনের ২৩ঃ৫৫-৫৬ নম্বর আয়াতে। নীচের আয়াতেও আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

কাফেররা যেন মনে না করে যে আমি যে, অবকাশ দান করি, তা তাদের পক্ষে কল্যাণকর। আমি তো তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে করে তারা পাপের মাত্রা আরো বাড়িয়ে তুলে। আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (৩:১৭৮)

১৭৯
ইসলামে সম্পদ জমা কারীকে কখনই উৎসাহিত করা হয়নি। বিষয়টি একাধারে ব্যবসায়ী, ব্যক্তি এবং সকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য। আপনাকে আয় করতে হবে এবং সেই সাথে তা ব্যয় করতে হবে। এ ব্যয় হবে আল্লাহর পথে। আপনার নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, আত্মীয় স্বজন এবং অভাবী মানুষের জন্য। এমন কি আপনি যে অর্থ আপনার পরিবারের জন্য ব্যয় করবেন তাও সাদকা হিসাবে বিবেচিত হবে। এই দুনিয়াতে আমরা কি দেখি? সরকার থেকে আপনার জেলার উন্নয়নের জন্য যে টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তা যদি আপনি ছয় মাসের মধ্যেই খরচ করে ফেলেন, তবে সরকার আরো অর্থ পুনঃ বরাদ্দ করার চিন্তা ভাবনা করবে। কিন্তু যারা বছর শেষেও সব টাকা খরচ করবে না, তাদের উদ্‌বৃত্ত টাকা ফেরত যাবে সরকারী কোষাগারে। তদ্রূপ আল্লাহ আপনাকে যা বরাদ্দ দিয়েছেন, তা যত উন্নয়নের কাজে ব্যয় করবেন, আল্লাহ আপনার বরাদ্দ আরো বাড়িয়ে দেবেন। তাই আপনার সম্পদ সময় থাকতে উপযুক্ত খাতে ব্যয় করুন। যেটা জমিয়ে রেখে মারা যাবেন, সেটার পুরোটায়

লস। বরং যারা ধন সম্পদ জমায় এবং সকালে বিকেলে তাদের ধন সম্পদের হিসাব করে, তাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَابَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

আর আল্লাহ্ তাঁর করুণা ভান্ডার থেকে তাদের যা দান করেছেন সে-বিষয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন না ভাবে যে তাতে তাদের মঙ্গল আছে। বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গল। যে বিষয়ে তারা কঞ্জুসি করে তা কিয়ামতের দিনে তাদের গলায় ঝুলানো থাকবে। আর মহাকাশমন্ডল ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আল্লাহ্র। আর যা তোমরা করো আল্লাহ্ তার পূর্ণ ওয়াকিফহাল। (৩:১৮০)

১৮০
আল্লাহর রাস্তায় দান খয়রাত করা এক মহা পুন্যের কাজ। আল্লাহ সব সময় মুমিনদের দান ও সাদাকাহ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। যখন এই আয়াত নাজিল হোল, "কে আছে এমন যে আল্লাহকে ঋণ দিবে, উত্তম ঋণ (২ঃ২৪৫ ও ৫৭ঃ১১)", তখন ইহুদীগন এই আয়াত নিয়ে হাসাহাসি আরম্ভ করে দিলো। তারা মুসলিমদের বিদ্রূপ করে বলতে লাগলো, তোমাদের আল্লাহ কি গরীব হয়ে গেছেন? তিনি কেন তোমাদের কাছে ঋণ চাচ্ছেন ? মহান আল্লাহ বলেন , এই ব্যাঙ্গাত্বক কথা বার্তা বলার জন্য নিশ্চয়ই তারা আগুনে দগ্ধ হবে। আমাদের মাঝেও অনেকে আছেন যারা এই আয়াতের বিরোধীতা করেন। তারা বলেন, আল্লাহকে এইভাবে ঋণী বলা তার মর্যাদাকে অবনমিত করে। আসলে তারা এই আয়াতের মর্মার্থ যথাযথ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। কর্জে হাসানার জন্য যে মহা বিশাল প্রতিদান রয়েছে সেটাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই আল্লাহ এই ধরণের শব্দ চয়ন করেছেন। এরশাদ হচ্ছেঃ-

لَّقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান! এখন আমি তাদের কথা এবং যেসব নবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তা লিখে রাখব, অতঃপর বলব, আস্বাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব। (৩ঃ১৮১)

১৮১
হাবিল ও কাবিলের কাহিনী নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। সুরাহ মায়েদাতে আছে এই ঘটনা। বাইবেলেও জেনেসিস অধ্যায়ে এদের কাহিনী বর্নিত হয়েছে। হাবিল-কাবিল দুজনই আল্লাহর নামে কোরবানী দিলেন। হাবিলের কোরবানী আকাশ থেকে আগুন এসে পুড়িয়ে দিলো। কিন্তু কাবিলের কোরবানী অক্ষত রইলো। এর অর্থ হলো হাবিলের কোরবানী আল্লাহর কাছে গৃহিত হয়েছে, কাবিলেরটা হয়নি। এই পদ্ধতি বনি ইসরাইলের যুগেও চালু ছিল। অনেক সময় নবীগনও কোরবানী করে প্রমান দিতেন যে তারা সত্যিকারের নবী। মদীনার ইহুদীগন এটাকেই একটা ছুতা হিসেবে গ্রহন করে। তারা দাবী করতে থাকে যে যতক্ষন না এই নবীর কোরবানী আকাশ থেকে আগুন এসে ভস্মিভুত না করে, ততক্ষন তারা এই নবীর উপর ইমান আনবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ নীচের আয়াত নাজিল করেন। আল্লাহ বলেন, তোমরা মিথ্যা মিথ্যাই এই দাবী করছো। কারন এর আগে তোমাদের মাঝে অনেক নবী এসেছিলেন যারা তোমাদের এই দাবী পুরন করেছিলেন। কিন্তু

তারপরেও তোমরা সেই নবীদের হত্যা করেছ। সুতরাং তোমরা মিথ্যা এক ছুতা বের করেছ যাতে এই নবীর উপর ইমান না আনতে হয়। এর পরের আয়াতে আল্লাহ রাসুলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে, ইহুদীরা তাকে মিথ্যাজ্ঞান করছে বলে রাসুল যেন মনোকষ্টে না ভুগেন। এটা ইহুদীদের একটা স্বভাব। অতীতে নবীরা এসেছেন, তাদের সাথে স্পষ্ট নির্দশন ছিল, আল্লাহর কিতাব ছিল, সহিফা ছিল। তারপরেও ইহুদীরা তাদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, একের পর এক নবীদের হত্যা করেছে। তাদের অহমিকা, মিথ্যা অহংকার ও একগুয়েমী সত্য গ্রহনে তাদেরকে বাধা দিয়েছে। সুতরাং এতে যেন রাসুল মনোকষ্টে না ভোগেন।

الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىَ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

যারা বলে যে, আল্লাহ আমাদিগকে এমন কোন রসূলের ওপর বিশ্বাস না করতে বলে রেখেছেন যতক্ষণ না তারা আমাদের নিকট এমন কোরবানী নিয়ে আসবেন যাকে আগুন গ্রাস করে নেবে। আপনি তাদের বলে দেন, তোমাদের মাঝে আমার পূর্বে বহু রসূল নিদর্শনসমূহ এবং তোমরা যা আব্দার করেছ তা নিয়ে এসেছিলেন, তখন তোমরা কেন তাদেরকে হত্যা করলে যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক। (৩:১৮৩)

১৮২
কাকে আমরা বিশ্বের সবচেয়ে সফল ব্যক্তি বলব? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট? বিল গেটস? আইনস্টাইন? অ্যালেকজান্ডার? মার্ক্স-লেনিন? অথবা মহামতি বুদ্ধ? যিনি বিশাল সম্পদ উপার্জন করেছেন তাকে কি আমরা সফল ব্যক্তি বলবো? যিনি তার জাতিকে কঠোর হস্তে শাসন করেছেন, সেই নেতাকে কি আমরা সফল বলবো? অথবা একজন সেনাপতি যিনি অর্ধ বিশ্ব জয় করেছেন, তাকে সফল বলবো? আল্লাহর কাছে কিন্তু সফলতার মাপকাঠি অন্য কিছু। আল্লাহর চোখে তিনিই সফলকাম যিনি তার দুনিয়ার কাজ দিয়ে নিজেকে নরকের আগুন থেকে বাঁচাতে সমর্থ হবেন। সেই প্রেসিডেন্টই সফল যার সুশাসন দেখে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। সেই ধনী ব্যক্তিই সফল যার ধন সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় হয়েছে। সেই সেনাপতিই সফল যার তরবারি জিহাদের ময়দানে ঝিলিক দিয়েছে। আমাদের সবাইকে একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর তার পরেই বোঝা যাবে কে সফল আর কে ব্যর্থ। সফলতার হাসি তার মুখেই ফুটবে যাকে আল্লাহ বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহতালা এরশাদ করেনঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْفَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ

প্রত্যেক সত্ত্বাকে মৃত্যু আস্বাদন করতে হবে। আর নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিনে তোমাদের প্রাপ্য পুরোপুরি তোমাদের আদায় করা হবে। কাজেই যাকে আগুন থেকে বহুদূরে রাখা হবে ও স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করা হবে, নিঃসন্দেহ সে হ'ল সফলকাম। আর এই দুনিয়ার জীবন ধোকার সম্বল ছাড়া কিছুই নয়। **(৩ঃ১৮৫)**

১৮৩
এই আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের সংখ্যা অতীতের চেয়ে বর্তমানেই বেশী। এরা শুধু তাদের পার্থিব কৃতিত্ব নিয়েই খুশী তা নয়, তারা চায় তাদের খাতায় এমন কৃতিত্বও লেখা হোক যা তারা

আদোও করে নাই। পদাভিলাষী ও যশান্বেষী প্রকৃতির মানুষ যারা এবং চালাকী ও চাতুর্যের মাধ্যমে নেতৃত্ব লাভকারী নেতা যারা, তাদের মধ্যে এরোগ অতি প্রবল । হেন তেন প্রকারে তারা যশ খ্যাতি অর্থ নেতৃত্ব দখল করতে চাই। ন্যয় অন্যায় আইন বিচার বা নিয়ম নীতির তোয়াক্কা তারা করে না। পৃথিবীর বিচার ব্যবস্থা হয়তো তাদের অব্যাহতি দিয়েছে, কিন্তু আল্লাহর বিচার থেকে তারা অব্যাহতি পাবে না। এরশাদ হচ্ছেঃ-

لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

তুমি মনে করো না, যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তারা আমার নিকট থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (৩ঃ১৮৮)

১৮৪

সুরাহ ইমরানের শেষ দশটি আয়াত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাদিসে এসেছে, আল্লাহর রাসুল মাঝ রাতে ঘুম থেকে জেগেই এই আয়াতগুলি পড়তেন, তারপর অজু করে তাহাজ্জদ নামাজে দাড়াতেন। নীচের দুই আয়াতে আল্লাহ বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কারন একমাত্র তারাই আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষনা করেন, তারাই জানেন কিভাবে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, কিভাবে গ্রহ নক্ষত্র গুলি মহাকাশে নিজ কক্ষ পথে সাতরে চলেছে, কিভাবে দিন রাত্রির আবর্তন হয়। মহা বিশ্বের বিশালতা দেখে, সৃষ্টির মহা কৌশল দেখে তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। নিজের অজান্তেই তারা সৃষ্টিকর্তার চরণে লুটিয়ে পড়ে। তাই মহান আল্লাহ তা'লা বিজ্ঞানীদের আহ্বান জানাচ্ছেন- তারা যেন বিশ্ব জগতের সৃষ্টি নিয়ে এবং দিন ও রাত্রির পরিবর্তন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন। যারা আল্লাহ তা'লার এ বিশাল নিদর্শন নিয়ে ভাবেন তাদের জন্য এতে গভীর চিন্তার খোরাক রয়েছে । এ সব নিদর্শন নিয়ে গবেষণার পর অনেক অবিশ্বাসী বিজ্ঞানী আল্লাহ তা'লার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং সর্ব শক্তিমান সৃষ্টি কর্তার মহিমা ঘোষনা করেছেন। আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেনঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে। যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষযে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।। **(৩ঃ১৯০-১৯১)**

১৮৫

আগের তিনটা আয়াতে মহান আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করা হয়েছে- "হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দুর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে তুমি অপমানিত

করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না।" তারই উত্তরে আল্লাহ নীচের এই আয়াতটি নাজিল করে জানিয়ে দিলেন যে আল্লাহ তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তোমাদের প্রার্থনা কবুল করেছেন। শুধু তাই নহে, আল্লাহ আবার ঘোষনা দিলেন যে আল্লাহর কাছে নর ও নারীর মধ্যে প্রতিদানের বেলায় কোন পার্থক্য নাই। কিছু মহিলার অনুযোগের কারনেই আল্লাহ এই ঘোষনা দিয়েছেন। আনুগত্যে এবং সৎকাজের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ই সমান। প্রতিদানও পাবে সমান সমান। কোরআনের অন্য আয়াতে নারী ও পুরুষদের কথা আলাদা ভাবে উল্লেখ করে আরো বিস্তৃতভাবে এটা বলা হয়েছে। সুতরাং মহিলাদের অনুযোগ করার কোন কারন নাই। যারা হিজরত করেছে, দেশ থেকে যারা বহিস্কৃত হয়েছে, যারা যুদ্ধে নিহত ও আহত হয়েছে, অবশ্যই আল্লাহ তাদের মাফ করে দিবেন, তাদের মন্দ কাজগুলি মুছে দিয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তারা নারী হোক বা পুরুষ হোক, সবাই সমান প্রতিদান পাবেন।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللهِ وَاللهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। তারপর সে সমস্ত লোক যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব। এবং তাদেরকে প্রবিষ্ট করাব জান্নাতে যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত। এই হলো বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়। (৩:১৯৫)

১৮৬

আহলী কিতাবিদের প্রধান কাজ ছিল কিভাবে ইসলামকে প্রতিরোধ করা যায়, কিভাবে তৌরাত-ইনজিল থেকে ইসলামের নিদর্শনগুলি মুছে ফেলা যায় বা তার অপব্যাখ্যা করা যায়। এর মাঝেও অল্প কিছু সংখ্যক ইহুদী এবং অনেক খৃষ্টান ছিল যারা সকল বাধা অতিক্রম করে ইসলাম গ্রহন করেছে। মহান আল্লাহ এই দলকে বিশেষভাবে প্রশংসা করেছেন এবং তাদের জন্য বিশেষ পুরুষ্কারের ঘোষনা দিয়েছেন। সাধারন আহলী কিতাবীদের মধ্যে থেকে আল্লাহ এই দলকে আলাদা করে দিয়েছেন এই আয়াত দ্বারা। এরা আগের কিতাবের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতো। পরে যখন এই কিতাব নাজিল হয়, তখন এর উপরও তারা ইমান এনেছে। নিজেদের পার্থিব লাভের জন্য তারা আগের কিতাবের অপব্যখ্যা করেনি। ফলে অতি সহজেই তারা ইসলামকে গ্রহন করার সৌভাগ্য পেয়েছে। কোরআন ও হাদিসে তাদের দ্বিগুন সওয়াব লাভের কথা বলা হয়েছে। কারন তারা আগের কেতাবে দৃঢ় ছিল এবং বর্ত্তমান কেতাবেও তারা সমান ভাবে দৃঢ়। রাসুলের সময় এই দলে হাতে গোনা কয়েকজন ইহুদী ছিলেন (১০ জন)। কিন্তু খৃষ্টানদের সংখ্যা বেশী ছিল। বর্ত্তমান যুগেও একই ধারা অব্যাহত রয়েছে। অনেক খৃষ্টান প্রতিদিন মুসলমান হচ্ছে। কিন্তু এই দলে ইহুদী নাই বললেই চলে। আল্লাহর গজবপ্রাপ্ত জাতী ইহুদী। এই গজব থেকে বেরিয়ে আসার সৌভাগ্য খুব কম ইহুদীর হয়। আল্লাহ সবাইকে হেদায়াত দিন।

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং যা কিছু আপনার উপর অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর উপর, আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত থাকে এবং আল্লার আয়াতসমুহকে স্বল্পমুল্যের বিনিময়ে সওদা করে না, তারাই হলো সে লোক যাদের জন্য পুরুস্কার রয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহনকারী। (৩:১৯৯)

সূরাহ আন-নিসা

১৮৭ .

সুরাহর নাম আন-নিসা, অর্থাৎ নারী জাতী। আল্লাহ নারী জাতীকে সৃষ্টি করেছেন আদমের বংশধারাকে এই পৃথিবীতে বিস্তার করে দেবার জন্য। আর এই বংশ বিস্তারের কারনে যে সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে সেগুলি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে এই সুরাতে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'লা পরিস্কার ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তিনি একজন ব্যক্তি থেকে আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। আর সেই ব্যক্তি হলেন আদম আঃ। কিভাবে আল্লাহ আদম আঃ কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন সে আলোচনা আমরা অনেকবার করেছি। আল্লাহ প্রথমে আদম আঃ এর DNA সৃষ্টি করেন। সেটাকে পৃথিবীর মাটির নীচে স্থাপন করা হয় প্রস্ফুটিত হবার জন্য, যেভাবে আমরা শস্য বীজকে মাটির নীচে বপন করি। মাটিই আদম আঃ এর গর্ভাশয় ছিল। আদমের দেহ সুগঠিত হলে আল্লাহ তাকে বের করে এনে জান্নাতে বাস করতে দেন। এর পরে আদম আঃ থেকেই তার সঙ্গিনী আমাদের আদি মাতা হাওয়া আঃ কে সৃষ্টি করেন মহা কুশলী আল্লাহ সুবহানু তা'লা। কিভাবে আদমের দেহ থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হোল, এ নিয়ে হাদিসে বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এখানে আমরা সেগুলি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। আদম আঃ পুরুষ ছিলেন। তার দেহ থেকে কোন টিস্যু বা হাড় নিয়ে ক্লোন (Clone) করলে আদমের মত আর একজন পুরুষের সৃষ্টি হবে। কিন্তু ক্লোন করার আগে যদি একটু Genetic Engineering করা যায়, তবে সেখান থেকে নারী দেহ পাওয়া যেতে পারে। আমরা জানি, **ক্রোমোজোম** হচ্ছে বংশগতির প্রধান উপাদান। মানুষের দেহে ২৩ জোড়া **ক্রোমোজোম থাকে। পুরুষের ক্রোমোজোম** হচ্ছে XY ধরনের এবং নারীর **ক্রোমোজোম** XX ধরনের। সুতরাং পুরুষের টিস্যু থেকে যদি Y ছেটে ফেলে শুধু X নেওয়া হয় তবে ক্লোনের পরে এক নারী দেহ পাওয়া যেতে পারে যার দেহে শুধু XX **ক্রোমোজোম** থাকবে। তবে মহান আল্লাহই জানেন কিভাবে তিনি এক পুরুষ দেহ থেকে নারী দেহ সৃষ্টি করেছেন। তবে উপরে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, Theoretically it is very much possible. নারী দেহ গঠনের প্রধান এক উদ্দেশ্য ছিল, মানব জাতীর জন্য এক গর্ভাশয়ের সৃষ্টি করা। তা না হলে আমাদের আবার মাটির নীচে যেতে হতো গর্ভাশয়ের খোজে। এই আয়াতটিতে আল্লাহ আমাদের স্মরন করিয়ে দিয়েছেন সেই মাতৃগর্ভকে যেখান থেকে আমরা এসেছি। তিনি আমাদের আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, মাতৃগর্ভের মাধ্যমে অন্যান্য যেসব মানুষের সাথে আমরা সম্পর্ক-যুক্ত তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য। তাদের সাথে কখনই সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। হাদিসেও রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারীর প্রতি তিরস্কার ও হুশিয়ারি এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًاوَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্ঞা করে থাক এবং আত্নীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (৪:১)

১৮৮
ইসলামে বহু বিবাহের প্রচলন নিয়ে অমুসলীমদের মধ্যে যথেষ্ট সমালোচনার প্রবনতা দেখা যায়। কিন্তু তারা কী দেখে না যে, সকল ধর্মেই বহু বিবাহের প্রথা রয়েছে। শুধু তাই নয় - হিন্দু, খৃস্টান, ইহুদী এবং বৌদ্ধ ধর্মে বিবাহের ক্ষেত্রে সংখ্যার কোন সীমাবদ্ধতা নেই। তারা যে কোন সংখ্যায় স্ত্রী রাখতে পারে। বাইবেলের বর্ননানুযায়ী তাদের কারো কারো ১০০-এরও বেশী স্ত্রী ছিল। হিন্দু ধর্মে শুধু বহু স্ত্রী নহে, একই সাথে বহু স্বামী রাখার ঘটনাও রয়েছে। সেক্ষেত্রে ইসলাম ঐ স্ত্রীর সংখ্যাকে ৪ এ নামিয়ে এনেছে - তাও আবার শর্ত সাপেক্ষে। নীচের আয়াতে স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায় যে এই আয়াত বিয়ের জন্য নাজিল হয়নি, নাজিল হয়েছে যুদ্ধে শহীদদের এতিম সন্তানদের সমস্যা সমাধানের জন্য। মুলতঃ সেই সব মহিলাদের বিয়ে করতে বলা হয়েছে যাদের কাছে এতীম সন্তানাদি আছে। অহুদ যুদ্ধের পর রাসুল এমন দুজন মহিলাকে বিয়ে করেন যাদের স্বামী যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তাদের পরিবারের ভার নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার জন্যই ছিল এই বিয়ে। এই ভাবেই স্ত্রীর সংখ্যা সর্বাধিক ৪ হতে পারে। তবে যদি স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ বজায় রাখা সম্ভব না হয় তবে এক স্ত্রীই যথেষ্ট। এটিই পবিত্র কোরআনের নির্দেশনা:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْخِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ

আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাথভাবে পুরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাললাগে তাদের বিয়ে করে নাও -দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে ,একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।(৪:৩)

১৮৯
এর আগের আয়াতে আল্লাহ ঐ সব মহিলাদের বিয়ে করতে বলেছেন যাদের এতিম সন্তানাদি রয়েছে। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষের মনে একটা ধারনা ছিল যে যেহেতু ঐ সব মহিলারা অসহায়, তাই তাদের কম মোহর দিলেও চলবে। নীচের আয়াতে এ ব্যাপারে আল্লাহ হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। তাদেরকে সন্তুষ্ট চিত্তে উপযুক্ত মোহর দিয়ে দিতে হবে। তবে ঐ মহিলা যদি মোহরের কিছু অংশ মাফ করে দেয় তবে তা গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু কোন ভাবেই অসহায় বলে মোহরে কমতি করা যাবে না। বিয়ের পর ঐ মহিলার এতিম সন্তানাদি তাদের সম্পদ সহ নতুন স্বামীর তত্ত্বাবধানে চলে আসে। এই এতীমদের সম্পদ কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে তার বিস্তৃত বর্ণনা পরের আয়াতগুলিতে এসেছে।

وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর। (৪ঃ৪)

১৯০
নীচের আয়াতে বিস্তৃত ভাবে এসেছে কিভাবে এতিম সন্তানদের সম্পদের রক্ষনাবেক্ষন করতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি এই সম্পদ সম্পূর্ণ আলাদা রেখে হেফাজত করা হয়। নিজেদের সম্পদের সাথে না মিশানই উত্তম। ভাল মালের সাথে খারাপ মাল বদলিয়ে নেওয়া যাবে না। বিত্তহীন যারা তারা হয়তো রক্ষনাবেক্ষনের বেতন হিসাবে সংগত পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বিত্তবানদের এ থেকে বিরত থাকায় উচিৎ। যখন এতিমেরা সাবালক হয়ে বিয়ের বয়সে উপনীত হয়, তখন তাদের সম্পদ তাদেরকে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হবে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীর সামনে। মনে রাখতে হবে, এতিমের মাল কোনভাবেই আত্মসাৎ করা যাবে না। যারা ইয়াতীমদের ধন সম্পত্তি অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা এই সুরার ১০ নম্বর আয়াতে সাবধান বাণী জারী করেছেন। ইয়াতীমদের প্রাপ্য সম্পত্তি আত্মসাত করা দোজখের আগুন গলধঃকরণ করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا

আর এতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ আঁচ করতে পার, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পন করতে পার। এতীমের মাল প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করো না বা তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যারা স্বচ্ছল তারা অবশ্যই এতীমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যে অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ খেতে পারে। যখন তাদের হাতে তাদের সম্পদ প্রত্যার্পণ কর, তখন সাক্ষী রাখবে। অবশ্য আল্লাহই হিসাব নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট। (৪:৬)

১৯১
সম্পদ বন্ঠনের সময় উত্তরাধিকারের বাইরেও কাকে কাকে সম্পদের কিছু কিছু দেওয়া যেতে পারে, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে নীচের দুই আয়াতে। দুইটি আয়াতেই এতিমদের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই এতিমরা যদি মৃত ব্যক্তির নাতি নাতনী হয়, তবে তারা আরো বেশী বেশী সাহায্য পাবার অধিকারী। কারো বাবা যদি দাদা জীবিত থাকা অবস্থায় মারা যায়, তবে মিরাসের আয়াত অনুসারে সেই সব নাতীরা দাদার সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় না। সেই ক্ষেত্রে দাদার উচিৎ এতিম নাতীদের জন্য আগে থেকেই প্রয়োজন অনুসারে অসিয়ত করে যাওয়া। তবে এর পরিমাণ মোট সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশী হবে না। এতিম নাতীরা যদি আগে থেকেই তাদের বাবার সম্পদে বিত্তবান হয়ে থাকে, তবে এই অসিয়তের আর প্রয়োজন থাকে না। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ মুসলিম পারিবারীক আইনে এটা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে যে এতিম নাতীরাও দাদার সম্পদের সমান অংশ পাবে যতটুকু বাবা জীবিত থাকলে পেতো। এই আইন অসিয়তের ঝামেলা থেকে দাদাকে মুক্তি দিয়েছে। আল্লাহ আমাদের ন্যায় বন্ঠনের তৌফিক দান করুন।

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا

সম্পতি বন্টনের সময় যখন আত্নীয়-স্বজন, এতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু রিজিক দাও এবং তাদের সাথে কিছু সদালাপ করো। তাদের ভয় করা উচিত, তারা যদি নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল অক্ষম সন্তান-সন্ততি ছেড়ে যেত, তারাও তাদের জন্যে উদ্বিগ্ন থাকতো। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে। (৪ঃ৮-৯)

১৯২

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি কিভাবে বন্ঠন করা হবে তার বিস্তারিত নিয়মাবলী সূরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াতে প্রদত্ত হয়েছে। এই বিষয়ের উপর অনেক আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছে, বহু বই লেখা হয়েছে, পরিশেষে এটা ইসলামিক আইনে পরিণত হয়েছে। তাই এই বন্ঠন নীতির উপরে আমরা এখানে কোন আলোচনা করতে চাই না। আমরা শুধু এটা বলতে চাই যে, এটা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রেখা। এটা কখনই ভাঙ্গা যাবে না। নিজেদের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অনেক শিক্ষিত মানুষও এই বন্ঠন নীতিকে এড়িয়ে যাবার বিভিন্ন ছুতা খুঁজতে থাকে। মেয়েদের বঞ্চিত করার জন্য ছেলেদের নামে সম্পত্তি লিখে দেয়, অধিকতর প্রিয় সন্তানকে বেশী দেয়, শুধু মেয়ে থাকলে তাকে লিখে দেয় চাচাদের বঞ্চিত করার জন্য, ইত্যাকার নানাবিধ পন্থা তারা উদ্ভাবন করে। এগুলি করা হারাম হারাম হারাম। যেখানে আল্লাহ নিজ হাতে বন্ঠন ব্যবস্থা তুলে নিয়েছেন, সেখানে আমরা নাক গলাতে যাব কেন? নীচের দুই আয়াতে আল্লাহ সেই হুশিয়ারিই উচ্চারণ করেছেন। এই উত্তরাধিকার আইন (বন্টননীতি) মেনে চললে আল্লাহ অবশ্যই তাকে পুরস্কৃত করবেন, জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। কিন্তু যদি কেউ এ আইন অমান্য করে, যদি সম্পদ ইচ্ছামত বন্টন করে, বা বিশেষ কোন ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করে, বা কোন ছল চাতুরীর আশ্রয় নেয়, তাহলে তাকে অবশ্যই দোজখে প্রবেশ করানো হবে। সাবধান!! পার্থিব লাভের জন্য আখিরাতকে ধ্বংস করবেন না। বন্ঠন নীতি ঘোষণা করার পর পরবর্তী দুই আয়াতে আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেনঃ

تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ
وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাত সমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য। যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।।(৪:১৩-১৪)

১৯৩

শরীয়তের বিস্তৃত খুটিনাটি লিখিত আকারে প্রথমে তৌরাতে নাজিল হয়। সেগুলির অধিকাংশই Modify করে ইসলামে গ্রহণ করা হয়েছে। তৌরাতে ব্যভিচারের সর্বোচ্চ শাস্তি পাথর মেরে হত্যা করা। একে আমরা রজম বলি। তবে স্থান ও পরিবেশের কারনে এর চেয়েও লঘু দন্ড দেওয়া যায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ব্যাভিচারের শাস্তি ছিল পাথর মেরে হত্যা অর্থাৎ রজম করা। রজমের আয়াৎও নাজিল হয়েছিল বলে এক হাদিসে উমার রাঃ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে কোরআন থেকে আল্লাহ সেই আয়াৎ তুলে নেন। পরিবর্তে প্রাথমিক ভাবে সুরাহ নিসার ১৫ ও ১৬ নম্বর আয়াত নাজিল হয়

যেখানে আল্লাহ বলেছেন- " আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চার জন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন। তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। অতঃপর যদি উভয়ে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, দয়ালু।" এ দুটি আয়াতে যা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয় তা হচ্ছে, ব্যভিচার প্রমান করতে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হবে, নারী পুরুষ দুজনকেই শাস্তি দিতে হবে, নারীকে ঘরে আবদ্ধ রাখতে হবে আমৃত্যু, অর্থাৎ যাবজ্জীবন কারাদন্ড। তবে তারা যদি তওবা করে ফিরে আসে, তাদের শাস্তি মাফ করা যেতে পারে। অবশ্য আল্লাহ এটাও বলেছেন যে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এই বিধান চলবে। সুরাহ নিসা নাজিল হয়েছে চতুর্থ হিজরিতে। এর পরে সুরাহ নুর নাজিল হয় ষষ্ট হিজরির শেষের দিকে। সুরাহ নুরের দ্বিতীয় আয়াতেই আল্লাহ কঠোর ভাবে ঘোষনা দিলেন- ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত কর।

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চার জন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন। তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। অতঃপর যদি উভয়ে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, দয়ালু। (৪ঃ১৫-১৬)

১৯৪

আল্লাহর নিকট তওবা কখন কবুল হবে? যখন আমরা ভুল করে কোন অন্যায় করে ফেলি এবং এরপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে আমরা অতিসত্ত্বর অনুতপ্ত হই এবং ক্ষমা চাই- তাহলে আল্লাহ তা'লা তা ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যদি আমরা মৃত্যুর পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত একই ভুল বার বার উদ্ধত ভাবে করতে থাকি এবং শেষ মুহুর্তে এসে তওবা পড়ে ক্ষমা চাই- তাহলে তা গৃহীত হবে কী? না, তা হবেনা। আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেনঃ

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَـئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْوَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَيَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভূলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা, পরমজ্ঞানী। আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে,

এমন কি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকেঃ আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৪:১৭-১৮)

১৯৫
জোর পূর্বক বিবাহ দেয়া/করার বিধান ইসলামে নেই। সাধারনতঃ সম্পত্তির উত্তরাধিকার হওয়ার লোভে এটি করা হয়। পরিবারের কোন পুরুষ মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রীকে পরিবারের অন্য কারোর সাথে বিয়ে দেওয়া হয় সম্পত্তি রক্ষার খাতিরে। কিন্তু ঐ কন্যা যদি বিয়েতে সম্মত না থাকে তবে তার উপর বল প্রয়োগ করা যাবে না। সে যদি অন্য কোথাও বিয়ে করতে চায়, তাতেও বাধা দেওয়া যাবে না, তাকে আটকে রাখা যাবে না। এই সুরার পরবর্তী দুটি আয়াতে বলা হয়েছে, স্ত্রীকে যদি বিপুল পরিমাণ ধন সম্পদও দান করা হয়, তবে তাকে পরিত্যাগের সময় সেই সম্পদের বিন্দু মাত্রও ফেরত নেওয়া যাবে না। আবার স্ত্রীকে অযথা পরিত্যাগও করা যাবে না। আমরা আমাদের স্ত্রীদেরকে শুধুমাত্র তার অনৈতিক কার্যকলাপের কারনেই পরিত্যাগ করতে পারি। অন্যান্য দোষ বা পরিস্থিতিতে তাদের সাথে সহৃদয়তার সাথে বাস করতে হবে। কারণ আমরা তার কোন একটি বিষয় হয়তো অপছন্দ করি, কিন্তু আল্লাহ তা'লা হয়তো তার মধ্যে আমাদের জন্য বড় কোন কল্যাণ বা উপকার নিহিত রেখেছেন। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّإِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًاوَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

হে ঈমাণদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহন করা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে আটক রেখো না যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও; কিন্তু তারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে! নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ, অনেক কল্যাণ রেখেছেন। (৪:১৯)

১৯৬
নীচের আয়াতে দুটি গুরুতর পাপের কথা বলা হয়েছে। তার একটি হচ্ছে অন্যায়ভাবে অপরের মাল ভক্ষন করা এবং অপরটি নরহত্যা বা আত্মহত্যা। প্রথমটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা হতে পারে। কিছু কিছু অন্যায় তো চাক্ষুস দেখা যায়। যেমন অন্যায়ভাবে জাল দলিল করে কারো জমি-জমা বা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল, ঠকবাজী বা ছলচাতুরী করে কারো অর্থ আত্মসাৎ করা, ব্যবসার নামে ধোকাবাজী করে টাকা আদায়, ভুলিয়ে-ভালিয়ে পিতা-মাতাকে দিয়ে সম্পত্তি নিজের নামে করে নেওয়া, ইত্যাকার অনেক অন্যায় আছে যেগুলি অহরহ আমরা চাক্ষুস দেখতে পায়। এ ছাড়াও আরো অনেক গুপ্ত পন্থা রয়েছে যা দিয়ে মানুষ অন্যায়ভাবে মানুষকে ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন করে। যেমন খাদ্যে বা ঔষধে ভেজাল দেওয়া, মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়ে অর্থ নেওয়া, অন্যায় বা নিষিদ্ধ বা নেশা জাতীয় মালামালের ব্যবসা করা, এমনকি বৈদেশিক বাণিজ্যে Over Invoice বা Under Invoice করে টাকা আত্মসাৎ করাও এর মধ্যে পড়ে। আজকাল আর এক জঘন্য পন্থার উদ্ভব হয়েছে, যাতে মানুষেরা কোটী কোটী টাকা ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে তা আত্মসাৎ করে। সেই টাকায় বিদেশে Second Home এর ব্যবস্থা করে। আস্তে আস্তে দেশের ব্যবসা গুটিয়ে বিদেশে পাড়ী জমায়। এ সবই হচ্ছে অন্যায় ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষন করা। দ্বিতীয় গুরুতর পাপটি হলো নিজেদের হত্যা করা।

নিজেদের হত্যা করতে বোঝায় অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা অথবা নিজেই আত্মহত্যা করা। আজকাল বিনা বিচারে Cross fire এর নামে প্রতিদিন মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, শরীয়তের দৃষ্টিতে এটাও এক প্রকার নরহত্যা। আর নরহত্যা মহা পাপ। আল্লাহ বলেন, এই দুই ধরনের পাপ যারা করবে, নিশ্চিতভাবেই তারা আল্লাহর দেওয়া সীমা লংঘন করেছে এবং আল্লাহ তাদের আগুনে দগ্ধ করবেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। আর যে কেউ সীমালঙঘন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য। (৪:২৯-৩০)

১৯৭
আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এক মহা সুসংবাদ !! বড় বড় পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে, তাহলে আল্লাহ তা'লা আমাদের ছোট ছোট পাপ রাশি ক্ষমা করে দেবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করার অধিকার দেবেন। এখন আমাদের জানতে হবে, বড় বড় পাপ কোন গুলি? সাধারণতঃ বড় পাপ গুলিকে গোনাহে কবিরাহ বলা হয়। এর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। কোরআনে যে কাজ করতে আল্লাহ সরাসরি নিষেধ করেছেন, সেগুলি করাই কবিরাহ গোনাহ। এর মধ্যে প্রধান হলো শিরক করা এবং পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহার না করা, মিথ্যা বলা, ইত্যাদী। এর আগের আয়াতে দুটি বড় পাপের আলোচনা করা হয়েছে, অন্যায় ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা ও নরহত্যা। এখন আমাদের উচিৎ আল্লাহর দেওয়া এই সুযোগটি আমাদের গ্রহণ করতে হবে, কবিরাহ গোনাহ পরিত্যাগ করতে হবে। তবেই না আল্লাহ আমাদের ছোট ছোট পাপগুলি মুছে দেবেন।

إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا

যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সেসব বড় গোনাহ গুলো থেকে বেঁচে থাকতে পার, তবে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেব এবং সম্মান জনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাব।।(৪:৩১)

১৯৮
আমাদের প্রত্যেককেই কিছু না কিছু বিশেষত্ব দান করা হয়েছে। যেমন পুরুষের কিছু বিশেষত্ব আছে যা মহিলাদের নেই। আবার মহিলাদের যা বিশেষত্ব আছে তা পুরুষদের নেই। এমন কী পুরুষ বা মহিলাদের মধ্যেও একজনকে অপর জনের তুলনায় বিশেষ গুনাবলী দিয়ে ভূষিত করা হয়েছে। সে কারনেই সকলেই কবি হতে পারেন না, নেতাও হতে পারেন না, আবার বিজ্ঞানীও হতে পারেন না। তবে কারো বিশেষ কোন গুন বা দক্ষতার জন্য তাকে ইর্ষা করা যাবে না । কেননা এ গুন সমুহ আল্লাহ তা'লাই তাকে দিয়েছেন। আমাদের যা দেওয়া হয়েছে তার প্রেক্ষিতেই আমাদের বিচার করা হবে। আল্লাহ তা'লা বলেনঃ

وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّااكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না এমন সব বিষয়ে যাতে আল্লাহ তাআলা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ। আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত। (৪ঃ৩২)

১৯৯ .
ছোট বা বড় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই একজন প্রধান ব্যক্তি থাকেন। আল্লাহ তালা পুরুষকে তার গৃহের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। এর পশ্চাতে অনেক যুক্তি থাকতে পারে, যা আল্লাহ তালা অবশ্যই ভালো জানেন। তবে আল্লাহ পুরুষদের অনেক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং তাদেরকে পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জনের দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে। ঐ পরিবারের সবাইকে উক্ত প্রধান ব্যক্তির অনুগত থাকতে হয় এবং সকল কাজে তাকে সহায়তা করতে হয়। এভাবেই একটি পরিবার সুখী পরিবার হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। ইসলাম কখনোই চায় না যে একটি পরিবার ভেঙ্গে যাক, চায় না কোন স্ত্রীকে তালাক দেয়া হোক, বা সন্তানেরা তাদের বাবা মা থেকে পৃথক হয়ে যাক। বরং পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলামে সব ধরনের ব্যবস্থাই বিদ্যমান। স্বামী যদি স্ত্রীর অবাধ্যতার আশংকা করে, তবে স্ত্রীকে উপদেশ দিতে থাকবে। প্রয়োজন হলে স্ত্রীর বিছানা আলাদা করে দিবে। এতেও কাজ না হলে স্বামী স্ত্রীর ক্ষয়ে যাওয়া সম্পর্ককে মেরামত করার জন্য স্বামী এবং স্ত্রীর উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজনের একজন করে মধ্যস্থতাকারীকে আহ্বান জানাতে হবে যাতে তারা উভয়ের মধ্যে আপোষ মিমাংসার ব্যবস্থা করতে পারেন। আশা করা যায় যে এতে করে একটা পরিবার ধ্বংস হবার হাত থেকে রক্ষা পাবে। আসলে তালাক হলো শেষ পদক্ষেপ। তালাক দেওয়ার আগেই উপরের পদক্ষেপ গুলি নিতে হবে। মহান আল্লাহ তালা এরশাদ করেনঃ

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْفَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّوَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّاكَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُبَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং (মৃদু) প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।
যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত। (৪:৩৪-৩৫)

২০০
কাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে হবে, সাহায্য করতে হবে, যত্ন নিতে হবে, বিনীত আচরন করতে হবে, এর একটা তালিকা ইসলাম দিয়েছে। এ তালিকায় রয়েছে মা-বাবা, আত্মীয় স্বজন, এতীম, অভাবী,

নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, কাজের সঙ্গী সাথীগন , মুসাফির এবং দাস দাসীগণ। তালিকার প্রথমেই রয়েছে পিতা-মাতা এবং শেষে দাস দাসী, অন্য কথায় কাজের মেয়েরা। কিন্তু দেখা যায়, এই দুই সম্প্রদায়ের প্রতিই আমাদের যত অবহেলা। পিতা মাতা জীবিত থাকা অবস্থায় আমরা তাদের খেয়াল রাখি না, ইদের দিনেও গ্রামে যেয়ে তাদের সাথে দেখা করার সময় করে উঠতে পারি না। অথচ পিতা মাতা মারা গেলে আমরা অতি তৎপর হয়ে উঠি, প্রতি বছর বাড়ীতে দোয়ার মাহফিল হয়, গ্রামে ধন্য ধন্য পড়ে যায়। আর কাজের মেয়েদের কথা নাই বা বললাম। আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত হয় এই কাজের মেয়েরা। মিডিয়াতে তাদের কথা অহরহ আসছে। অথচ মৃত্যুর সময় রাসুলের শেষ বানী ছিল, নামাজ ও দাস দাসীদের খেয়াল রেখ। এই আয়াতের প্রথমেই আল্লাহ তার এবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেই একই আয়াতে এই তালিকাটির উল্লেখ করেছেন। এতে প্রমানিত হয় যে বর্ণিত ব্যক্তিদের সাথে আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবহার করাও ইবাদতের সামিল।

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّمَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا

আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্নীয়, এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে।।(৪:৩৬)

২০১

কৃপণতাকে ইসলাম খুবই অপছন্দ করে । যারা কৃপণ তারা সাধারণতঃ নিজেদের সম্পদকে গোপন রাখতে চায়। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ , কোন দয়া অথবা অনুগ্রহ যা আল্লাহর তরফ থেকে প্রদান করা হয়, তা গোপন করা যাবে না। বরং তা প্রকাশ করে দিতে হবে এবং তা থেকে ব্যয়ও করতে হবে। আল্লাহ তালা একজন কৃপণকে কখনোই ভালো বাসেন না। মুসা আঃ এর সময় সবচেয়ে বড় কৃপণ ছিল কারুন। তাকে তার সম্পদ সহ কিভাবে আল্লাহ মাটিতে দাবিয়ে দিয়েছেন তার বর্ণনা কোরআনে এসেছে। কৃপনের জন্য অবশ্যই আল্লাহর শাস্তি রয়েছে। অন্যদিকে সম্পদ ব্যয় করতে হলে আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমরা কী আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করছি, না লোকদেরকে প্রদর্শনের জন্য ব্যয় করছি? আমরা যদি লোক দেখানোর জন্য দান করি তাহলে শয়তান আমাদের সাথে এসে যোগ দেয় এবং আমাদের বন্ধু হয়ে যায়। আর শয়তান যদি আমাদের বন্ধু হয় তাহলে আমাদের ভাগ্যে কী ঘটবে তা সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ তালা এরশাদ করেনঃ

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًامُّهِينًا
وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَـاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًافَسَاء قَرِينًا

যারা নিজেরাও কার্পন্য করে এবং অন্যকেও কৃপণতা শিক্ষা দেয় আর গোপন করে সে সব বিষয় যা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দান করেছেন স্বীয় অনুগ্রহে-বস্তুতঃ তৈরী করে রেখেছি কাফেরদের জন্য অপমান জনক আযাব।
আর সে সমস্ত লোক যারা ব্যয় করে স্বীয় ধন-সম্পদ লোক-দেখানোর উদ্দেশে এবং যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে না, ঈমান আনে না কেয়ামত দিবসের প্রতি এবং শয়তান যার সাথী হয় সে হল নিকৃষ্টতর সাথী। (৪:৩৭-৩৮)

২০২

ইসলাম আসার পূর্বে আল্লাহ প্রতিটি গোত্রের জন্য আলাদা আলাদা নবী পাঠাতেন। তারা আল্লাহর বানী ও নির্দেশনা তাদের গোত্রের মাঝে প্রচার করতেন। আমরা ইহুদীদের সম্বন্ধে জানি, তাদের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে নবীরা আসতেন। এমন কোন সময় যায়নি যখন তাদের মধ্যে কোন নবী ছিলেন না। অন্যান্য গোত্রের মধ্যেও প্রয়োজনুসারে নবীরা এসেছেন। হাসরের দিনে এই সব নবীদের জিজ্ঞেস করা হবে। নবীরা এক বাক্যে সাক্ষ্য দিবেন যে তারা আল্লাহর বানী যথাযথভাবে গোত্রের লোকের মাঝে প্রচার করেছেন। নবীর সহচর যারা ছিলেন তারাও সাক্ষ্য দিবেন, তারা আল্লাহর বানী যথাযথ ভাবে পেয়েছেন। এর পরেই আমাদের রাসুলের পালা আসবে। তিনি ছিলেন বিশ্ব নবী। তিনি সাক্ষ্য দিবেন যে আল্লাহর বানী তিনি সমস্ত বিশ্ব মানবতার মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সমস্ত আরবকে তিনি শিরকমুক্ত করেছেন, ইসলামের দাওয়াত পাঠিয়েছেন বিভিন্ন রাজাদের কাছে। সাহাবীদের নির্দেশ দিয়েছেন পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের আলো পৌছানোর জন্য। বিদায় হজে আরাফার মধ্যে লক্ষ সাহাবী ধ্বনী তুলেছেন যে নিশ্চিতভাবে রাসুল জনগনের মাঝে আল্লাহর বানী পৌছে দিয়েছেন। তাই আজ পৃথিবীর এমন কোন স্থান নাই যেখানে ইসলামের বানী পৌছে নাই। এমন কোন জনগোষ্টী নাই যারা ইসলামের কথা শোনে নাই, যারা ইসলামের নবীর কথা জানে না। তাই বিশ্বের কেউ এই ছুতা দিতে পারবে না যে সে ইসলাম সম্বন্ধে কখনো কিছু শুনে নাই। তাহলে সত্য গ্রহন করাতে কি বাধা ছিল, এই প্রশ্নের কোন উত্তর তাদের কাছে থাকবে না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সত্য গ্রহনের তওফিক দান করুন।

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيدًا

আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী (নবী) এবং আপনাকে ডাকব তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে। (৪:৪১)

২০৩

দুই অবস্থায় নামাজের কাছে যেতে নিষেধ করা হয়েছে, নেশার অবস্থায় এবং অপবিত্র অবস্থায়। এই আয়াত যখন নাজিল হয় তখন মদ খাওয়া সম্পুর্ন ভাবে হারাম করা হয় নি। এটা মদের ব্যাপারে দ্বিতীয় আয়াত যেখানে মদ খাওয়াকে সীমিত করে দেওয়া হয়েছে। পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে মদকে সম্পুর্নভাবে নিষেধ করা হয়। অপবিত্র বা নাপাক অবস্থাতেও নামাজ পড়া যাবে না। সাধারণতঃ পবিত্র হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে পানি ব্যবহার করা। কিন্তু যদি পানি না পাওয়া যায়, অথবা যদি কেউ অসুস্থ থাকে অথবা সফরে থাকে, তবে পানির পরিবর্ত্তে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়ম্মুম করা যাবে। পানির পরিবর্ত্তে যে মাটি ব্যবহার করা যাবে এটা আল্লাহর এক বিশেষ রহমত। তায়াম্মুমের কথা সুরা মায়েদার ৬নং আয়াতেও আছে। মায়েদার ৩নং আয়াতে আল্লাহ তার রহমতকে পরিপুর্ন করার যে ওয়াদা দিয়েছেন, তার একটি হলো পানির পরিবর্ত্তে মাটি ব্যবহার করে পবিত্র হওয়া। পৃথিবীর অন্য কোন জাতিকে এই ছাড় দেওয়া হয় নি। অপার করুনাময় ক্ষমাশীল মহান আল্লাহ আমাদেরকে আরও রহমতে ভরপুর করুন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

হে ঈমাণদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর (নামাযের কাছে যেও না) ফরয গোসলের আবস্থায়ও

যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও-তাতে মুখমন্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল। (৪:৪৩)

২০৪

ইহুদীদের ধৃষ্টতা ও উদ্ধত্যের আরো এক নিদর্শন নীচের আয়াতে বর্নিত হয়েছে। কোরআনে একটা আয়াত নাজিল হয়েছে, কিন্তু ইমানদারেরা হয়তো সেই আয়াতটি বুঝতে পারছে না, তখন তারা বলে, "আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম"। ইহুদীরা এটাকে বিকৃত করে মুসলমানদের ক্ষেপানোর জন্য বলতো, "আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম"। রাইনা শব্দকেও তারা জিহবা কুঞ্চিত করে এমনভাবে বলতো যার অর্থ দাড়াতো নির্বোধ। সালাম দেওয়ার সময়ও তারা বিকৃত করে এমনভাবে বলতো যার অর্থ দাড়ায়-"আপনার মৃত্যু হোক"। আসলে ইহুদীদের জন্য এগুলি নতুন কিছু না। মুসা আঃ এর জীবিত থাকা অবস্থায়ও তারা এরকম ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়েছে। মুসা আঃ বললেন, তোমরা যুদ্ধ করতে করতে এই শহরে প্রবেশ করো। তারা বললো, আমরা এখানে বসলাম, আপনি ও আপনার আল্লাহ যেয়ে যুদ্ধ করুন। মুসা আঃ বললেন, এই শহরের গেট দিয়ে ঢোকার সময় মাথা নত করে বিনত ভাবে ঢুকবে। তারা মাথা উচু করে উদ্ধতভাবে প্রথমে পা দিয়ে ঢুকলো। মুসা আঃ বললেন, আসতাগফিরুল্লাহ বলতে বলতে শহরে ঢুকো। তারা বলতে লাগলো, "গম দাও, রুটি দাও" (২ঃ৫৯)। এ রকম বহু ঘটনা রয়েছে ইহুদীদের ইতিহাসে। দাম্ভিক, অহংকার ও উদ্ধ্যত এক জাতি এই ইহুদীগন। তাদের ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে মুসা আঃ শেষ জীবনে তাদেরকে ইউসার হাতে সপে দিয়ে নিজে তুর পাহাড়ের দিকে নির্বাসনে চলে যান। এই হলো ইহুদিদের কাহিনী। অন্যদিকে মুসলমানদের অবস্থা দেখুন। মক্কা বিজয়ের দিনে ১০ হাজার মুসলিম সেনা মক্কা প্রবেশের সময় তাদের মাথাকে এত নত করে দিয়েছিলেন যে ঘোড়ার পিঠের সাথে তারা মিশে গিয়েছিলেন।

مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً

কোন কোন ইহুদী তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুড়িয়ে নেয় এবং বলে, আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করছি। তারা আরো বলে, শোন, না শোনার মত। মুখ বাঁকিয়ে দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশে বলে, রায়েনা' (আমাদের রাখাল)। অথচ যদি তারা বলত যে, আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি এবং (যদি বলত,) শোন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তবে তাই ছিল তাদের জন্য উত্তম আর সেটাই ছিল যথার্থ ও সঠিক। কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন তাদের কুফরীর দরুন। অতএব, তারা ঈমান আনছে না, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক ছাড়া। (৪:৪৬)

২০৫

শিরক!! এটি এমন একটি পাপ যা কখনই আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। অপরাপর পাপরাশির ক্ষমা পাওয়া যেতে পারে, কিছু পাপ দোজখে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত আযাব হওয়ার পর মাফ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু শিরক এর পাপ কখনো ক্ষমা করা হবে না। সুরাহ লোকমানের ১৩ নম্বর আয়াতেও আল্লাহ বলেছেন, শিরক হল সবচেয়ে বড় অন্যায়। শিরকের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। সবচেয়ে বড় শিরক

হলো মূর্তিপূজা করা এবং কাউকে সরাসরি আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। যারা ইসা আঃ কে আল্লাহ মনে করে অথবা তিন খোদার এক খোদা বলে মানে, নিশ্চিত ভাবেই তারা মহা শিরকে লিপ্ত আছে এবং তারা কাফের (সুরাহ মায়েদাহ - ৫ঃ৭২-৭৩)। আমরা মুসলিমরা নিজের অজান্তেই অনেক সময় ছোট খাট শিরকে জড়িয়ে পড়ি। এগুলিকে চিহ্নিত করে সযত্নে এড়িয়ে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًاعَظِيمًا

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে এক মহা পাপ করল। (৪:৪৮)

২০৬

এমন একটি পরিস্থিতির কথা কল্পনা করুন, যেখানে ভূ-পৃষ্ঠে বায়ূ সরবরাহের মালিক আপনাকে বানানো হয়েছে - এবং আপনি তা নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা রাখেন। নি:শ্বাস গ্রহনের জন্য ঐ বায়ু কি আপনি বিনা পয়সায় আমাদের দেবেন? আমি নিশ্চিত, আপনি তা দেবেন না। আপনি আমাদের নাকের উপর বড় একটি মিটার বসিয়ে কত বায়ু কে ব্যবহার করছি, সব সময় তার হিসাব রাখবেন এবং সে অনুযায়ী মুল্য আদায় করবেন। নীচের আয়াতটি যদিও কৃপণ ইহুদীদের উদ্দ্যেশে নাজিল হয়েছে, তবুও সার্বিক ভাবে এটা সব মানষের জন্যই প্রযোজ্য। কেউ যদি বিশ্ব জগতের সার্বভৌমত্ব পেয়ে যায়, তবে তার সব রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করার জন্য আমাদের নিকট থেকে সে চার্জ আদায় করবে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে এটা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। একজন করোনা রুগীকে জিজ্ঞেস করুন, শুধু মাত্র অক্সিজেনের জন্য তাকে কত টাকা গুনতে হয়েছে, যা আমরা আল্লাহর রাজ্যে বিনামুল্যে উপভোগ করছি। আমরা কি আল্লাহর কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করতে পারি? মহান আল্লাহ ঘোষনা করেনঃ

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا

তাদের কাছে কি রাজ্যের কোন অংশ আছে? তা হলে যে এরা কাউকেও একটি তিল পরিমাণও দেবেনা। (৪:৫৩)

২০৭

ছোট্ট এক মশা হুল ফুটিয়েছে আপনার পায়ে। মশা কোথায় বসেছে আপনি সেটা দেখেন নাই। কিন্তু আপনার ব্রেনে শত্রুর সংবাদ ঠিকই পৌছে গেছে। ব্রেনের নির্দেশে আপনার হাত আপনার অজান্তেই মশাকে আঘাত করবে, অদেখা শত্রুকে পিশে মারার জন্য। এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের দেহের চামড়ার জন্য। চামড়ার সেন্সর গুলি ব্রেনে সিগনাল দিচ্ছে অবিরাম, আর ব্রেন accordingly action নিচ্ছে। Skin is the Pain Receptor... চামড়ার জন্য আমরা এই ব্যাথার অনুভুতি পাই, এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি গত শতাব্দীতে আবিস্কৃত হয়েছে। কেউ যদি অগ্নি দগ্ধ হয়, তবে পিন ফুটিয়ে পরীক্ষা করা হয় তার চামড়ার কতটুকু ক্ষতি হয়েছে। পিন ফুটালে যদি কোন ব্যথা না লাগে তবে বুঝতে হবে চামড়া সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারন চামড়া যদি সম্পূর্নরূপে বিনষ্ট হয়, তাহলে আপনি

আর কোন ব্যথা অনুভব করবেন না। কোরআনে এই সত্যটি ১৫০০ বছর আগেই ঘোষনা করা হয়েছে। নীচের আয়াতটি ভালো ভাবে লক্ষ্য করুন। আল্লাহ তালা দোজখীদের পুড়ে যাওয়া চামড়া পুন:স্থাপন করে দেবেন। কেন পুনঃস্থাপন করবেন সেটাও এই আয়াতে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে তারা আবার অগ্নির জ্বালা অনুভব করতে পারে। চামড়া না থাকলে দহন জ্বালার কোন অনুভুতি নাই। মহাবিজ্ঞান আর মহা কৌশলের অধিকারী মহান আল্লাহ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শন সমুহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী।।(৪:৫৬)

২০৮

আল্লাহ যখন কোন কিছু করতে নির্দেশ দেন, তখন সেটা আমাদের জন্য ফরজ হয়ে যায় এবং তার ব্যতয় করলে সেটা হবে মহা পাপ বা গুনাহে কবিরাহ। এমনই দুইটি নির্দেশ আল্লাহ নীচের আয়াতে দিয়েছেন। নির্দেশ দুটি হচ্ছে আমানত রক্ষা করা এবং ন্যায় বিচার করা। আমানত বলতে আমরা অনেক কিছু বুঝি। তবে প্রাথমিক ভাবে কেউ কারো কাছে তার সম্পদকে গচ্ছিত রাখলে তাকে আমরা আমানত বলি। এই গচ্ছিত সম্পদ তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া আমাদের জন্য ফরজ। আমানতকে খেয়ানত করলে সেটা হবে এক মহাপাপ। আমরা যখন ব্যাংকে আমাদের অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখি, ব্যাংকের দায়ীত্ব চাহিবা মাত্র আমাদের অর্থ-সম্পদ ফেরৎ প্রদান করা। এ ছাড়াও পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে, বা রাষ্ট্রীয়ভাবে অনেক দায়ীত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়। সেগুলির আমানতদারী করা আমাদের কর্তব্য। জনগন তাদের ক্ষমতা অর্পন করে দেশের প্রধান মন্ত্রীকে। এই ক্ষমতার সুষ্ঠ ব্যবহার করে রাষ্ট্র শাসন করা প্রধান মন্ত্রীর আমানত। ক্ষমতার অপব্যবহার করা আমানতের খিয়ানত। সরকারী কর্মচারীদের জন্যও এটা প্রযোজ্য। আপনার বন্ধু আপনাকে একটা গোপন তথ্য দিয়ে তা গোপন রাখতে বললেন। আপনি সেটা ফাঁস করে দিলেন। আমানতের খেয়ানত হলো। এই আয়াতে আল্লাহর দ্বিতীয় নির্দেশ হলো ন্যায় বিচার করা। সব ধরনের বিচারকের জন্য এই নির্দেশ প্রযোজ্য। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক থেকে শুরু করে, গ্রাম পঞ্চায়েতের মোড়লদের জন্য আল্লাহর এই নির্দেশ। আল্লাহ সুবহানুতালা নিজেই এক মহাবিচারক যিনি বিচারে সামান্যতম জুলুমও করেন না। পৃথিবীর বিচারকগনও তাই আল্লাহর সরাসরি প্রতিনিধি। তাদেরও উচিত ন্যায়পরায়নতার সাথে সমস্ত বিচার কার্য পরিচালিত করা। যারা ন্যায় বিচারক, তাদের জন্য আল্লাহর আরশের নীচে ছায়া দান করা হবে হাসরের সেই মহা কঠিন দিনে।

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। (৪:৫৮)

২০৯

আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের নেতৃবর্গের। এটাই কোরআনের নির্দেশ। এবং এই আয়াত ইসলামের সমগ্র ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি। যে কোন ইসলামী রাষ্ট্রে এটা সংবিধানের প্রাথমিক ধারা। আল্লাহ এবং রাসুলের আনুগত্য সম্পুর্ন দ্ব্যর্থহীন ও শর্তহীন। যে কোন অবস্থায়, যে কোন পরিস্থিতিতে, আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশ মানতে হবে। বস্তুতঃ সর্ব প্রকার নির্দেশের অধিকার একমাত্র আল্লাহ সুবহানু তালার হাতে [সুরাহ ইউসুফ-৪০]। কিন্তু যেহেতু রাসুল আল্লাহর সরাসরি প্রতিনিধিত্ব করেন তাই রাসুলের আনুগত্যকে আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করলো, সে আল্লাহর আনুগত্য করলো [নিসাঃ ৮০]। এই কারনে কোরআনকে যেভাবে মানতে হবে, সেই ভাবেই হাদিসকে মানতে হবে। আজকাল একদল লোকের মাঝে হাদিসকে প্রত্যাখান করার প্রবনতা দেখা দিয়েছে। এটা সম্পুর্ন ভ্রান্ত পথ । হাদিসের সাহায্য ছাড়া কোরআনকে বাস্তবায়ন সম্ভব নহে। এর পরেই আসে নেতৃবর্গের কথা। যিনি আমার Boss বা Commander, তার আনুগত্য করাও আমার জন্য ওয়াজিব। এই নির্দেশ সমাজ বা রাষ্ট্রের সর্ব স্তরে প্রযোজ্য। এটাই সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি। কিন্তু এই আনুগত্য শর্তহীন নহে। Commander এর নির্দেশ ততক্ষনই মানা যাবে যতক্ষন তিনি ন্যায়ের সাথে নির্দেশ দিবেন, যতক্ষন তিনি আল্লাহ ও রাসুলের বিরোধী কোন নির্দেশ না দিবেন। এরকম মতভেদের উদ্ভব হলে সংগে সংগে কোরআন হাদিসকে রেফারেন্স হিসাবে নিতে হবে। মিলিটারী সার্ভিসে যারা আছেন, তারা শপথ নেন যে জীবন পাত করে তারা Commander এর সমস্ত আদেশ নির্দেশ পালন করবেন (in the peril of life)। কিন্তু তার পরেও সে যদি মানবতা বিরোধী কোন কাজ করে, তবে সে তার Commander এর সাথে সাথে নিজেও দায়ী থাকবে সমানভাবে। এই কারনে ৭১ সালে হাজার হাজার বাংগালী মিলিটারী পাকিস্থানের পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। তাই আমাদের সদাই স্মরন রাখতে হবে, নেতাদের আদেশ মান্য করা ওয়াজিব, কিন্তু শর্ত সাপেক্ষে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা নেতৃত্বে আছেন তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। (৪ঃ৫৯)

২১০

আল্লাহ যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তাদেরকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। তারা হলেন নবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং সালেহীন। এই চার ধরনের সবাই জান্নাতের অধিকারী হবেন। এদের মধ্যে একমাত্র নবীরাই হলেন আল্লাহ মনোনীত। নবী-রাসুলদের আল্লাহ আগে থেকেই নির্দ্দিষ্ট করেছেন এবং শিশুকাল থেকেই তাদের সেই ভাবে গড়ে তুলেছেন। অনেক সময় মানুষেরা প্রতিবাদ করেছে, কেন তাদের মধ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নবী করা হলো না। আল্লাহ বলেন, কাকে আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন

সেটা কি তোমরা ঠিক করে দেবে। এই নবীদের সংখ্যা পৃথিবীতে অগনিত। এমন কোন গোত্র নাই, এমন কোন জাতি নাই, এমন কোন ভাষা-ভাষি নাই, যেখানে আল্লাহ নবী পাঠান নাই। আমরা নবীদের সংখ্যা জানি না, কিন্তু এটা জানি যে সমস্ত নবীরাই তাদের উম্মতদের সাথে নিয়ে তাদের জন্য নির্দিষ্ট জান্নাতে প্রবেশ করবেন। নবীদের পরেই আসে সিদ্দিকদের স্থান। মানুষের মধ্যে তারা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, ইমান ও আমলে পরিপুর্ন, অতীব সত্যনিষ্ঠ এবং নবীদের সহযোগী। মুসলমানদের মধ্যে রাসুলের পরেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন আবু বকর রাঃ এবং তিনি একজন সিদ্দিক। অন্যান্য নবীদের সাহাবীদের মধ্যেও অনেকে সিদ্দিক ছিলেন। শহীদদের কথা আমরা সবাই জানি। যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে প্রাণ দিয়েছেন, তারাই শহীদ। তাদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেছেন, তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না, তাদেরকে নিয়মিত রিজিক দেওয়া হয়। সালেহীন ঐ সব ব্যক্তি যারা আল্লাহ ও বান্দাদের অধিকারসমূহ পূর্ণ ভাবে আদায় করেছেন এবং তাতে কোন ত্রুটি করেন নি। রাতে তারা আল্লাহর এবাদতে মশগুল, দিনে তারা মানুষের খেদমতে তৎপর। দুনিয়া ও আখেরাত, এই দুইদিকেই তারা সমান অগ্রনী। আর উপরে বর্ণিত এই চার ধরনের লোকেরাই আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করেছেন। আর এদের সংগী হবার একটি মাত্রই পথ আছে- তা হচ্ছে আল্লাহ ও রাসুলের পূর্ণ আনুগত্য করা। আল্লাহ আমাদের এই সব মহতীদের সঙ্গী করুন।

وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقًا

আর যে কেউ আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করবে, তাহলে সে তাঁদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল (সালেহীন) ব্যক্তিবর্গ। আর সঙ্গী হিসাবে এরা অতি উত্তম। (৪:৬৯)

২১১

সুরাহ তাওবার ১১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, মুমিনদের জান-মাল আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। আমরা যদি মুমিন হই, তবে নিশ্চয়ই আমরা এই কেনাবেচায় অংশগ্রহণ করেছি। তাহলে আমাদের জান মাল আর আমাদের দখলে নাই। এটা আল্লাহর দখলে চলে গিয়েছে। আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা আমাদের জান মালকে ব্যবহার করতে পারেন। নীচের আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, তিনি কিভাবে আমাদের জান মালকে ব্যবহার করতে চান। আল্লাহ বলেন, আমরা যদি এই কেনা বেচায় অংশগ্রহণ করি তাহলে আমাদের কর্তব্য হবে জিহাদে যোগ দেওয়া। এই যুদ্ধে বিজয়ী অথবা নিহত যায়ই হোক না কেন , আখিরাতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে এক বিশাল পুরস্কার। আর সেটা হলো জান্নাত যা আমরা আগেই কিনে নিয়েছি আমাদের জান ও মালের পরিবর্তে। মহান আল্লাহ তালা বলেনঃ

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَويَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জেহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুত: যারা আল্লাহ্র রাহে লড়াই করে এবং অত:পর মৃত্যু বরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহা পুরুস্কার দান করব। (৪:৭৪)

২১২

বর্ত্তমান বিশ্ব অবস্থায় নীচের আয়াতটি দিশাহারা মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য একটা পথ নির্দেশীকা হতে পারে। সমস্ত বিশ্বে আজ মুসলিম জনতা জাতি হিসাবে চরমভাবে নির্যাতিত। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধদের আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস দুঃখ ভারাক্রান্ত। দেশ থেকে তারা বহিষ্কৃত, দেশেও তারা বন্দীদশায়, বাড়ী ঘর ভষ্মীভুত, সহায় সম্পদ লুন্ঠিত, ক্যাম্পে তাদের বন্দী জীবন। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে তাকাই না কেন, একই দৃশ্য সর্বস্থানে। মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা দেশ থেকে বহিষ্কৃত, কাশ্মীরের মুসলিমরা নির্যাতিত, ফিলিস্থনীরা দেশহারা, উইঘুর মুসলিমরা Concentration Camp এ, ইরাক আজ ধর্ষিত, সিরিয়ার এতিম শিশুরা অসহায়ভাবে আসমানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিভ্রান্ত। তাদের কি কিছুই করনীয় নেই? OIC কি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবে এই মুসলিম নিধনকে? আল্লাহ বলেন, তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা এই অসহায় শিশু ও নর-নারীদের উদ্ধারের জন্য সংগ্রাম করবে না? বস্তুতঃ ইসলামে দুইটি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য জিহাদকে ফরজ করা হয়েছে। প্রথমতঃ দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ অসহায় নির্যাতিত মুসলিম নর নারীদের উদ্ধারের জন্য। এখন হয়তো প্রথম অবস্থা নেই, কিন্তু বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে দ্বিতীয় অবস্থা বিরাজ করছে। সমস্ত মুসলিম দেশ গুলিকে এক হয়ে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে, কোরআনের নির্দেশকে বাস্তবায়ন করতে হবে।

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

আর তোমাদের কি হল যে, তেমারা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না অসহায় সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী ! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অবিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। (৪ঃ৭৫)

২১৩

আমরা কি মৃত্যুকে কখনো এড়িয়ে যেতে পারি? মৃত্যুর লম্বা হাতকে কেউ কী কখনো এড়িয়ে যেতে পেরেছে ? আপনি দুর্গম দুর্গে লুকিয়ে থাকতে পারেন, বিশ্বের সর্বোচ্চ ইভারেষ্টের চূড়ায় আশ্রয় নিতে পারেন- কিন্তু মৃত্যু ঠিক আপনার জন্য নির্ধারিত সময়ে আপনার কাছে পৌছে যাবে। তাই যারা মৃত্যু ঝুকির ভয়ে সৎকাজ থেকে বিরত থাকে, তারা নিতান্তই বোকামী করে। বরং প্রত্যেকের প্রচেষ্টা হওয়া উচিৎ কি ভাবে উত্তম মৃত্যু লাভ করা যেতে পারে। জেহাদ অবস্থায় যে মৃত্যু, মানব কল্যাণে নিয়োজিত থাকার প্রচেষ্টায় যে মৃত্যু, মানবতার সেবার পথে যে মৃত্যু, দ্বীন প্রচার অবস্থায় যে মৃত্যু, এ সবই উত্তম মৃত্যু। আল্লাহ আমাদের উত্তম মৃত্যু দান করুন।

أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَـذِهِ مِنْ عِندِاللهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَـذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللهِ فَمَا لِهَـؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَيَفْقَهُونَ حَدِيثًا

তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও। বস্তূত: তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে,এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, বলে দাও, এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হবে, যারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না। (৪:৭৮)

২১৪
নীচের আয়াতে আল্লাহ সুবহানুতালা আর একবার দৃঢ়ভাবে ঘোষনা করলেন যে রাসুলের আনুগত্য করা তোমাদের জন্য ফরজ। রাসুলের আনুগত্য করলেই ধরে নেওয়া হবে যে আমরা আল্লাহর আনুগত্য করলাম। এর বিস্তৃত আলোচনা আমরা আগে এই সুরার ৫৯ নম্বর আয়াতে করেছি। এখানে আমরা আরো জোরে সোরেই বলতে চাই যে রাসুলের আনুগত্য করতে হলে আমাদের জানতে হবে রাসুল কি কি করেছেন, কিভাবে করেছেন, কি কি করতে নির্দেশ দিয়েছেন, কি কি করতে নিষেধ করেছেন। তাই আমাদের হাদিসের কাছেই ফিরে আসতে হবে। যারা হাদিস মানতে চান না, তারা জাল হাদিসের দোহায় দেন। এটা ঠিক যে অনেক স্বার্থান্বেষী মহল নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অনেক মিথ্যা হাদিস প্রচার করেছে। কিন্তু সহিহ হাদিস নিরুপন করার জন্য মুসলিম মনীষীগন প্রচুর গবেষনা করেছেন, শত শত বই লিখেছেন, হাজার বছর আগেই তারা জাল হাদিসগুলি ছেকে বের করে নিয়েছেন। তাই জাল হাদিসের ছুতা দিয়ে হাদিসকে প্রত্যাখান করার অর্থ্যই হচ্ছে আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া, যা পরিশেষে আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করারই শামিল। আল্লাহ আমাদের সহিহ বুঝ দান করুন।

مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি। (৪ঃ৮০)

২১৫
ইসলামের প্রথম দিকে মুশরিকগন চরম ভাবে কোরআনের বিরুদ্ধে প্রচারণা করত। কেউ বলত এটা যাদু গ্রন্থ, কেউ বলত এটা রাসুল নিজে লিখেছেন, কেউ বলত মরুভূমির একজন তাকে শিক্ষা দেয়, কেউ বলত এটা তৌরাত ইঞ্জিলের নকল। আল্লাহ বিভিন্ন সময় এগুলি খন্ডন করে কাফেরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন, তারা পারলে এরকম একটা বই লিখে আনুক। মাত্র দশটা সুরাহ রচনা করুক, অথবা মাত্র একটা সুরাহ লিখে আনুক। কিন্তু আরবের কাফেররা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সমর্থ হয় নি।নীচের আয়াতে আল্লাহ আর এক ধরনের চ্যালেঞ্জ করেছেন কাফেরদের প্রতি। তারা কী কোরআনে কোন বৈসাদৃশ্য দেখতে পেয়েছে? বিশাল এক গ্রন্থ এই কোরআন। সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে আস্তে আস্তে নাজিল হয়েছে। যদি এ কেতাবটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ রচনা করে থাকতো তা হলে তারা এতে অনেক বৈসাদৃশ্য খুঁজে পেত, অনেক স্ববিরোধিতা থাকত এতে, প্রথম দিকের আর শেষের দিকের বর্ণনায় অনেক অমিল থাকত, ভাষার পার্থক্য থাকত। কিন্তু সুবহানাল্লাহ! তারা এ মহাগ্রন্থে কোন বৈসাদৃশ্য খুঁজে পায় নি, পাবেও না। তাই মহান আল্লাহ তালা অবিশ্বাসীদের প্রতি চ্যলেঞ্জ ঘোষনা করেছেন এ আয়াতে।

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا

এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।((৪:৮২)

২১৬
কাবিল বিশ্বের প্রথম নর হত্যাকারী। তাই বিশ্বের সমস্ত অন্যায় হত্যাকারীর পাপের একটা অংশ তার খাতায় জমা হবে। তেমনি বিশ্বে কেউ যদি ভাল কিছু প্রবর্তন করে যায়, তবে তার পুন্যের অংশও জমা হতে থাকবে প্রবর্তনকারীর আমলনামায়। আমাদের সুপারিশে বা সহায়তায় যা কিছু ঘটতে থাকবে, তার পাপ পুন্যের ভাগ আমাদের বহন করতে হবে। তাই আল্লাহ তালা আমাদের সাবধান করেছেন, আমরা যেন সব কিছুতেই সহায়তা না করি এবং সব কিছুতেই সুপারিশ না করি। আমাদের বুঝতে হবে যার জন্য সুপারিশ করছি সেটা ভাল না মন্দ কাজ? কেননা যে কাজেই আমরা সহায়তা করি অথবা সুপারিশ করি তার পাপ পুন্যের একটা অংশ আমরা পাব। আল্লাহ তালা বলেন:

مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُعَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

যে লোক সৎকাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্যে সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তূত: আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।(৪:৮৫)

২১৭

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীর জন্য তাদের নিজস্ব ভাষায় তাদের নিজস্ব সম্ভাষণ বা অভিবাদন রীতি চালু রয়েছে। সকালে কোন ব্রিটিশের সাথে দেখা হলেই আপনাকে বলবে, Good Morning. গত রাতটা আপনার জন্য হয়তো খুবই দুঃসহ ছিল। তবুও আপনাকে উত্তরে বলতে হবে- Good Morning. অনেক দেশেই Good Morning এর অনুবাদকে সম্ভাষণে ব্যবহার করা হয়। অনেক বাঙ্গালী আছে যারা শুভ সকাল বলে সম্ভাষণ করে। ইন্দোনেশিয়ানরা বলে Selamat Pagi. আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশে 'নমস্কার' শব্দটি চালু আছে। নমস্কার শব্দের অর্থ কি? নমস্কার বা নমস্তের অর্থ – আমি আপনার অন্তঃস্থ ঈশ্বরকে আমি অন্তর দিয়ে অনুভব করছি ও সম্মান প্রদর্শন স্বরূপ তার কাছে মাথা নত করে প্রনতি জ্ঞাপন করছি। এতে ধরে নেওয়া হয় যে প্রতিটি মানুষের মাঝে ইশ্বরের বসবাস। এটা একটি শিরকি ধারনা। অন্যদিকে **ইসলামের সম্ভাষনের রীতি নিয়ে ভাবুন! অন্যান্য জাতী থেকে এটা সম্পূর্ণ আলাদা। সর্ব অবস্থায় সবার জন্য শুধুমাত্র শান্তি কামনা করা হয়েছে আমাদের সম্ভাষণের ভাষায়। আর কিভাবে সম্ভাষনের প্রত্যুত্তর দিতে হবে তাও আল্লাহ তালা শিক্ষা দিচ্ছেন নীচের আয়াতে। সম্ভাষনের উত্তরে আরও ভাল শব্দমালা অথবা একই রকম কথামালার দ্বারা প্রত্যুত্তর করতে হবে। আপনার অধীনস্তু কেহ যদি আপনাকে বলে আস্সালামু আলাইকুম, তার উত্তরে শুধুই ওয়ালাইকুম বলা ইসলাম অনুমোদন করে না। বরং পুরোটাই বলতে হবে। তবে ভাল হয় অতিরিক্ত কিছু যোগ করা। আল্লাহ তা'লা বলেনঃ**

وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

আর তোমাদেরকে যদি কেউ অভিবাদন (সালাম) করে, তা হলে তোমরাও তার জন্য অভিবাদন কর, তার চেয়ে উত্তম অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী।(৪:৮৬)

২১৮
আমরা এক সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বে বাস করছি। এই মহাবিশ্ব যে একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে তাতে বিজ্ঞানীদের মনেও কোন সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রসারিত হতে হতে এটা বেলুনের মত ফেটে যেতে পারে। আবার হয়তো প্রসারের শেষ প্রান্তে পৌছে এটা আবার সংকুচিত হতে হতে এক বিন্দুতে যেয়ে মিশতে পারে যেখান থেকে প্রথম সৃষ্টির উদ্ভব হয়েছিল। যেভাবেই হোক, মহা প্রলয় হবেই। অন্যদিকে মহান আল্লাহ বলেন, কেয়ামত সংঘটিত হবেই এবং শেষ বিচারের জন্য সব্বাইকে হাশরের মাঠে সমবেত করা হবে। এই অমোঘ সত্য বানীটি মহান আল্লাহ আবার জোর দিয়ে নীচের আয়াতে ঘোষণা করেছেন। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কারন আল্লাহ নিজে এই ঘোষনা দিচ্ছেন। আর আল্লাহর কথা অবশ্যই সত্য। আল্লাহতালা এরশাদ করেনঃ

اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا

আল্লাহ ব্যতীত আর কোনোই উপাস্য নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন কেয়ামতের দিন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাছাড়া আল্লাহর চাইতে বেশী সত্য কথা আর কার হবে! (৪:৮৭)

২১৯
ইসলাম শান্তির ধর্ম। তাই ইসলামের প্রাথমিক প্রচেষ্টা, কিভাবে যুদ্ধ না করে শান্তি প্রতিষ্টা করা যায়। ইসলাম সে সকল লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনুমোদন করেনা যাদের সাথে মুসলিমদের শান্তি চুক্তি রয়েছে, অথবা যারা যুদ্ধ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করেছে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করছে না অথবা যারা শান্তির প্রস্তাব দিয়েছে, অথবা যারা Neutral থাকতে চায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আক্রান্ত না হলে বা আক্রান্তের ভয় না থাকলে, অথবা সে দেশে উৎপীড়ণ না হলে মুসলমান কখনও যুদ্ধ শুরু করে নি। এ বিষয়ে কোরআনের ভাষ্য খুবই স্পস্টঃ

إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُونَكُمْ أَوْيُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاء اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُالسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً

কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যে, তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে চুক্তি আছে অথবা তোমাদের কাছে এভাবে আসে যে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে এবং স্বজাতির সাথেও যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। যদি আল্লাহ ইচ্ছে করতেন, তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধের) কোন পথ দেননি। (৪:৯০)

২২০
ইচ্ছাকৃত কোন মুমিনকে হত্যা করা মহা মহা পাপ। সাধারণতঃ হত্যাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। ভুলক্রমে হত্যা, প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং ইচ্ছাকৃত হত্যা। ভুলক্রমে কোন হত্যা কান্ড ঘটলে তার বিধান কি হবে, তার বিস্তৃত বর্ণনা আগের আয়াতে এসেছে (আয়াত ৯২)। কাফফারা

হিসাবে তাকে একটি দাসকে আজাদ করে দিতে হবে। এবং সাথে সাথে নিহত ব্যক্তির জন্য রক্তপন আদায় করতে হবে। হাদিসেও বহু আলোচনা হয়েছে এ সম্বন্ধে। কিন্তু প্ল্যান করে ঠাণ্ডা মাথায় ইচ্ছাকৃত ভাবে কাউকে হত্যা করা হলে সেটা এক মহা গুরুতর অপরাধ এবং এটি মহাপাপ। আল্লাহ তা'লা এ হত্যাকারীর প্রতি এত ক্রোধান্মিত হবেন যে তাকে লানত দেবেন, তার দিকে তাকাবেন না, তাকে পরিশুদ্ধ করবেন না এবং সে অনন্ত কালের জন্য দোজখে প্রবেশ করবে। অধিকন্ত, সে এই পৃথিবীর আদালতেও উপযুক্ত শাস্তি পাবে। কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًاعَظِيمًا

যে ব্যক্তি স্বেচছা ক্রমে কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তূত রেখেছেন। (৪:৯৩)

২২১
বিশ্বাসী মাত্রই সকলে সমান নয়। তাদের কৃতকর্ম এবং ইসলামের প্রতি ত্যাগ তিতিক্ষার উপর নির্ভর করে তাদের মর্যাদা। যিনি ঘরে বসে সকল ধরনের ইবাদত করেন তিনি এবং যারা ইসলামের জন্য জীবন ও মালামাল উৎসর্গ করছেন, তাদের মর্যাদা সম পর্যায়ের হবে না। তাদের সব কর্মকান্ড ও ত্যাগের উপর ভিত্তি করে তারা বিভিন্ন স্তরের বেহেশত লাভ করবেন। কিন্তু যারা অক্ষম তাদেরকে আল্লাহ ছাড় দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের নিয়ত ও প্রচেষ্টা দেখবেন। বর্তমানে যেমন আমরা ইচ্ছে করলেই মিলিটারীতে যোগ দিয়ে জেহাদে যেতে পারি না। ISSB থেকেই ৯০% ছেলে ফেরত চলে আসে। এদের জন্য নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড় দিবেন। আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেনঃ

لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْوَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَىوَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান- যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে,-সমান নয়।যারা জান ও মাল দ্বারা জেহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদ মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।(৪:৯৫)

২২২ .
দ্বীন রক্ষার জন্য নিজ বাসভূমি ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যাওয়া, সেই ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই চলে আসছে। মক্কায় যখন কাফেরদের অত্যাচারে মুসলমানদের জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল, তখন আল্লাহর রাসুল একদল মুসলিমকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। পরবর্তী কালে রাসুল নিজেই মদিনায় হিজরত করেন। হিজরতের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান যুগেও শেষ হয়ে যায় নি। যদিও বর্তমানে মানুষ শুধু Political এবং আর্থিক কারনেই হিজরত করে থাকে। তবে যখন আমরা দেখব যে, বিদ্যমান পরিবেশ পরিস্থিতি ইমান রক্ষা ও ভাল আমল করার উপযোগী নয়, তখন আমাদের বিশ্বের উপযোগী অন্য কোন স্থানে হিযরত করতে হবে। আল্লাহর জমীন যথেষ্টই প্রশস্ত এবং ধর্মের কারনে হিযরত ইসলামে সর্বদাই একটি অতি উচ্চ মর্যাদার কাজ হিসাবে পরিগনিত। আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوَاْ أَلَمْتَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا

যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে: এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে: আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। (৪:৯৭)

২২৩ .
আল্লাহর কারনে কেউ হিযরত করলে সে আরাম আয়েশের সাথে বসবাস করার জন্য অনেক স্থান পাবে এবং নিজের জন্য ও ইসলামের বিস্তার ঘটানোর জন্য অনেক সুযোগ পাবে। এ বক্তব্যের সমর্থনে আমরা অনেক ঘটনা ঘটতে দেখেছি। রাসুল(স:) এর অধিকাংশ সাহাবীই তাদের জন্ম ভূমিতে মৃত্যু বরণ করার সুযোগ পাননি। তারা ইসলামের জন্য পৃথিবীর দুর দুরান্তে সফর করেছেন এবং সেখানে মৃত্যু বরণ করেছেন। বর্তমান সময়েও অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণের পর নিজ দেশে টিকতে পারেন নি। তারা পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশে হিজরত করেছেন। আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে এরকম বহু ঘটনা। এবং আল্লাহর বিশেষ রহমত রয়েছে এই সব হিজরতকারীদের উপর। আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেনঃ

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অত:পর মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লহ ক্ষমাশীল ,করুণাময়। (৪:১০০)

২২৪
সফরের সময় নামাজ সংক্ষিপ্ত (কসর) করার অনুমতি রয়েছে অর্থাৎ ৪ রাকাতের নামাজগুলি ২ রাকাত পড়তে হবে। একই ভাবে যখন আমরা শত্রু পরিবেশে অবস্থান করি, যখন সার্বক্ষনিক শত্রুর আক্রমনের আশংকা থাকে, সেক্ষেত্রেও আমরা নামাজ সংক্ষিপ্ত করতে পারি। নীচের আয়াতে সফরের সাথে শত্রুর ভয়কে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এটা প্রযোজ্য ছিল। তখন প্রতিটি সফরেই শত্রুর ভয় ছিল। কিন্তু যখন সমস্ত আরবে ইসলাম ছড়িয়ে পড়লো, মানুষেরা ভয় ভীতিহীন ভাবে যথেচ্ছ সফর করতে লাগলো, তখনও কি কসর নামাজ পড়তে হবে? সাহাবিরা এই প্রশ্ন সরাসরি রাসুলকে করলেন। রাসুল বললেন, আল্লাহ একবার যে ছাড় দিয়েছেন সেটাকে তোমরা সাদাকাহ হিসাবে গ্রহন করো। অর্থাৎ সফরে নামাজ কসর করতে হবে, শত্রুর ভয় থাকুক আর না থাকুক। সফরে আরো একটা ছাড় দেওয়া হয়েছে যেটা হাদিসে এসেছে। যোহর এবং আসরের নামাজ এক ওয়াক্তে এক সাথে পড়া যাবে। সেইরুপ মাগরিব ও এশা। সাধারণতঃ হজের দিনে আমরা এটা করি। কিন্তু অন্যান্য সফরেও রাসুল এটা করেছেন বলে হাদিসে এসেছে।। আল্লাহতা'লা এরশাদ করেনঃ

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (৪ঃ১০১)

২২৫

যুদ্ধের সাজে সজ্জিত অবস্থায় কীভাবে নামাজ আদায় করতে হবে সে বিষয়েও আল্লাহতা'লা বিস্তারিত ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন নীচের আয়াতে। কোন সময়েই নিজেদের পোষ্ট ছেড়ে যাওয়া যাবে না। একদল সৈনিক নামাজে দাঁড়াবে, অন্য দল পাহারায় থাকবে। এক রাকাত শেষ হবার পরে প্রথম দল পাহারায় যাবে এবং দ্বিতীয় দল এসে নামাজে দাঁড়াবে। এই ভাবে দুই রাকাত শেষ হবে। বর্তমান যুগের যুদ্ধাবস্থায় Trench বা বাংকারে যেভাবে ব্যবস্থা থাকবে সেই ভাবেই নামাজ পড়তে হবে। তায়াম্মুম করে বুট হেলমেট পরেই দাড়িয়ে বা বসে নামাজ পড়তে হবে। একজন নামাজে থাকলে অন্যজন তাকে Fire Cover দিবে। Tank বা APCতে থাকলেও পালা পালি করে নামাজ পড়তে হবে। এমনকি Infantry যদি চলতি অবস্থায় থাকে এবং যদি নামাজের ওয়াক্ত অতিক্রমের অবস্থা হয়, তবে হাটতে হাটতেই ইশারায় নামাজ পড়তে হবে বলে অন্য এক আয়াতে এসেছে। আসল কথা, কোন অবস্থাতেই নামাজ ছাড়া যাবে না। আল্লাহ আমাদের জন্য সব কিছু সহজ করে দিন।

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান, তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। অতঃপর যখন তারা সেজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে, যারা নামায পড়েনি। অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে নামায পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়। কাফেররা চায় যে, তোমরা কোন রূপে অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের কোন গোনাহ নেই এবং সাথে নিয়ে নাও তোমাদের আত্নরক্ষার অস্ত্র। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের জন্যে অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৪ঃ১০২)

২২৬

আগের দুই আয়াতে বিভিন্ন অস্বাভাবিক ইমারজেন্সিতে কিভাবে নামাজ পড়তে হবে তার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সফরের সময়, ভয়ের সময়, যুদ্ধাবস্থায়, শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায়, অর্থাৎ কোন পবস্থাতেই নামাজ ছাড়া যাবে না, কারন প্রত্যেক নামাজেরই নির্দিষ্ট সময় আছে। ঐ সময়ের মধ্যেই নামাজটি ফরজ। স্বাভাবিক অবস্থায় অথবা অস্বাভাবিক অবস্থায়, সব অবস্থাতেই আমাদের নামাজকে তার নির্ধারিত সময়েই আদায় করতে হবে। আমরা যদি অবহেলা করে নামাজের সময়টি

হারিয়ে ফেলি, তবে সেই নামাজটি ছুটে গেল, এবং সেজন্য আমাদেরকে জবাবদিহী করতে হবে। সময়ের এত কড়াকড়ি আছে বলেই বিভিন্ন অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য নামাজের বিভিন্ন শর্ত শিথিল করা হয়েছে। কারন একটাই, যাতে আমরা নামাজের নির্ধারিত সময়টি যথাযথ ভাবে অনুসরণ করতে পারি। আল্লাহতা'লা এরশাদ করেনঃ

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

অত:পর যখন তোমরা নামায সমপন্ন কর, তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরন কর। অত:পর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। (৪:১০৩)

২২৭

একটা চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সুরার ১০৪ নম্বর থেকে ১১৩ নম্বর আয়াতগুলি নাজিল হয়। আনসারদের যাফার গোত্রের একজন লোক অন্য এক আনসারের একটি বর্ম চুরি করে। কিন্তু চুরির ব্যাপারটা প্রায় ফাস হয়ে যাবার অবস্থায় পৌছে যায়। তখন চোর বর্মটি গোপনে এক ইহুদির বাড়ীতে রেখে আসে। পরে তারা সেই ইহুদীকে চোর সাব্যস্ত করে রাসুলের দরবারে বিচার দেয়। রাসুল বিচারে বসেন। সাক্ষী সাবুদ গ্রহণ করা হয়। ইহুদীর পক্ষে অন্য কোন সাক্ষী ছিল না। এক পর্যায়ে মনে হচ্ছিল যে ঐ ইহুদীই বর্মটি চুরি করেছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ চান নাই যে তার রাসুল বিচারে ভুল করুক। রায় ঘোষণার ঠিক আগ মুহূর্তে আল্লাহ ঐ ১০টি আয়াত নাজিল করে রাসুলকে প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে দিলেন। সেই সাথে আল্লাহ মুমিনদের সতর্ক করে দিলেন যে এই ধরনের কার্যকলাপ এক জঘন্য অপরাধ। প্রথমতঃ চুরি করা মহাপাপ, আবার চুরির অপবাদ অন্যের উপর চাপানো আর এক মহাপাপ। তারপর মিথ্যা সাক্ষ্য ও তথ্য দিয়ে বিচারককে বিভ্রান্ত করা আর এক জঘন্য পাপ। বর্তমানে বিচারকগন রাসুলের মত আল্লাহর অহি পান না। যে সাক্ষ্য সাবুধ তাদের কাছে পেশ করা হয়, তার ভিত্তিতেই তারা রায় দেন। তাই মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলে একজন নিরপরাধ ব্যাক্তি শাস্তি পেয়ে যেতে পারে। মহান আল্লাহ তাই সাক্ষ্য দানকারীর প্রতি কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারন করেছেন অন্য এক আয়াতে। আল্লাহ আমাদের এই ধরনের পাপ থেকে হেফাজত করুন।

وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا
وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مُّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

যে ব্যক্তি ভূল কিংবা গোনাহ করে, অতঃপর কোন নিরপরাধের উপর তা আরোপ করে সে নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গোনাহ। যদি আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হত, তবে তাদের একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল। তারা পথভ্রান্ত করতে পারে না কিন্তু নিজেদেরকেই এবং আপনার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ আপনার প্রতি ঐশী গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম। (৪ঃ১১২-১১৩)

২২৮

শিরক এক জঘন্য মহাপাপ। ক্ষমার অযোগ্য এ পাপ। শিরক ছাড়া অন্য যে কোন পাপ আল্লাহ ক্ষমা করলেও করতে পারেন। যদি কেউ আল্লাহ তা'লা ছাড়া অন্য যে কোন সত্তার ইবাদত করে, সে শিরকে লিপ্ত হলো। সেই সত্ত্বা এক নারী দেবী হতে পারে, অথবা একজন ফেরেশতা হতে পারে, নবী রাসুল বা সাধু- সন্ত হতে পারে, অথবা একজন ওলি-আল্লাহ হতে পারে। এদের ইবাদত করতে গিয়ে সে বিদ্রোহী শয়তানেরই ইবাদত করছে, এক মহা ভ্রান্তিতে আছে তারা। আল্লাহ আমাদের সব ধরনের শিরক থেকে হেফাজত করুন। আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاًبَعِيدًا
إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا

নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচছা, ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়। তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে। (৪:১১৬-১১৭)

২২৯
শয়তান মানুষকে দিয়ে কি কি কাজ করাতে চায়, তার একটা তালিকা আল্লাহ নীচের দুই আয়াতে দিয়েছেন। প্রথমেই শয়তান মানুষের ধন সম্পদ ও মালামাল থেকে একটা অংশ গ্রহণ করবে। আল্লাহ ছাড়া যা কিছু অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়, সেটাই শয়তানের অংশ। এর জাজ্জল্যমান উদাহরন হচ্ছে দেব দেবীর নামে ভোগ বা প্রসাদ, মানত, পশু বলি এবং নরবলি ইত্যাদী। আমাদের অনেকেই মাজার বা পীর সাহেবদের নামে যে সব নজর নেওয়াজ, পশু পাখী বা মানত দেয়, সেগুলিও শয়তানের অংশ ছাড়া কিছুই নহে। এ ছাড়াও শয়তান ধন যশ ও মানের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। সময় সময় নিজ সন্তানকে হত্যা করার জন্য প্ররোচিত করে। মানুষ পশু পাখীকে দেব দেবীর নামে কান কেটে চিহ্নিত করে, নিজ দেহকে উল্কি একে বিকৃত করে, এবং নানাভাবে রঙ ও পোষাকে নিজের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। এ সবই হচ্ছে শয়তানী কাজ। অবশ্য অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানু তা'লা মদ খাওয়া, জুয়া খেলা এবং লটারি খেলাকেও শয়তানী কাজ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের সমস্ত শয়তানী কাজ থেকে হেফাজত করুন। এরশাদ হচ্ছেঃ-

لَّعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَن يَتَّخِذِالشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, সেই শয়তান বললঃ আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। (৪:১১৮-১১৯)

২৩০
আল্লাহ এখানে আর একবার ঘোষণা দিচ্ছেন যে ইমান ও আমলের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষে কোন ভেদাভেদ নাই। বিচারের ক্ষেত্রে লিঙ্গ কোন বৈষম্য সৃষ্টি করবে না। তাদের প্রাপ্যে তিল পরিমাণ এদিক ওদিক করা হবে না। সেইরুপ, জাতী জাতীতে কোন বৈষম্য নাই, গোত্র গোত্রে কোন বৈষম্য নাই, আরব আজমীতে কোন বৈষম্য নাই, কালো ধলাতে কোন বৈষম্য নাই। বিচারের একমাত্র

মাপকাঠি হবে তাদের ইমান ও আমল। বিশ্বাসীদের বিন্দু পরিমান ভাল কাজকেও পুণ্য হিসাবে গ্রহন করা হবে এবং তার পুরস্কারও প্রদান করা হবে। আল্লাহ তালা এরশাদ করেনঃ

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না। (৪:১২৪)

২৩১

আল্লাহ তালা তাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহন করেছেন; তিনি আল্লাহর জন্য তার প্রথম সন্তানকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। নমরুদ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল - আল্লাহ তালা তাকে অলৌকিক ভাবে রক্ষা করেছিলেন। তিনি আমাদের পূর্ব পুরুষ; তিনিই আমাদের জাতীর পিতা। তিনি ইবরাহিম (আঃ) । আমরা তার ধর্মই অনুসরন করি। আল্লাহ তার ধর্মকেই উত্তম ধর্ম বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছেঃ-

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَخَلِيلاً

তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে,- যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন? আল্লাহ ইবরাহিমকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছেন। (৪:১২৫)

২৩২

এই সুরার ৩নং থেকে ৬নং আয়াতে এতিম মেয়ে ও শিশুদের সাথে কি রকম আচরন করতে হবে তার নির্দেশনা আল্লাহ দিয়েছেন। তাদের প্রতি যদি অবিচার করার ভয় থাকে তবে অবস্থা অনুযায়ী ঐ সব মেয়েদের থেকে বিয়ে করা অথবা তাদের অন্যত্র বিয়ে দেবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই বিয়ের সময়ও যেন ন্যায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। এতিম বলে মোহরানা কম দেওয়া যাবে না, অথবা সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যাবে বলে বিয়ে আটকিয়ে রাখাও যাবে না। একের অধিক বিবাহের জন্য একটি প্রধান শর্ত হলো সবার প্রতি সমান ইনসাফ করা। কিন্তু নীচের আয়াতে আল্লাহ বলেন যে ভালবাসা এবং ভাল লাগার ক্ষেত্রে এই সমতা বজায় রাখা মানুষের জন্য সম্ভব নহে। কোন এক স্ত্রীকে বেশী ভাল লাগতেই পারে। কারন এটা হৃদয়ের ব্যাপার। কিন্তু এটা যেন পার্থিব, সামাজিক ও জাগতিক ক্ষেত্রে প্রস্ফুট হয়ে না উঠে। সবাইকে সমান অধিকার দিতে হবে, সমান ভাবে বাড়ী-গাড়ী শাড়ী দিতে হবে, সপ্তাহের দিনগুলিকেও সমান ভাবে ভাগ করে দিতে হবে, সন্তানেরাও সমান অধিকার পাবে। তবে কোন কারনে যদি কোন স্ত্রী নিজের কিছু অধিকারকে ছাড় দিতে চাই তবে সেটা দোষের হবে না। স্ত্রী যদি অতি বৃদ্ধা হয় তবে সে সংসারের বহু কাজ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে সেই অধিকার অল্প বয়স্কাদের দিতে পারে। এ রকম উদাহরন হাদিসেও রয়েছে। আসল কথা হলো পার্থিব এবং জাগতিক ভাবে সবার সাথে সমান ব্যবহার করতে হবে, কোন একজনের দিকে অতিমাত্রায় ঝুকে পড়া যাবে না।

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

তোমরা কখনও নারীদের মধ্যে পূর্ণ সমতা রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙক্ষী হও তোমরা। অতএব, সম্পূর্ণ ঝুঁকেও পড়ো না একদিকে যে, অন্য জনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। যদি সংশোধন কর এবং খোদাভীরু হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৪:১২৯)

২৩৩

আমরা আগে তালাক সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছি। ইসলামে তালাককে চরম ঘৃনা করা হয়েছে। হাদিসে এসেছে, তালাক আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃনিত হালাল বস্তু। তা সত্ত্বেও তালাকের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কারন কোন কোন সময় পরিস্থিতি এমন পর্য্যায়ে পৌছে যায় যে শান্তি বজায় রাখার জন্য তালাক দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু শরীয়তের কোন কারন ছাড়া তালাক দেওয়া সমীচীন নহে। আমাদের সমাজে সাধারনত তালাক দেওয়ার অধিকার থাকে স্বামীদের। স্বামীরা এই অধিকার যত্রতত্র প্রয়োগ করতে চায়। কারন তারা মনে করে এই দেশে মেয়েরা বড় অসহায়, তারা পরাধীন, তালাক দিলে তারা ভাত-কাপড়ে মারা পড়বে। মেয়েরাও এই ভয়ে ভীত থাকে, কখন না জানি স্বামী তাকে তালাক দেয়, তাহলে তো তারা অথৈ পাথারে পড়বে। তাই তারা স্বামীর নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করেও দাত কামড়ে পড়ে থাকে। অবশ্য বেশীরভাগ সময়ই তারা সন্তানদের ভবিষ্যৎ ভেবে অস্থির হয়ে পড়ে। কিন্তু নীচের আয়াতে আল্লাহ বলেন, তোমরা যেটা চিন্তা করছ সেটা ঠিক নহে। তোমরা মনে করো না যে তালাক দিলেই স্ত্রী অথৈ পাথারে পড়বে, জীবনের সমস্ত অবলম্বন সে হারাবে। বরং যদি সত্যি সত্যিই তোমরা পৃথক হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের প্রত্যেকেরই অভাব পুরন করবেন, অকল্পনীয়ভাবে রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। স্ত্রী হয়তো আরো ভাল স্বামী পাবে, স্বামী হয়ত আরো ভাল স্ত্রী পাবে। এটা নারী পুরুষ দুই জনের জন্যই প্রযোজ্য। তাই তালাককে তোমরা ভয় দেখানোর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করো না। নিশ্চয়ই এটা একটা ঘৃনিত আচরন।

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

যদি উভয়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ স্বীয় প্রশস্ততা দ্বারা প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ সুপ্রশস্ত, প্রজ্ঞাময়। (৪:১৩০)

২৩৪

আমরা আল্লাহ তালার নির্দেশের প্রতি খুবই উদাসীন। আমরা কখনোই ভাবি না যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তার পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারেন এবং আমাদের স্থলে নতুন কোন জাতি নিয়ে আসতে পারেন যারা আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী চলবে। ইসলাম আসার আগেও অনেক জাতীকে ধ্বংস করে আল্লাহ নতুন জাতীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুসলমানদের জীবনেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। বাগদাদের খলীফারা যখন বিলাস ব্যসনে গা ভাসিয়ে দেয়, তখন ধর্মহীন মোঙ্গলীয়ানরা এশিয়ার উত্তরাংশ হতে এসে ইরান ও ভারতে ব্যাপক ধ্বংশ যজ্ঞ ও হত্যাকান্ড চালায়। কিন্তু আল্লাহ তা'লা ইসলামের প্রতি তাদের অন্তরকে রুজু করে দিলেন। ফলে তারা একাগ্র চিত্তে ইসলামের জন্য কাজ করেছেন। অন্য স্থানে সুরাহ মুহাম্মদের ৪৭ঃ৩৮ নম্বর আয়াতেও আল্লাহ তালা একই রকম কথা বলেছেন। এরশাদ করেনঃ

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا

হে মানবকূল, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারিত করে তোমাদের জায়গায় অন্য কাউকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। বস্তূত: আল্লাহর সে ক্ষমতা রয়েছে। (৪:১৩৩)

২৩৫

ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় বিচারক ও সাক্ষীদের ভুমিকা কেমন হবে তার বিস্তৃত নির্দেশনা আল্লাহ নীচের আয়াতে দিয়েছেন। শুধুমাত্র এই আয়াতই সমগ্র বিশ্বে ন্যায়ের শাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট হবে বলে আমরা নিশ্চিত। ইসলাম ন্যায় নীতিতে বিশ্বাসী। ইসলামী রাষ্ট্রে পক্ষপাতহীন ভাবে সকল লোকের উপর ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা হয়। বিচারকগন সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন ভাবে বিচার করবে। তার কাছে শত্রু মিত্র, আত্মীয় অনাত্মীয়, স্বধর্মী বিধর্মী, ধনী গরীব, দেশী বিদেশী, পিতা মাতা, ভাই বোন, সবাই সমান। বিচারকের কাছে তাদের শুধু একটাই পরিচয়, বাদী এবং বিবাদী। তাই ন্যায় বিচারকদের জন্য আল্লাহ মহা পুরুস্কার ঘোষণা করেছেন, হাশরের তপ্ত মরুভূমির মত আবহাওয়ায় তারা আল্লাহর আরশের ছায়ার নীচে যায়গা পাবেন। অন্যদিকে আল্লাহ তালা সাক্ষীদের প্রতিও মহা সাবধান বানী জারী করেছেন। যদি আপনাকে সাক্ষীর জন্য ডাকা হয় তবে আপনাকে অবশ্যই সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে হবে, যদিও তা আপনার নিজের বিরুদ্ধে অথবা আপনার মাতা-পিতা অথবা আপনার আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে যায়। আপনাকে সম্পূর্ন পক্ষপাতহীন ভাবে পূর্ন সত্য প্রকাশ করতে হবে। ভাষার কারসাজি করে বিচারককে বিভ্রান্ত করা যাবে না। । will tell the truth, the whole truth, and the only truth- এই শপথ বাক্য দৃঢ় ভাবে মেনে চলা সাক্ষীর জন্য ফরজ, ফরজ এবং ফরজ। আল্লাহ তালা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ إِنيَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَكَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায় সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্নীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ্ তাদের শুভাকাংখী তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম সমপর্কেই অবগত।(৪:১৩৫)

২৩৬

ছোট কালে আমরা ইমানে মুজাম্মিল ও ইমানে মুফাসসিল মুখস্ত করতাম অনেকটা না বুঝেই। তখন জানতাম না যে এগুলি কোরআন থেকেই নেওয়া হয়েছে। নীচের আয়াতটি দেখুন। অতি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে, কোন কোন বিষয়ের উপর ইমান বা বিশ্বাস রাখতেই হবে। এখানে পাচটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে যার প্রতিটিতে দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। সেগুলি হলো-- আল্লাহ, তার ফিরিশতাগন, তার রাসুলগন , কিতাব সমূহ এবং শেষ বিচার দিবস। যারা এর সবগুলিতেই বিশ্বাস করবে তারাই একমাত্র সঠিক পথের দিশা পাবে। এর একটিতেও যদি বিশ্বাসে ঘাটতি থাকে তবে সে পথ ভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। অনেক অবিশ্বাসীরাও কোরআনকে এক অতুলনীয় পুস্তক বলে মনে করে, মুহাম্মদ কে তারা বিশ্বের নাম্বার ওয়ান বলে মানে, ইসলামের বিধিবিধানকে স্বাস্থ্য সহায়ক বলে স্বীকার করে । কিন্তু যে মুহাম্মদের মুখ থেকে কোরআন বের হয়েছে তাকে তারা রাসুল বলে বিশ্বাস

করে না, কোরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে মানে না। এই খানেই তাদের পথ ভ্রষ্টতা, এটাই তাদের গোমরাহি। তাই আমাদের প্রয়োজন, উপরের পাচটি বিষয়ের প্রতি দৃঢ় একনিষ্ঠ অকপট বিশ্বাস।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রসূলের উপর এবং সেসমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাব সমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর ও কিয়ামতদিনের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে। (৪ঃ১৩৬)

২৩৭ .

অবিশ্বাসীদের কেন আমরা মিত্র ও অবিভাবক হিসাবে গ্রহন করছি? আমরা কেন মুসলিম দেশের চাইতে অমুসলিম দেশকে বড় বন্ধু বলে মনে করি । তারা কী আমাদের ক্ষমতা দেবে? তারা কী আপনাকে আপনার দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বানিয়ে দেবে? তারা কী সত্যিই আমাদের সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে বসাতে পারে? প্রকৃত পক্ষে সকল ক্ষমতা, সম্মান এবং ইজ্জত একমাত্র আল্লাহর হাতে। আমেরিকা ইরানের শাহ কে রক্ষা করতে পারে নি, রাশিয়া নজিবুল্লাহ কে বাচাতে পারে নি। সুকর্ণ-সুহারতের মত নেতারাও শেষ জীবনে লাঞ্ছিত হয়েছেন। আরো অনেক উদাহরণ আছে ইতিহাসের পাতায়। আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না, না শিক্ষা নিই কোরআন থেকে। এই ব্যাপারে এই সুরার ১৪৪ নম্বর আয়াতে আরো কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মহান আল্লাহ – "হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে আল্লাহর কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমান তুলে দিতে চাও ?" আর নীচের আয়াতে আল্লাহ আবার বলেনঃ

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا

যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য।।(৪:১৩৯)

২৩৮

মুনাফিকেরা থাকবে দোজখের সবচেয়ে নিম্ন স্তরে। তারাই সব চেয়ে বেশী শাস্তি পাবে। তাই আমাদের নিশ্চিত ভাবেই জানতে হবে কারা মুনাফিক। বাইরে থেকে বুঝা যায় না কে মুনাফিক, আর কে মুনাফিক নয়। কারন একজন মুনাফিকও নিজেকে ইমানদার বলে দাবী করে। তার পোষাক পরিচ্ছদ ইমানদারের মতই। মাথায় টুপি, মুখে দাড়ী। মসজিদে যায় ৫ ওয়াক্ত। এমনকি, জিহাদে যাবার জন্যও তৈরী। কিন্তু অন্তরে তার কপটতা। মনে তার সব সময় একই চিন্তা, কিভাবে ইসলামের ক্ষতি করা যায়, কিভাবে মুসলমানের অমঙ্গল করা যায়। মুসলমানদের গোপন খবরাখবর সে শত্রুদের কাছে পাচার করে, ইসলামের বিরুদ্ধে সে গোয়েন্দাগিরি করে, ইসলামের ভুল ধরার জন্যই সে কোরআন

হাদিস Study করে। আমরা অনেক সময় অন্যকে মুনাফিক বলে গালি দিই। এটা মোটেই ঠিক নহে। মানুষের ইমান উঠানামা করতে পারে। কিন্তু সে মুনাফিক নয় যতক্ষন না সে ইসলামের বিরুদ্ধে অন্তরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মিশন নিয়ে মুসলিম ছদ্ববেশে মাঠে নামে। শত্রুকে আমরা বাইরে থেকে সহজেই চিনতে পারি। কিন্তু মুনাফিককে চেনা খুবই কঠিন। তাই মুনাফিকের শাস্তিও খুবই কঠিন, নিম্নতম নরকে তার বাস।

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না। (৪ঃ১৪৫)

২৩৯
আগের আয়াতে মুনাফিকদের জন্য কঠিন শাস্তির সংবাদ দেওয়া হয়েছে, দোজখের সব চেয়ে নিম্ন স্তর। কিন্তু নীচের আয়াতে আল্লাহ তাদের জন্য এক মহা সুযোগও দিয়েছেন। মুনাফিকরা সব সময় মুসলমানদের সাথেই থাকে, একসাথে ধর্ম কর্ম করে, এক সাথে কিতাব শিক্ষা নেয়, জ্ঞানের আলোচনা করে। সুতরাং যে কোন সময় তাদের অন্তর ঘুরে যেতে পারে, ইসলামের ক্ষতি করতে এসে তারা ইসলামে মোহিত হতে পারে। এই সুযোগ নিয়ে তারা যদি তওবা করে , আর অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে নেয়, তবে মহান আল্লাহ তাদেরকে মুমিনদের সাথেই রাখবেন। মুমিনদের সাথেই তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাই মুনাফিক বলে কাউকে গালি দেওয়া যাবে না, মুনাফিক সন্দেহে কাউকে হত্যা করা যাবে না। কারন সত্যিকারের মুনাফিকও যে কোন সময় তওবা করে খাটি ইমানদার হয়ে যেতে পারে।

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

অবশ্য যারা তওবা করে নিয়েছে, নিজেদের অবস্থার সংস্কার করেছে এবং আল্লাহর পথকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর ফরমাবরদার হয়েছে, তারা থাকবে মুসলমানদেরই সাথে। বস্তুতঃ আল্লাহ শীঘ্রই ঈমানদারগণকে মহাপূণ্য দান করবেন। (৪ঃ১৪৬)

২৪০
কেউ যদি কোন মন্দ কাজ করে, কারো মধ্যে যদি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে, তবে সেটা প্রকাশ্যে আলাপ আলোচনা করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সুরাহ হুজুরাতের ১২ নম্বর আয়াতে একে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। তবে কারো প্রতি জুলুম করা হলে মজলুম এর প্রতিকার চাইতে পারে। সে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, সালিশের শরণাপন্ন হতে পারে, সরাসরি জালিমের কাছেও ক্ষতিপূরণ চাইতে পারে। এতে করে সমাজের অন্যরা সাবধান হয়ে যাবে। জালিম নিজেও সংশোধন হয়ে যেতে পারে। তবে অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়াকে আল্লাহ অধিক পছন্দ করেন। আমরা যদি মানুষকে ক্ষমা করি, তবে আল্লাহও আমাদের ক্ষমা করবেন।

لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا
إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا

আল্লাহ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ। তোমরা যদি সৎকাজ কর প্রকাশ্যভাবে কিংবা গোপনে অথবা যদি তোমরা আপরাধ ক্ষমা করে দাও, তবে জেনো, আল্লাহ নিজেও ক্ষমাকারী, মহাশক্তিশালী। (৪ঃ১৪৮-১৪৯)

২৪১
অনেকে মনে করে, যে কোন একটি ধর্ম পালন করলেই যথেষ্ট। অনেকে বলে, কিছু কিছু নবীকে বিশ্বাস করলেই চলবে। ইহুদীগন ইসা আঃকে নবী বলে মানে না, আমাদের রাসুলকেও মানে না তারা। আবার খৃস্টানরা মুহাম্মাদ সঃ কে নবী মানে না। আল্লাহ বলেন, এরা সবাই অবিশ্বাসী, এরা সবাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, এরা সবাই কাফের। বিশ্বাসী তো তারাই যারা সমস্ত নবী-রাসুলদের প্রতি সমান ভাবে ইমান রাখে। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সমস্ত নবী-রাসুলগন সমান, তাদের মাঝে কোন তারতম্য করা যাবে না। তাই এটা স্পষ্ট যে, বর্তমান যুগে শুধুমাত্র মুসলিমরাই জানা অজানা সমস্ত নবীদের উপর ইমান রাখে। আর এটা আমাদের ইমানের একটি অংশ।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً
أُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

যারা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী, তদুপরি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফের। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আযাব। (৪ঃ১৫০-১৫১)

২৪২ .
নীচের ৪টি আয়াত (১৫৬, ১৫৭, ১৫৮ ও ১৫৯) আমরা এক সাথে আলোচনা করতে চাই, কারন ইসা আঃ এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার জীবনের ৪টি ধারাবাহিক ঘটনা এই ৪টি আয়াতে ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতটি ইসা আঃ এর জন্মের বাপারে। আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে ইসা আঃ পিতা ছাড়াই জন্ম নিয়েছেন। ইহুদিরা এটা তো বিশ্বাস করেই না, বরং তারা মরিয়মের উপর এক জঘন্য অপবাদ আরোপ করে। এই কারনে আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদেরকে এক চরম শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আবার ইহুদীরা দাবী করে যে তারা ইসা আ; কে শুলে চড়িয়ে হত্যা করেছে। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'লা দৃঢ়তার সাথে ঘোষনা করেছেন যে, ইহুদিগণ তাকে হত্যা করতে পারেনি, তাকে শুলেও দিতে পারে নি। তাদের নিকট ঐ রকম মনে হয়েছিল মাত্র এবং তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাহলে ইসা আঃ এর কি হয়েছিল? পরে তাকে আর দেখা যায় নি, তার মৃতদেহও খুজে পাওয়া যায় নি। তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। ইসা আঃ এর জন্য এটাই কিন্তু শেষ নহে। এর পরে কি হবে, সেটা আল্লাহ বলেছেন চতুর্থ আয়াতে। ঈসা (আঃ) আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। সেই সময় ইসা আঃ এর স্বাভাবিক মৃত্যু হবার আগেই পৃথিবীর অবশিষ্ট সমস্ত ইহুদি-খ্রিস্টান ইসা আঃ এর হাতে বাইয়াত নিয়ে মুসলমান হয়ে যাবে। হাদিস এবং বাইবেলে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। আবির্ভাবের পর ঈসা আঃ অন্যান্য মুসলিমদের নিয়ে দজ্জাল বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করবেন । ঐ মহাযুদ্ধে অধিকাংশ ইহুদীদের মৃত্যু ঘটবে। সকল খৃষ্টান এবং বাকী ইহুদিগন ঈসা (আঃ) কে চাক্ষুষ দেখে এবং

তাঁর কথা শুনে তাঁকে বিশ্বাস করবে , তাঁর অধীনতা স্বীকার করবে , এবং তাঁর কথামত ইসলাম গ্রহন করবে। কোন খৃস্টান থাকবে না বলে পৃথিবী থেকে ক্রশ (Cross) অবলুপ্ত হবে এবং শুকুর খাওয়ার কেঊ থাকবে না বলে সকল শুকর হত্যা করা হবে। পৃথিবীতে অমুসলিম থাকবে না বলে জিজিয়া করের প্রশ্নই আসবে না। সারা বিশ্ব জুড়ে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ঈসা (আঃ) ৪০ বছর ধরে বিশ্ব শাসন করবেন। সম্ভবত তিনি নতুন প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের মহা সচিব হিসাবে পৃথিবী শাসন করবেন , কারন বাইবেলে তাঁকে 'রাজাদের রাজা' বলা হয়েছে। এরপর তিনি বিবাহ করবেন , সন্তানাদি হবে, এবং পরে তিনি স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু বরণ করবেন। তার মৃত্যুর আগেই পৃথিবীর সমস্ত ইহুদি ও খৃষ্টানগন তার হাতে মুসলমান হয়ে যাবে। আল্লাহতা'লা এরশাদ করেনঃ

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا
وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّالَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا
بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

আর তাদের কুফরী এবং মরিয়মের প্রতি মহা অপবাদ আরোপ করার কারণে। আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়মপুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল।অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল।বস্তুত: তারা এব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে আছে, শুধু মাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এবিষয়ে কোন খবরই রাখেনা। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ্তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ্ হচেছন মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাঁর (ঈসা) মৃত্যুর পূর্বে। আর কেয়ামতের দিন তিনি তাদের উপর সাক্ষী হবেন। (৪:১৫৬-১৫৯)

বিঃদ্রঃ
আমার উপরের বক্তব্যের সমর্থনে বোখারী শরীফের ৩৪৪৮ নম্বর হাদিসটির উল্লেখ করা যেতে পারে।
পরিচ্ছদঃ ৬০/৪৯. মারইয়াম পুত্র 'ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ।
৩৪৪৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে মারিয়ামের পুত্র 'ঈসা (আঃ) শাসক ও ন্যায় বিচারক হিসেবে আগমন করবেন। তিনি ক্রশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং তিনি যুদ্ধের সমাপ্তি টানবেন। তখন সম্পদের ঢেউ বয়ে চলবে। এমনকি কেউ তা গ্রহণ করতে চাইবে না। তখন আল্লাহকে একটি সিজ্দা করা তামাম দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সমস্ত সম্পদ হতে অধিক মূল্যবান বলে গণ্য হবে। অতঃপর আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এর সমর্থনে এ আয়াতটি পড়তে পারঃ ''কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তাঁর (ঈসা (আঃ)-এর) মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের উপর সাক্ষ্য দিবেন।'' (আন-নিসাঃ ১৫৯)

২৪৩
আমাদের মত ইহুদীদের জন্যও আল্লাহ সুদ গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন অজুহাতে ইহুদীরা এটা মানতেই চায় না। তাদের কেউ কেউ মনে করে, অইহুদীদের কাছ থেকে সুদ নেওয়া যাবে। তাই মধ্য যুগে সমস্ত ইউরোপে তারা একচেটিয়া সুদের ব্যবসা চালু করে। তারা এতই মশহুর ছিল যে বিভিন্ন নাটক নভেলে তাদের অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। তাছাড়া অন্যের ভুমি সম্পদ

অন্যায় ভাবে গ্রাস করাও তাদের এক পুরানো অভ্যাস। এমনকি বর্তমান যুগেও অন্যায় ভাবে তারা ফিলিস্তিনদের ভুমি দখল করে চলেছে। আল্লাহ বলেন, এজন্য তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ গ্রাস করতো অন্যায় ভাবে। বস্তুত; আমি কাফেরদের জন্য তৈরী করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব। (৪ঃ১৬১)

২৪৪

এ বিশ্বের সকল জাতি, সকল গোত্র, সকল দল উপ-দলের নিকট হেদায়েত প্রদানের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে রাসুলগন এসেছিলেন। তাঁদের সবার নাম আমরা জানি না। কোরআনে যেসব রাসুলের নাম উল্লেখ আছে- তাদের নামই আমরা শুধু জানি। কোরআনে সর্বমোট ২৫ জন নবীর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে সারা পৃথিবীতে সকল জাতীর কাছেই রাসুল এসেছিলেন যাতে কেউই এ অভিযোগ না করতে পারে যে আমাদের কোন পথ-প্রদর্শক ছিল না। তাই নবী রাসুলের মোট সংখ্যা লাখের ঘর ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই আয়াতেই আল্লাহ আর এক সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি সরাসরি মুসা আঃ এর সাথে কথোপকথন করেছেন এই পৃথিবীতেই। অনেকে বলেন, আল্লাহ আদম আঃ এবং মুহাম্মাদ সঃ এর সাথেও কথা বলেছেন। কিন্তু সেটা এই পৃথিবীতে ছিল না। আল্লাহ তা'লা বলেন

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا
رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

এ ছাড়া এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি ইতিপূর্বে এবং এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শোনাই নি। আর আল্লাহ মুসার সাথে কথোপকথন করেছেন সরাসরি। সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশীল, প্রাজ্ঞ।(৪;১৬৪-১৬৫)

২৪৫

নীচের আয়াতে আল্লাহ সমস্ত মানব জাতীকে সম্বোধন করে বক্তব্য দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হবে, জাতী ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানব মণ্ডলীর কাছে আল্লাহর এই আয়াত পৌছে দেওয়া। এই সুরার ১৭৪ নম্বর আয়াতেও আল্লাহ সমস্ত মানব জাতীকে ডাক দিয়েছেন। এই দুই আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,- তোমাদের কাছে সত্য এসে গেছে, তোমাদের কাছে প্রমান এসে গেছে, সত্য মিথ্যা পার্থক্যকারী নুর তোমাদের কাছে এসে গেছে। সুতরাং তোমরা এগুলি অনুসরণ করো, এগুলি আকড়িয়ে ধরো। এতেই তোমাদের কল্যাণ, এতেই তোমাদের মুক্তি। আর যদি তোমরা তা না করো, তবে তাতে আল্লাহর এতটুকু ক্ষতি হবে না। সুরাহ ইবরাহিমের ১৪ঃ৮ নম্বর আয়াতেও আল্লাহ

বলেছেন, তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ কাফের হয়ে যাও, তবুও আল্লাহ নিঃসন্দেহে অভাবমুক্ত ও সর্ব প্রশংসিত । হাদিসে কুদসিতেও এই ধরণের বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং, মানুষ বিশ্বাস করবে তার নিজের কল্যাণের জন্যই। আমাদের দায়ীত্ব আল্লাহর এই ঘোষনা সবার কাছে পৌছে দেওয়া। একে গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে মানুষ স্বাধীন।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

হে মানবজাতি! তোমাদের পালনকর্তার যথার্থ বাণী নিয়ে তোমাদের নিকট রসূল এসেছেন, তোমরা তা মেনে নাও যাতে তোমাদের কল্যাণ হতে পারে। আর যদি তোমরা তা না মান, জেনে রাখ আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবকিছুই আল্লাহর। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, প্রাজ্ঞ। (৪ঃ১৭০)

২৪৬

আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী খৃস্টানদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ নীচের আয়াতটি নাজিল করেছেন। ধর্মের ব্যাপারে তারা খুবই বাড়াবাড়ী করেছে এবং এটা করতে যেয়ে তারা আল্লাহর উপরও মিথ্যারোপ করেছে। পিতা ছাড়া কিভাবে ইসা আঃ এর জন্ম হলো, সেটা আল্লাহ এই আয়াতে বলেছেন, বাইবেলেও বলা হয়েছে। কিন্তু ইহুদীরা সেটা বিশ্বাস না করে মরিয়মকে অপবাদ দিয়েছে। এই অপবাদের উত্তর দিতে গিয়ে খৃস্টানরা এক ভ্রান্ত, মিথ্যা ও জঘন্য মতবাদ চালু করেছে। তারা বলে, আল্লাহ নিজেই ইসার পিতা। নাউজুবিল্লাহ। এই ভাবে তারা তিন খোদার তত্ত্ব চালু করেছে। তারা বলে, ইসা ক্রশে রক্ত দিয়ে সমস্ত খৃস্টানদের পাপ মোচন করেছেন। তারা বলে, মুসার শরিয়তের আর প্রয়োজন নাই। তারা বলে, যা ইচ্ছা তাই খাওয়া যাবে, হারাম হালাল বলে কিছু নাই। অথচ আমরা বাইবেল থেকেই প্রমাণ করতে পারি যে এগুলি বাইবেলে কোথাও নাই। মিঃ পল এবং তার অনুগামীরা পরবর্তী কালে এগুলি চালু করেছেন। অনেকেই আমাদের নিকট প্রশ্ন করেন যে আমরা কোরআনের পরিবর্তে কেন সময় সময় বাইবেল থেকে উদ্‌ধৃতি দিই ? কারন হোল, যখন আমরা খৃষ্টান বন্ধুদের সাথে কথা বলি তখন তাদের সঙ্গে তাদের ভাষায়ই কথা বলতে হয়। তারা তো কোরআন বিশ্বাস করে না। তাই আমরা বাইবেল থেকেই তাদের উত্তর দিই। যাহোক, কোরআনেও অনেক বারই তাদেরকে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে। এখন আমাদের কর্তব্য হলো ঐ আয়াতগুলো তাদের নিকট পৌছে দেয়া।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَرَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ خَيْرًالَّكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلَـهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِوَكِيلاً

হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলোনা। নিঃসন্দেহে মরিয়মপুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রূহ- তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহকে এবং তার রসূলগণকে মান্য কর। আর এ কথা বলোনা যে, আল্লাহ্ তিনের এক, একথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমান সমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তার। আর কর্মবিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।(৪:১৭১)

২৪৭
পৃথিবীর কোথাও এমন একজন খৃস্টানও পাওয়া যাবে না যে বলবে যে ইসা আঃ আল্লাহর বান্দা। হয় তারা বলবে, ইসা আঃ আল্লাহর পুত্র অথবা ইসা আঃ নিজেই আল্লাহ অথবা তিনি তিন খোদার একজন। আল্লাহ কোরআনের বিভিন্ন স্থানে খৃস্টানদের এই মিথ্যা দাবীকে কঠোর ভাবে খন্ডন করেছেন এবং একে কুফরি বলেছেন। কিন্তু ইসা আঃ নিজেকে আল্লাহর বান্দা বলতে কখনও লজ্জা বোধ করেন নি। এমনকি শিশু অবস্থায় দোলনায় শুয়ে ইসা আঃ যখন ইহুদিদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন, তখন তার প্রথম কথা ছিল-"সন্তান বললঃ আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন (১৯ঃ৩০)" । এ ছাড়াও কোরআনে আরো অনেক স্থানে উল্লেখ আছে যে ইসা আঃ নিজেকে আল্লাহর বান্দাই বলতেন। এবার খোদ বাইবেলে আসুন। বাইবেলের অনেক স্থানেও ইসা আঃ কে Servant of God বলে উল্লেখ করা হয়েছে। "The God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus." [Acts 3:13]. পিতর ছিলেন ইসা আঃ এর ১২ জন সাহাবীর একজন। তার ভাষ্য দেখুন- For Peter Jesus was nothing more than a servant of God. "When God raised up his servant, Jesus,...." [Acts 3:26]. এর পরেও খৃস্টানগন ইসা আঃ কে আল্লাহর বান্দা বলতে নারাজ। আল্লাহ বলেন, যারা অহংকার করবে তাদেরকে আল্লাহ নিজের কাছে সমবেত করবেন শাস্তি দেবার জন্য।

لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِّلّهِ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ جَمِيعًا

মসীহ আল্লাহর বান্দা হবেন, তাতে তার কোন লজ্জাবোধ নেই এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদেরও না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর দাসত্বে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার করবে, তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাছে সমবেত করবেন। (৪ঃ১৭২)

আল মায়েদাহ

২৪৮
সুরাহ আল মায়েদাহ, কোরআন মজিদের পঞ্চম সুরাহ এটি। হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে সপ্তম হিজরিতে এই সুরাহটি নাজিল হয়েছে বলে ধারনা করা হয়, কারন হজ্জ ও ওমরাহয়ের ব্যাপারে কিছু নির্দেশনা রয়েছে এই সুরাহতে। মুসলমানেরা মক্কায় ঢুকে হজ্জ ও ওমরাহ করার সুযোগ পায় কেবলমাত্র হোদায়বিয়ার সন্ধির পরেই। মায়েদা শব্দের অর্থ ট্রেতে সাজানো খাদ্য সামগ্রী। ইসা আঃ তার সাহাবীদের জন্য আসমান থেকে বেহেশ্তী খাবারের আবেদন করেছিলেন আল্লাহর কাছে। আবেদনে সাড়া দিয়ে আল্লাহ মায়েদা পাঠালেন আসমান থেকে (আয়াত ১১২)। এই মায়েদা থেকেই এই সুরাহর নামকরণ হয়েছে সুরাহ আল মায়েদাহ। সুরাহর প্রথমেই আল্লাহ মুমিনদের আহবান করে কিছু নির্দেশনা জারী করেছেন। প্রথম নির্দেশনা হচ্ছে অঙ্গীকার সমূহ পুরন করতে হবে। আল্লাহ হয়তো এখানে হোদায়বিয়া সন্ধির ধারাগুলির কথা মুমিনদের আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। অনেক

ধারা আপাতঃ দৃষ্টিতে পছন্দীয় না হলেও মুসলিমদের সেটা মানতে হবে। মুসলিমরা এখন হজ্জ ও ওমরাহ করতে পারবে। কিন্তু এহরাম বাধা অবস্থায় শিকার করতে পারবে না। অবশ্য অন্যান্য গৃহপালিত পশুগুলিকে হালাল করা হয়েছে। তাছাড়া বছরের চারটি মাসকে মহান আল্লাহ সম্মানিত মাস হিসাবে ঘোষনা দিয়েছেন। এই মাসগুলিতে যুদ্ধ বিগ্রহ করা হারাম। এই মাস গুলি হোল মহরম, রজব, জিল-ক্বাদ ও জিল-হাজ্জ। এ ছাড়াও কিছু কিছু জিনিসকে "আল্লাহর নিদর্শন" বলে ঘোষনা দেওয়া হয়েছে। হাজ্জ ও ওমরাহ্‌র উদ্দেশ্যে এহরাম পরিহিত মানুষ, কোরবানীর জন্য চিহ্নিত পশু, সাফা-মারওয়া পাহাড়, এগুলি হোল আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহর নিদর্শন গুলিকে কখনও অসম্মান করা যাবে না। তাছাড়া, সৎ কর্মগুলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে একে অপরের সাহায্য সহযোগীতা করা উচিৎ? তাহলে ঐ কর্মের পূন্যের অংশ আমরাও পাব। কিন্তু পাপ, অত্যাচার, উৎপীড়নে কখনোই সহযোগীতা করা যাবে না। এটি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'লার নির্দেশ। আমরা তার নির্দেশ না মেনে চললে নিশ্চিত রূপেই কঠিন আযাবের মুখোমুখি হতে হবে। আল্লাহ তা'লা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَالْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِوَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ন কর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, যা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে তা ব্যতীত। কিন্তু এহরাম বাধাঁ অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ দেন। হে মুমিনগণ! অসম্মান করোনা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ এবং সম্মানিত মাস সমূহকে এবং হরমে কুরবানীর জন্যে নির্দিষ্ট জন্তুকে এবং ঐ সব জন্তুকে, যাদের গলায় কন্ঠাভরণ রয়েছে এবং ঐ সব লোককে যারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচেছ, যারা স্বীয় পালন কর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। যখন তোমরা এহরাম থেকে বের হয়ে আস, তখন শিকার কর। যারা পবিত্র মসজিদ থেকে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিল, সেই সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমা লংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও খোদা ভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমা লংঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তি দাতা। (৫:১-২)

২৪৯

বিদায় হজ্জের আরাফার দিনে যখন নিম্নের আয়াতটি আল্লাহর রাসুলের উপর নাজিল হয়, তখন মদিনার ইহুদীরা বলেছিল , " আমাদের উপর এ রকম এক আয়াত যদি আল্লাহ অবতীর্ণ করতেন তবে সেই দিনকে আমরা মহা ঈদের দিন হিসাবে ঘোষনা করতাম "। এই দিনটি সত্যিই মহা আনন্দের দিন ছিল মুসলমানদের জন্য। কারণ এই দিনের এই আয়াতে মহান আল্লাহ ইসলামকে পূর্নাঙ্গ বলে ঘোষনা দিয়েছেন, আমাদের উপর তার দয়া ও রহমতকে পরিপূর্ন করেছেন এবং ইসলামকে আমাদের একমাত্র জীবন বিধান হিসাবে মনোনীত করেছেন। সেই সাথে আল্লাহ বলেছেন- কাফেরদের আর ভয় করার কোন কারন নেই, কেন না তারা ইসলামকে পরাজিত করার বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে। তা ছাড়া, এই আয়াতের প্রথম দিকে আল্লাহ আমাদের জন্য কি কি খাওয়া হারাম, তার একটা দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। হালাল পশুও আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে যদি সেটা মৃত হয়, যদি সেটা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যদি সেটা শ্বাসরোধে মারা যায়, যদি সেটা কোন আঘাতে বা শিংয়ের গুতায় বা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়। হিংস্র জন্তুর খাওয়া পশুর অবশিষ্টাংশও হারাম হবে আমাদের জন্য। তাছাড়া পুজার বেদীতে বলি দেওয়া পশুও খাওয়া হারাম। এরকম নির্দেশনা সুরাহ বাকারার ১৭৩ নম্বর আয়াতেও রয়েছে। মানুষের জন্য আল্লাহ প্রেরিত

শেষ খাদ্যবিধান বিস্তৃত ভাবে আমরা ঐ আয়াতে আলোচনা করেছি।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কন্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যা, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করেছ। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়। এসব গোনাহর কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব যে ব্যাক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল। (৫:৩)

২৫০

আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদি খৃস্টানদের দুইটি জিনিস আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এর একটা হলো তাদের খাদ্য এবং অন্যটি তাদের সতী নারী। খাদ্য বলতে তৌরাত ও ইনজিলে যে খাদ্যবিধান দেওয়া হয়েছে সেটাই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তারা বিশেষ করে খৃষ্টানরা এই বিধান মোটেই মানে না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। জবেহ করার পরিবর্তে তারা মেশিন ব্যবহার করে। মাথায় আঘাত করে পশুকে অজ্ঞান করে দেয়, তারপর মেশিনে ঢুকিয়ে মাংস Process করে। এক ফোটা রক্তও দেহ থেকে বেরুতে পারে না। আমরা জানি, রক্ত আমাদের জন্য হারাম। কিন্তু তারা মাংসের সাথে সাথে এই সব রক্তও ভক্ষণ করে। খাদ্য selection এর ব্যাপারেও তারা কোন নিয়ম নীতি মানে না। কুকুর শিয়াল বিড়াল থেকে আরম্ভ করে বাদুর বানর শূকর কিছুই তাদের খাদ্য তালিকা থেকে বাদ পড়ে না। "যা মুখ দিয়ে প্রবেশ করে, তা পাকস্থলী হয়ে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়"- বাইবেলের এই বাক্যের অপব্যাখ্যা করে তারা সব কিছুকে খাওয়া হালাল করে নিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে বর্তমানে খৃস্টানদের কোন খাদ্যই হালাল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। ইহুদীরা এই ব্যাপারে সত্যের অনেক কাছাকাছি রয়েছে। এর পর আসে তাদের নারীদের কথা। তাদের নারীকে বিবাহ করা আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। কিন্তু শর্ত আছে, সেই মহিলা সতী সাধ্বী হতে হবে। বিয়ের পরেও দেখতে হবে যেন আমাদের ইমান আকিদা অটুট থাকে। বরং চেষ্টা করতে হবে যেন সেই মহিলা সঠিক পথের সন্ধান পায়।

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হল। আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। তোমাদের জন্যে হালাল সতী-সাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারী, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর তাদেরকে স্ত্রী করার জন্যে, কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে কিংবা গুপ্ত প্রেমে

লিপ্ত হওয়ার জন্যে নয়। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৫ঃ৫)

২৫১

উপরের ৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ ঘোষনা দিয়েছেন যে তিনি আমাদের জন্য তার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। কিভাবে সেটা করেছেন, নিচের আয়াতটি তার একটি বড় উদাহরণ। প্রথমেই এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে কিভাবে পানি দিয়ে অজু করে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। আর যদি শরীর নাপাক থাকে তবে গোসল করতে হবে। কিন্তু যদি পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি না পাওয়া যায় অথবা যদি অসুস্থ শরীরে পানি ব্যবহার রোগ বৃদ্ধির কারন হয়, তাহলে কি হবে? তাহলে কি পবিত্রতা অর্জন করা যাবে না? এ অবস্থায় মহান আল্লাহ আমাদের উপর এক মহা অনুগ্রহ করেছেন । তিনি এসব ক্ষেত্রে পরিস্কার মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের বিধান রেখেছেন আমাদের জন্য। মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে হবে। এতে পানি ছাড়াই আমরা পবিত্রতা অর্জন করতে পারব। আমাদের উপর আল্লাহর কি অসীম দয়া। এ ধরনের ছাড় দেওয়া আপনি অন্য কোন ধর্মে পাবেন কি? আমাদের প্রতি আল্লাহর এই অপরিসীম দয়ার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎ। এরশাদ হচ্ছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْبِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءأَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْوَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْتَشْكُرُونَ

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্যে উঠ, তখন স্বীয় মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর । অতঃপর মাথা মসেহ কর এবং পদ যুগল গিটসহ। যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও, অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রসাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অত:পর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও -অর্থাৎ, স্বীয় মুখ-মন্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান- যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৫:৬)

২৫২

সমাজের সর্বস্তরে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করা ইসলামি শাসন ব্যবস্থার এক প্রধান উদ্দেশ্য । ন্যায়নিষ্ঠ হোন, ন্যায় বিচার করুন, সঠিক সাক্ষ্য প্রদান করুন, ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করুন। এটাই হচ্ছে নীচের আয়াতের মুল বক্তব্য। আপনি হয়তো ব্যক্তিগত ভাবে কাউকে ঘৃণা করেন। কিন্তু সেই ঘৃণা যেন আপনার বিচারকে প্রভাবিত না করে। আপনি যখন কোন মামলার রায় দেবেন তখন আপনি তা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দেবেন। আপনি যখন কোন সাক্ষ্য দিবেন তখন সেটা পরিপূর্ণ সত্য হতে হবে, কোন কিছু গোপন করা যাবে না, সত্যের অপলাপ করা যাবে না, সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা যাবে না। এ ব্যাপারে আগেও আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْاعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর, এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত। ।(৫:৮)

২৫৩

ইয়াকুব আঃ এর সময় থেকেই বনি ইসরাইল জাতির মধ্যে ১২টি গোত্রের উদ্ভব হয়। ইয়াকুব আঃ এর ১২টি সন্তান ছিলেন। এই ১২ সন্তান থেকেই ১২টি গোত্রের সুত্রপাত। মুসা আঃ ১২টি গোত্রের জন্য ১২ জন নেতা নির্ধারন করে দেন। এমনকি তাদের জন্য আলাদা কুপের ব্যবস্থা করেন, আলাদা এলাকা নির্ধারন করেন। এ ব্যাপারে তৌরাতে বিস্তৃত বলা হয়েছে। এই সময় আল্লাহ মুসা আঃ এর মাধ্যমে বনি ইসরাইলদের কাছ থেকে কিছু অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি গ্রহন করেন। নামাজ, জাকাত, সাদাকাহ ছাড়াও এই অঙ্গীকারের মধ্যে অন্যতম ছিল পরবর্ত্তী সমস্ত রাসুলগনকে বিশ্বাস করা এবং তাদের সাহায্য করা। বনি ইসরাইলগন তাদের এই অঙ্গীকার রক্ষা করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। বিশেষ করে পরবর্ত্তী নবীগনকে সাহায্য করা তো দুরের কথা, তারা নবীদেরকে একের পর এক হত্যা করতে থাকে। এর পরিনাম অবশ্য তাদের জন্য ভয়াবহ ছিল। পরবর্ত্তী আয়াতে এ সম্বন্ধে আরো বিস্তৃত বর্ননা আছে।

وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ

আল্লাহ বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ বলে দিলেনঃ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দিতে থাক, আমার পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাঁদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম পন্থায় ঋন দিতে থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গোনাহ দুর করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে উদ্যান সমূহে প্রবিষ্ট করব, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এরপরও কাফের হয়, সে নিশ্চিতই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। (৫:১২)

২৫৪

ইসরাইলগন আল্লাহর সাথে কৃত প্রায় সব অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। শুধু তাই নয়, তারা তৌরাতের মধ্যেও নিজেদের তুচ্ছ স্বার্থের জন্য অনেক বাক্যের পরিবর্তন করেছে। অনেক নবীদের তারা হত্যা করেছে। এই সব কারনেই আল্লাহ তাদের উপর লানত করেছেন, তাদেরকে অভিসম্পাত দিয়েছেন। তারা এক গজবপ্রাপ্ত জাতী হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যাযাবরের মতো বিচরন করেছে। সুলাইমান আঃ এর বিশাল সাম্রাজ্য তারা হারিয়েছে। জেরুজালেমের মসজিদ ধ্বংস করে সমস্ত জাতীকে বন্দী করে ব্যবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দুই শত বছরের বন্দী জীবনের পরে আল্লাহ তাদের মুক্তি দেন। কিন্তু এর পরেও তাদের গজব কাটেনি। এমন কি মধ্য যুগেও বনি ইসরাইলগন রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর তারা ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের লোভ লালসা আর হঠকারিতায় অতিষ্ঠ হয়ে অতি নিকট অতীতেও জার্মানীর হিটলার তার দেশ থেকে ইহুদীদের নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করে। বর্ত্তমানে ইহুদীগন আবার ফিলিস্তিনে একত্রিত

হয়েছে। কিন্তু তাদের চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয় নি। এবার হয়তো তারা তাদের সেই অমোঘ শেষ পরিনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যার ভবিষ্যৎবানী বাইবেলে রয়েছে, যা হাদিসেও রয়েছে।

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অতএব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে উপকার লাভ করার বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছে। আপনি সর্বদা তাদের কোন না কোন প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন, তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া। অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন। (৫:১৩)

২৫৫

ইহুদীদের মত খৃষ্টানদের কাছ থেকেও আল্লাহ একই রকম অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কিন্তু তারাও ইহুদীদের মতই তাদের আঙ্গীকার রক্ষা করতে পারে নি। তারাও তাদের কিতাবে পরিশোধন, পরিবর্ত্তন, পরিমার্জন, সংশোধন ও সংযোজন করেছে। এমন কি নিকট অতীতেও তারা বাইবেলকে নতুন ভাবে Editing করেছে। তাছাড়াও তারা তাদের Original বাইবেলকে হারিয়ে ফেলেছে। এখন যা আছে সেটা হলো অনুবাদ, তস্য অনুবাদ, তস্য তস্য অনুবাদ। আর এ সব অনুবাদের সময় ভাব ও ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। ইসলাম আসার পরে বাইবেলকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে শেষ নবী আসার সমস্ত বর্ননাগুলি বাইবেল থেকে নিশ্চিহ্ন করা অথবা তার অপব্যাখ্যা করা যায়। তাই সাধারন খৃষ্টানেরা বর্ত্তমান বাইবেল পড়ে বুঝতেই পারবে না যে সেখানে ইসলামের নবীর আগমনের কথা বলা হয়েছে। এই সব কারনে আল্লাহ তাদেরকে পথভ্রষ্ট বলে ঘোষনা দিয়েছেন এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত তারা একে অপরের শত্রু হয়ে থাকবে। অবশ্য ইহুদীদের চেয়ে তারা অনেক নমনীয় পর্য্যায়ে রয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ জানিয়েছেন, ইহুদী ও মুশরিকগন ইসলামের প্রথম পর্য্যায়ের শত্রু, আর খৃষ্টানগন রয়েছে দ্বিতীয় পর্য্যায়ে। আল্লাহ তাদের সবাইকে হেদায়াত দান করুন।

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ

যারা বলেঃ আমরা নাছারা, আমি তাদের কাছ থেকেও তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। অতঃপর তারাও যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল, তা থেকে উপকার লাভ করা ভুলে গেল। অতঃপর আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। (৫:১৪)

২৫৬

অনেক খৃষ্টান বিশ্বাস করেন যে যীশুই ঈশ্বর। নিশ্চিত ভাবেই এটা শিরক্।আল্লাহ তা'লা খুবই কঠোর ভাষায় তাদেরকে সাবধান করেছেন এবং তাদেরকে কাফের নামে আখ্যায়িত করেছেন। এই সুরার ৭২ নম্বর আয়াতেও আল্লাহ একই কথা বলেছেন। বাইবেলেও এই ধরনের কোন কথা নাই যেখানে ইসা আঃ কে আল্লাহ বলা হয়েছে। বরং ইসা আঃ নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনিই আমার আল্লাহ এবং

তোমাদের আল্লাহ। John 20:17- Jesus said –" I am going up to Him who is my God & your God"। তাই আল্লাহ ধমক দিয়ে বলেছেন, আল্লাহ তা'লা যদি যীশু ও তার মাতা সহ এই মহা বিশ্বকে ধ্বংশ করতে চান, তবে কেউ কি তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? কোরআনে এরশাদ হচ্ছেঃ

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُمَا يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে, মসীহ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ্। আপনি জিজ্ঞেস করুন, যদি তাই হয়, তবে বল যদি আল্লাহ মসীহ ইবনে মরিয়ম, তাঁর জননী এবং ভূমন্ডলে যারা আছে, তাদের সবাইকে ধ্বংস করতে চান, তবে এমন কারও সাধ্য আছে কি যে আল্লাহর কাছ থেকে তাদেরকে বিন্দু মাত্রও বাঁচাতে পারে? নভোমন্ডল, ভুমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, সবকিছুর উপর আল্লাহ তা'আলার আধিপত্য। তিনি যা ইচছা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান।(৫ঃ১৭)

২৫৭
আল্লাহ সুবহানু তা'লা সব সময় মুসা আঃ এর সাথে সরাসরি কথা বলতেন এবং সেগুলি ইহুদীগন প্রত্যক্ষ করতো । এ ছাড়াও অনেক মোজেজা তাদের চোখের সামনে ঘটেছে। সাগরের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাদের জন্য পথ বানিয়ে দিয়েছেন। পাথরের মাঝ থেকে তাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করেছেন। মরুভূমির তপ্ত রোদে তাদের উপর মেঘের ছায়া থাকত। বিরান প্রান্তরে মান্না সালওয়া নাজিল হতো তাদের খাদ্য হিসাবে। এত কিছুর পরেও তারা আল্লাহ তা'লার সরাসরি আদেশ অমান্য করেছে একের পর এক। আল্লাহ তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন একটি নির্ধারিত নগরীতে প্রবেশ ও তথাকার অধিবাসীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে। তারা খুবই উদ্ধত ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নবীকে বলেছিল -"আপনি ও আপনার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করুন"। কি উদ্ধত্য তাদের!! আল্লাহর সরাসরি নির্দেশের প্রতি অন্য কেউ এরকম উদ্ধত্য ও অবাধ্যতা প্রকাশ করতে সাহস পাবে না। কিন্তু ইহুদী জাতীর এটা মজ্জাগত অভ্যাস।

.

قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُون

তারা বলল: হে মূসা, আমরা জীবনেও কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম।(৫:২৪)

২৫৮
আল্লাহ বললেন, এই নগরীতে প্রবেশ করো। ইহুদীরা মুসা আঃ কে বলল, আপনি ও আপনার আল্লাহ যেয়ে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানে বসলাম। নগরীতে প্রবেশ করার আদেশ সরাসরি অমান্য করা এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশের জন্য আল্লাহ তা'লা ইহুদিদের কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন। ৪০ বছর পর্যন্ত তারা তাদের বাসভুমি পায় নি। তীহ প্রান্তরে উদ্ভ্রান্তের মত তারা ঘুরে বেড়িয়েছে। অবশ্য এই বিপদের দিনেও আল্লাহ তাদের সাহায্য করেছেন। মান্না সালওয়া দিয়েছেন আসমান থেকে, মেঘের ছায়া দিয়েছেন অবিরাম, পানির ব্যবস্থা করেছেন ১২টি গোত্রের জন্য। আল্লাহর ফায়সালা ছিল, ২০ বছরের

উপরে যাদের বয়স তাদের সবার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ইহুদিরা এই অভিশাপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। মুসা (আঃ) এবং অন্যান্য বয়োজোষ্ট ব্যক্তিদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত মরু ভুমির মধ্যে অসহায় অবস্থায় ৪০ বছর তাদের ঘুরে বেড়াতে হয়। এর পরেই তারা বায়তুল মুকাদ্দাসে ঢোকার অধিকার পায়। বর্তমান যুগে আমাদেরও গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে কেন আমাদের মধ্যেও অনেককে নিজ গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে আজ অসহায় দিশাহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। কোথায় আমাদের অবাধ্যতা???

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

বললেনঃ এদেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্যে হারাম করা হল। তারা ভুপৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। অতএব, আপনি অবাধ্য সমপ্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না। (৫:২৬)

২৫৯

এই আয়াত এবং এর আগের পরের কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ আদম আঃ প্রথম সন্তান কাবিল ও হাবিলের কাহিনী বর্ননা করেছেন। কোন এক কারনে হাবিল ও কাবিল আল্লাহর দরবারে কোরবানী পেশ করলেন। হাবিলের ছিল একটি দুম্বা এবং কাবিলের ছিল কিছু শষ্য। আসমান থেকে আগুন এসে হাবিলের কোরবানী জ্বালিয়ে দিল, অর্থ্যাৎ তার কোরবানী কবুল হয়েছে। কিন্তু কাবিলের শষ্যগুলি অক্ষত রইলো। এতে কাবিল ক্ষিপ্ত হয়ে হাবিলকে হত্যা করতে চাইলো। এবং এক পর্য্যায়ে সে হাবিলকে হত্যা করে ফেললো। পৃথিবীর প্রথম নরহত্যা এবং ভ্রাতৃ হত্যার ঘটনা ঘঠলো। অনেকের মতে এই হত্যা কান্ড ছিল নারী ঘটিত। যাহোক, হাবিলের মৃতদেহ নিয়ে কাবিল মহা বিপদে পড়লো। পরে দুইটি কাক এসে দেখিয়ে দিলো কিভাবে মৃতদেহ দাফন করতে হয়। অন্যায়ভাবে নরহত্যার পথ প্রদর্শক ছিল আদম আঃ এর প্রথম ছেলে এই কাবিল। বোখারী ও মুসলিমের হাদিসে এসেছে, পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে যত হত্যাকান্ড ঘটবে তার খুনের বোঝা আদমের এই প্রথম সন্তানের উপর পতিত হবে। কেননা সেইই প্রথম এই ভূপৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে রক্ত বইয়েছিল। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই জঘন্য পাপ থেকে হেফাজত করুন।

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অতঃপর তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্‌বুদ্ধ করল। অনন্তর সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (৫:৩০)

২৬০

অন্যায়ভাবে নরহত্যা যে মহাপাপ, আল্লাহ বার বার আমাদের একথা জানিয়ে দিয়েছেন কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে। এর আগেও আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। নীচের আয়াতে বনি ইসরাইলদের জন্য আল্লাহ যে বিধান দিয়েছিলেন, তারই বর্ননা রয়েছে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে খুন করলো, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করলো। আবার কেউ যদি একজন মানুষের প্রাণ রক্ষা করে, তবে সে যেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো। তাই দেখা যাচ্ছে, নরহত্যা যেমন মহাপাপ, কারো প্রাণ রক্ষা করাও তেমনি মহা পুন্য। পৃথিবীতে এই দুই ধরনের লোকই আছে। যেমন Serial killer এর অস্তিত্ব আছে বিভিন্ন দেশে, তেমনি অনেক উদাহরন আছে

যেখানে মানুষ নিজের জীবন বিপন্ন করে অন্যকে বাচিয়েছেন। নীচের আয়াতে বর্নিত বিধানটি যদিও বনি ইসরাইরদের জন্য ছিল, তবুও এটা সার্বিকভাবে আমাদের জন্যও প্রযোজ্য। ইসলামেও অন্যায়ভাবে হত্যা করা এক মহা অপরাধ। আল্লাহ এই সব খুনিদের দিকে তাকাবেন না, তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের স্থান হবে একমাত্র জাহান্নামে।

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

এ কারণেই আমি বনী-ইসলাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে। (৫:৩২)

২৬১

এই আয়াতে ওয়াসিলাহ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়াসিলাহ শব্দটির অর্থ হচ্ছে কাছে যাওয়ার উপায় অথবা নৈকট্য লাভের উপায়। যেসব কাজ করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, যা করলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়, যা করলে আল্লাহ্ রাজি খুশি হন, সেগুলি সবই ওয়াসিলাহ, সেগুলি সবই আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। আর এই নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম উপায় কি, সেটাও আল্লাহ এই আয়াতে বলে দিয়েছেন। সেটা হোল আল্লাহর পথে জ্বিহাদ করা। অথচ অনেকেই এ শব্দটির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দেন। তাদের মতে ওয়াসিলাহ হচ্ছে পীর, দরবেশ অথবা ওলী আল্লাহ এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে পৌছানো। পীর দরবেশ ছাড়া কেউ আল্লাহকে পাবে না। তাদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট পৌছাতে হবে। এ ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ন রূপে ভুল।ওয়াসিলাহ শব্দটির প্রকৃত অর্থ 'আল্লাহ প্রাপ্তির জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা, অর্থাৎ সকল ধরনের ইবাদত এবং ভাল আমল করা। আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও। (৫:৩৫)

২৬২

আপনি একজন অতিশয় ধনাঢ্য ব্যক্তি। কিন্তু আপনি কী আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস করেন? যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে আপনার রাশি রাশি ধন সম্পদ শেষ বিচারের দিনে আপনাকে কোন সহায়তা করতে পারবে না। আপনি যদি পৃথিবীর সকল সম্পদ জড়ো করেন এবং সেগুলো আপনার পাপের বিনিময়ে প্রদান করতে চান - তা কখনোই গ্রহন করা হবে না। আপনাকে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ বলবেন, পৃথিবীতে এর চেয়ে অনেক কম তোমাদের কাছে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করে তা দাওনি, তোমরা নবী রাসুলদের কথার কোন পরোয়াই করনি। সুতরাং জাহান্নামই তোমাদের স্থান।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যারা কাফের, যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ আরও তদনুরূপ সম্পদ থাকে আর এগুলো বিনিময়ে দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রান পেতে চায়, তবুও তাদের কাছ থেকে তা কবুল করা হবে না। তাদের জন্যে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (৫:৩৬)

২৬৩

মানুষ দোজখ থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তারা তা পারবে না। কেন পারবে না, সে সম্বন্ধে নানা ধরনের গল্প আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কেউ বলেন, সেখানে কড়া পাহাড়া থাকবে, অনেকটা জেল খানার মত। কেউ বের হতে চাইলে প্রহরি ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেবে। আমাদের চিন্তার সীমাবদ্ধতা আছে। এর বেশী চিন্তা আমরা করতে পারি না। কিন্তু ব্যাপারটা এ রকম নয়। দোজখও বিশাল পৃথিবীর মত অনেকগুলি গ্রহ। সেখানে নদী-পুকুর আছে, পাহাড়-পর্বত আছে, এমনকি জাক্কুমের মত গাছও আছে। কিন্তু সব খানেই অসহনীয় পরিবেশ। নদীর পানি গরম, পুকুরের পানি ফুটন্ত, ঝর্নার ধারাও তপ্ত, পাহাড়-পর্বতও সর্বদায় লাভা উদগিরন করছে, বৃষ্টি হবে গরম পানির। স্বভাবতই এখান থেকে মানুষ পালাতে চাইবে। কিন্তু পারবে না। কারন আমরা কি ইচ্ছা করলেই এই গ্রহ থেকে পালিয়ে অন্য গ্রহে আশ্রয় নিতে পারি? এর জন্য লাগবে রকেট ইঞ্জিন, মহাকাশ যান এবং সাথে Navigational facilities । দোজখের মানুষের জন্য সেই সব সুবিধা থাকবে না। কোথাও যেতে হলে তাদের পায়ে হেটেই যেতে হবে। আবার ঐ গ্রহের যদি Gravitational farce অনেক বেশী হয়, তবে মানুষ খাড়া হয়ে হাটতেও পারবে না। তাকে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে। তাই আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্য ছাড়া কেউ দোজখ থেকে বেরুতে পারবে না।

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

তারা দোযখের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না। তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। (৫:৩৭)

২৬৪

ইসলামী দন্ডবিধির একটি বিধান হলো চোরের হাত কেটে দেওয়া। এটা অবশ্য সর্বোচ্চ শাস্তি। আসলে দন্ডবিধিতে যে শাস্তির উল্লেখ থাকে, সেটা সর্বোচ্চ শাস্তি। বাংলাদেশ পেনাল কোডের জন্যও এটা প্রযোজ্য। মহামান্য হাকিম সব কিছু বিচার বিবেচনা করে, সর্বোচ্চ শাস্তি বা তার কম যে কোন শাস্তি দিতে পারেন। বিচারের সময় দেখা হয় আসামীর বয়স, সামাজিক পরিবেশ, দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ, সম্পদ রক্ষনাবেক্ষন ব্যবস্থা, আসামী কি এই অপরাধে অভ্যস্থ না এটা তার প্রথাম অপরাধ, ইত্যাদী অনেক কিছু বিবেচনা করা হয়। খোলা মাঠে পড়ে থাকা একটি বস্তু চুরি করা আর ঘরে সিদ কেটে চুরি করার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। বিচারের সময় এগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিবেচনা করা হয়। তাই একই অপরাধের জন্য দুইজন অপরাধী দুই রকম শাস্তি পেতে পারে। তাই বিচারের দায়ীত্ব বিশাল। সুক্ষ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিবেক দ্বারা বিচারককে বুঝতে হয় অপরাধীকে কতটুকু শাস্তি দেওয়া হবে। আসলে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া বড়ই কঠিন। তাই আইনের মূল মন্ত্র হচ্ছে, ৯৯ জন অপরাধী ছাড়া পাক, কিন্তু একজন নির্দোষ ব্যক্তিও যেন সাজা না পাই।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। (৫:৩৮)

২৬৫
তৌরাতে কিসাসের বিধান কিভাবে এসেছে তা বিস্তৃত ভাবে আল্লাহ সুবহানু তালা বর্ণনা করেছেন নীচের আয়াতে। প্রানের বিনিময়ে প্রান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, ইত্যাকার সব কিছুর বদলেই সমান বদলা নেওয়া যাবে। খুবই কড়াকড়ি ভাবে এই আইন বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সামান্যতম ছাড় দেওয়া বা ক্ষমা করার কোন স্কোপ নাই সেখানে। Leviticus 24:17---Anyone who takes the life of a human being is to be put to death. আবার বলা হয়েছে, Deuteronomy 19:19-21---- Show no pity: life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. কিন্তু ইহুদীগন এখানেও বিভিন্ন রকম তালবাহানা শুরু করে। গোত্র ভেদে তারা শাস্তির তারতম্য ঘটাতে থাকে। কোন কোন মর্যাদাপূর্ণ গোত্রের জন্য তারা কম শাস্তি বরাদ্দ করে। এতে সমাজে বিভিন্ন রকম অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এর আগের আয়াতেও আল্লাহ তাদের এই সব দুষ্কৃতির কথা বর্ণনা করেছেন। মুল কথা, তৌরাতের তোয়াক্কা না করে ইহুদিগন তাদের খেয়াল খুশী মত আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার শুরু করে, অনেক সময় টাকা পয়সার বিনিময়ে। এখানে উল্লেখ্য যে এর আগে সুরাহ বাকারার ১৭৮ নম্বর আয়াতে ইসলামিক কেসাস সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

আমি এ গ্রন্থে (তৌরাতে) তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখম সমূহের বিনিময়ে সমান যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ থেকে পাক হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই জালেম। (৫ঃ৪৫)

২৬৬ .
দ্বীনের ব্যাপারে খৃস্টানদের অবস্থা ইহুদীদের চেয়েও খারাপ। ইসা আঃ কে পাঠানো হয়েছিল প্রধানতঃ দুইটি কাজের জন্য। তৌরাত কিতাবের সত্যায়ন করা এবং শেষ নবী আগমনের সুসংবাদ দেওয়া। কিন্তু বর্তমান খৃস্টান জগত এই দুইটি বিষয় থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। ইসা আঃ এর কোন বিধানই তারা মানে না। তারা অনুসরণ করছে মিঃ পল প্রবর্তিত নতুন নিয়ম। ইসা আঃ বলেছেন, Mathew 5:17-20 “Do not think that I come to destroy the Law and commandments of Moses, but to strengthen them.” মিঃ পল বলেন, মুসার শরীয়তকে ক্রশের পেরেকে ঝুলিয়ে দাও, কোন শরীয়তের দরকার নাই। ইসা আঃ বলেন, Mathew 15:24 Jesus said-“I am sent only to the lost sheep of Israel”. মিঃ পল বলেন, বিশ্বের সব জাতীর কাছে যাও। ৮ দিন বয়সে ইসা আঃ এর খৎনা দেওয়া হয়। মিঃ পল বলেন, কোন খৎনার দরকার নাই। খৃস্টানদের সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার ছিল দুটি, বিশ্বাস করা যে ইসা আঃ নিজের রক্ত দিয়ে সমস্ত খৃস্টানের পাপ মোচন করে গেছেন এবং তিন

খোদার প্রবর্তন। এরকম শত শত উদাহরণ দেওয়া যাবে যেখানে খৃস্টানরা সম্পূর্ণ উল্টো পথে চলেছে। .নিচের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের মাধ্যমে খৃষ্টানগণকে নির্দেশ দিচ্ছেন, ইঞ্জিলে যা আছে তা অনুসরন কর এবং তদনুযায়ী বিচার কর। ইসা আঃ কে অমান্য করা এবং পলকে অনুসরন করা যেমন তারা এখন করছে, সেটি তাদের জন্য মোটেই সঠিক নহে। তারা যদি ফিরে না আসে তা হলে তাদেরকে অবাধ্য হিসাবে গন্য করা হবে এবং নিশ্চিত রূপে তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

আমি তাদের পেছনে মরিয়ম তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাঁকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববতী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়ন করে পথ প্রদর্শন করে এবং এটি খোদাভীরুদের জন্যে হেদায়েত উপদেশ বানী। ইঞ্জিলের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফয়সালা করা। যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করেনা, তারাই পাপাচারী।(৫:৪৬-৪৭)

২৬৭
খৃস্টান বা ইহুদীরা রাসুলের কাছে কোন ফায়সালার জন্য আসলে রাসুল তাদের নিজ নিজ কেতাব অনুসারে ফায়সালা দিতে চেষ্টা করতেন। আগের আয়াতগুলিতে এটা সমর্থন করা হয়েছে। কিন্তু নীচের আয়াত দ্বারা আল্লাহ সেই বিধান রদ করেছেন। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট রূপে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এখন থেকে সকল বিচার কার্যই কোরআনের নির্দেশিত পন্থায় হতে হবে। ইহুদী ও খৃষ্টানগণ তাদের রীতি-পদ্ধতি দ্বারা আমাদের বিচ্যুতি ঘটাতে চাইবে। কিন্তু আমাদের সচেতন থাকতে হবে যাতে আমরা তাদের খেয়াল খুশীকে অনুসরণ না করি, তাদের দিকে ঝুঁকে না পড়ি। তাদের প্রলুব্ধিতে পড়ে আমরা যেন পথহারা না হয়ে যাই। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন- যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহের কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান। (৫:৪৯)

২৬৮

যেসব কথা অপ্রীতিকর তা কেউই বলতে চায় না। যদি আমি তা বলি তাহলে আমাকে বলা হবে যে, তুমি সামপ্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছ। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সত্য বলতে লজ্জা বোধ করেন না। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমরা ইহুদী ও খৃষ্টানগণকে আমাদের বন্ধু রূপে গ্রহন না করি। তারা পরস্পরের বন্ধু। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ কথাটি যে কত সত্য তা আমরা বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি। যখন আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের দিকে তাকাই এবং সেই সাথে মুসলিম বিশ্বের প্রতি তাদের মনোভাব লক্ষ্য করি, তখনই আমরা উপলব্ধি করি আল্লাহর আয়াত কত সত্য ।। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (৫:৫১)

২৬৯

আগে আমরা আলোচনা করেছি যে ইহুদী ও খৃস্টানদের বন্ধু বা অবিভাবক হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। আবার অন্য আয়াতে মুশরিকদেরও পরম শত্রু বলা হয়েছে। তাহলে আল্লাহর দল কারা? কারা আমাদের বন্ধু হওয়া উচিত? আল্লাহ তায়ালা সেটা স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন নীচের দুই আয়াতে। আমাদের বন্ধু হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর রাসুল (সাঃ) এবং ঈমানদারগণ। এদের সমন্বয়েই গঠিত হবে আল্লাহর দল। আল্লাহর দলই নিশ্চিত রূপে বিজয়ী। আমরা কী আল্লাহর দলভুক্ত, সেটা আমরা নিজেরাই বিচার করে দেখতে পারি। কোরআনে এরশাদ করা হয়েছেঃ

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ
وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল এবং মুমিনবৃন্দ-যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী। (৫:৫৫-৫৬)

২৭০

নীচের আয়াতটি কাফির এবং মদীনার ইহুদীদের উদ্দেশ্যে নাজিল হয়। তারা আযান এবং নামাজকে উপহাস করত। কিন্তু আজকের দিনেও আমাদের সমাজে এটি বিদ্যমান আছে। তাই এই আয়াতের প্রয়োগ আজকের সমাজেও সমভাবে প্রযোজ্য। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা নিজেকে বুদ্ধিজীবি বলে ধারনা করেন, তারা আযান নিয়ে উপহাস করেন, নামাজীদের নিয়ে উপহাস করেন। যারা নামাজ আদায় করতে যায় তাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করেন। আযানকে তারা শব্দ দুষনের সাথে তুলনা করেন। আমরা ব্যক্তিগত ভাবেও দেশের কয়েক জন কবি ও লেখককে জানি, যারা আযান ও নামাজকে হেয় করে কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সাধারন জনগণের দাবীর মুখে তাদের দেশ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। আল্লাহ এই সব লোকদের নির্বোধ বলে ঘোষনা দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়েত দান করুন, এই দোষ থেকে আমাদের মুক্ত রাখুন।

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ

আর যখন তোমরা নামাযের জন্যে আহবান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ, তারা নির্বোধ ।(৫:৫৮)

২৭১

পাপ, সীমালঙ্ঘন এবং হারাম ভক্ষন, এই তিনটি নিকৃষ্ট কাজ আমাদের সমাজে অহরহ ঘটে চলেছে। বিশেষ করে সীমালঙ্ঘন ও হারাম ভক্ষন, এদুটি অপরাধ সরকার সর্বাত্ত্বক চেষ্টা করেও থামাতে পারছে না। ধর্ষণ একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। সকালে খবরের কাগজ খুললেই পাতায় পাতায় ধর্ষণের খবর। ধর্ষণ করাই যেন একটা ফ্যাশন। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাঝেও এনিয়ে একটা প্রতিযোগীতা চলছে। আর হারাম ভক্ষন সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে গেছে। ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা লোপাট, জালিয়াতি করে জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন, অতিরিক্ত ক্রয় মুল্য দেখিয়ে সরকারের টাকা ভক্ষন, ইত্যাকার নানা ভাবে হারাম টাকা উপার্জন এখনকার নিত্যকার ঘটনা। আল্লাহ বলেন, এগুলি খুবই মন্দ কাজ এবং মহা পাপ। এগুলি প্রতিরোধ করার জন্য সবাইকে একাট্টা হয়ে কাজ করতে হবে। সরকারের সাথে সাথে দেশের বুদ্ধিজীবী , আলেম উলেমা, পীর মাশায়েখ সবাইকে একাজে অগ্রনী হবার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন নীচের আয়াতে।

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ
لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ

আর আপনি তাদের অনেককে দেখবেন যে, দৌড়ে দৌড়ে পাপে, সীমালঙ্ঘনে এবং হারাম ভক্ষনে পতিত হয়। তারা অত্যন্ত মন্দ কাজ করছে। দরবেশ ও আলেমরা কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না? তারা খুবই মন্দ কাজ করছে। (৫ঃ৬২-৬৩)

২৭২

মুসলিমদের কোন কোন দল বিশ্বাস করেন যে, ইসলামে কিছু গোপনীয় বিষয় আছে যা আপনি কেবল পীর, দরবেশ, অথবা ওলি-আল্লাহর কাছ থেকে জানতে পারবেন। এই গোপনীয় শিক্ষার জন্য লিখিত কোন কিতাবাদি নেই। এগুলো অন্তর থেকে অন্তরে স্থানান্তরিত হয়। এটি একেবারেই ভ্রান্ত মতবাদ । আল্লাহ্তায়ালা তার রাসুলকে নির্দেশ দিয়েছেন তার সমুদয় বানী মানুষকে পৌছানোর জন্য। অন্যথায় রাসূলের দায়িত্ব পরিপূর্ন হবে না। রাসুল কড়া গণ্ডায় তার দায়ীত্ব পালন করেছেন। বিদায় হজ্জে তিনি সাহাবীদের কাছ থেকে এর সমর্থনে সুস্পষ্ট ভাবে সাক্ষ্য নিয়েছেন। তাই ইসলামে গোপনীয় বলে কিছুই নেই। সব কিছু স্বচ্ছ ও প্রকাশিত । আবার এই আয়াতের শেষে আল্লাহ রাসুলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে তিনি তার রাসুলকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দিবেন। কোন মানুষ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। রাসুলের ঘরের বাইরে রাত্রে কেউ না কেউ পাহারা দিত । এই আয়াত নাজিল হবার পর রাসুল সমস্ত পাহারাদারদের প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেন, কারন মহান আল্লাহ নিজেই নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে ঃ-

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

হে রসূল, পৌছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (৫:৬৭)

২৭৩ .
কোরআনের অনেক স্থানেই আল্লাহ তায়ালা সরাসরি ইহুদী ও খৃষ্টানগণকে কোরআন অনুসরন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র রাসুল মদিনা এবং আরবের অন্যান্য স্থানের ইহুদী ও খ্রিস্টান রাজাদের কাছে এই বানী পৌছে দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে এই বানী তাদের কাছে পৌছানো যাবে কিভাবে? আমাদেরকে অবশ্যই তাদের কাছে যেতে হবে এবং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পৌছে দিতে হবে। এখন অবশ্য বিভিন্ন মিডিয়ার সাহায্যেও আমরা এই কাজ করতে পারি। এটি আমাদের দায়িত্বের অংশও বটে। শুধুমাত্র তাওরাত ও ইঞ্জিলে বিশ্বাসই যথেষ্ট নহে। সর্বশেষে অবতীর্ণ কোরআনে বিশ্বাস না আনা পর্যন্ত কোন ইহুদী খৃস্টানকে পথ প্রাপ্ত বলে ধরা হবে না। কোরআন এ ইস্যুতে খুই সোচ্চার। কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন ঃ-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىَ تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

বলে দিনঃ হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা কোন পথেই নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তওরাত, ইঞ্জিল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাও পুরোপুরি পালন না কর। আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে আপনার প্রতি যা অবর্তীণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর বৃদ্ধি পাবে। অতএব, এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না। (৫:৬৮)

২৭৪
ঠিক একই আয়াত সুরাহ বাকারার ৬২ নম্বর আয়াতে এসেছে, হুবহু এক। এই আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়েও আলেমদের মাঝে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। অনেকে বলেন, এই আয়াত অনুসারে যে কোন ধর্মের লোকই মুক্তি পাবে যদি সে এক আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, অন্য ধর্মে থেকে কি এক আল্লাহতে বিশ্বাস রাখা সম্ভব? পৃথিবীর যে কোন ধর্মকে উদাহরণ হিসাবে নিতে পারেন। খৃস্টানরা তিন খোদাকে গ্রহণ করেছে। হিন্দুদের হাজার হাজার দেবতা। বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধের সোনার মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করে। পরিশুদ্ধ একত্ববাদ পেতে হলে আপনাকে ইসলামে আসতেই হবে। তাই আল্লাহ সুরাহ আলে ইমরানের ১৯ নম্বর আয়াতে ঘোষণা দিয়েছেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট দ্বীন একমাত্র ইসলাম"। আলে ইমরানের ৮৫ নম্বর আয়াতেও একই কথার প্রতিধ্বনি করা হয়েছে। এর আগের আয়াতেও আল্লাহ আহলে কিতাবীদের কোরআনে বিশ্বাস করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই মুক্তি পেতে হলে সবাইকে ইসলামে ফিরে আসতেই হবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, ছাবেয়ী বা খ্রীষ্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (৫ঃ৬৯)

২৭৫

পৃথিবীর বেশীরভাগ খৃষ্টান মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত। একদল মনে করে যে মৃত্যু থেকে জীবিত হবার পর ঈসা আঃ নিজেই ইশ্বর হয়ে গেছেন। ইন্দোনেশিয়ার অনেক খৃষ্টানকে আমি এটা বলতে শুনেছি। আর এক দল আছে যারা মনে করে যে তিন জন খোদা আছে... God the Father, God the Son and God the Holy Ghost. ঈসা আঃ কে তারা খোদার পুত্র বলে মনে করে এবং সেই হিসাবে তিনি God the Son. আমাদের মনে রাখতে হবে যে ঈসা আঃ কক্ষনও এই ধরনের কথা বার্তা বলেন নি । পরবর্তী পর্যায়ে Mr Paul এগুলির উদ্ভাবন করেছেন । যাক, আল্লাহ সুবহানু তালা এই দুই ধরনের খৃষ্টানদের সম্পর্কেই নীচের দুই আয়াতে আলোচনা করেছেন । যারা এই দুই মতবাদে বিশ্বাস করে তারা সব্বাই নিশ্চিত কাফের। এরা যদি ফিরে না আসে এবং এই কুফরিতে অটল থাকে তবে তাদেরকে নিশ্চিতভাবে শাস্তি প্রদান করা হবে।আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ
لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিময়-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ; অথচ মসীহ বলেন, হে বণী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, যিনি আমার পালন কর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলেঃ আল্লাহ তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। (৫:৭২-৭৩)

২৭৬
নিচের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যুক্তি প্রমান সহ ঘোষনা করেন যে ঈসা মসীহ তার রাসুল বৈ অন্য কিছুই ছিলেন না। তিনি তার পূর্বে গত হয়ে যাওয়া অসংখ্য রাসুলের মতোই মানুষ ছিলেন। তার মাতা ছিলেন একজন সত্যবাদী মহিলা এবং আল্লাহর ওলী। বেচে থাকার জন্য তাদের উভয়কেই খাদ্য গ্রহন করতে হয়েছে, তাদেরকে বাজার ঘাটে যেতে হয়েছে, সাধারন মানুষের মত অন্যান্য কর্মাদি সম্পন্ন করতে হয়েছে। সুতরাং তারা খোদা ছিলেন না, তারা জাগতিক প্রয়োজনীয়তার অধীন মানুষ ছিলেন মাত্র। কোরআনে এরশাদ করা হয়েছে।

مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

মরিয়ম-তনয় মসীহ রসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন আর তার জননী একজন ওলী। তাঁরা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্যে কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ননা করি, আবার দেখুন, তারা উল্টা কোন দিকে যাচেছ। (৫ঃ৭৫)

২৭৭
নিচের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা খৃষ্টানগণকে সাবধান করছেন, তারা যেন তাদের ধর্মের সত্যের সীমারেখা অতিক্রম না করে। অতি বাড়াবাড়ির কারনে অতীতে বহু জাতী ধ্বংস হয়েছে। তারা নিজেরাও অধ:পাতে গেছে এবং অন্যদেরও বিভ্রান্ত করেছে । এ আয়াতে মিঃ পল এবং তার অনুসারীদের প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা এরাই বর্তমান খৃষ্টান জাতীগুলোকে ইসা আঃ এর আনীত সত্য থেকে সম্পূর্নরূপে বিভ্রান্ত করেছে। এরা তিন খোদার আবিষ্কার করেছে, ইসা আঃ কে

খোদার আসনে বসিয়েছে। ইসা আঃ এর শিক্ষার সম্পূর্ন বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও কেন যে খৃষ্টান জণগণ মিঃ পল এর শিক্ষার প্রতি এত অন্ধ, তা অনুধাবন করা কঠিন। আল্লাহ এরশাদ করছেনঃ

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ

বলুনঃ হে আহলে কিতাবগন, তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং এতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। (৫:৭৭)

২৭৮
ইসলামের চারটি নির্দেশনার মধ্যে শেষ দুটি হলো সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ। এদুটি ছাড়া পরিপূর্ণ ইসলামি জীবন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। বনি ইসরাইলদের জন্যও একই নির্দেশনা ছিল। কিন্তু তারা এই নির্দেশ পালন করতে কখনও উৎসাহ বোধ করে নি। বর্তমানে এই অনীহা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে তারা যা ইচ্ছা তাই করে চলেছে। সাধারণ জনগণ দুরের কথা, সময় সময় সরকার থেকেই এসব অসৎকাজের সম্মতি দেওয়া হয়। ফলে সমাজে চরম অশ্লীলতা ও অসামাজিক কাজকর্ম বেড়েই চলেছে। এগুলিকে তারা কোন পাপই মনে করে না। এমনকি তাদের বাইবেলেও যে কাজকে চরম ঘৃণ্য বলা হয়েছে, সেই সমকামিতাকেও তারা সরকারী ভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এর চেয়ে বড় অনাচার আর কি হতে পারে। আল্লাহ বলেন, এ কারনে তাদের উপর তৌরাত ইনজিল ও কোরআনের মাধ্যমে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে।

كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ

তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই নিকৃষ্ট ছিল। (৫ঃ৭৯)

২৭৯ .
ইহুদী খৃষ্টান এবং মুশরিক, এদের মধ্যে ইসলামের ভয়ংকর শত্রু কারা? আমরা কি ক্রমানুসারে সাজাতে সক্ষম? কে সবচেয়ে বড় শত্রু, তারপর কে এবং তারপর .. ? এক্ষেত্রে আমাদের নানাবিধ মতামত থাকতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাদের সুবিধার্থে তা বলে দিয়েছেন। ইহুদী ও মুশরিকরা শত্রুতায় অধিক অগ্রসর বলে আল্লাহ ঘোষনা দিয়েছেন। কারন এই দুই সম্প্রদায় অহংকার, গর্ব , দাম্ভিকতা ও একগুঁয়েমিতে ভরপুর । অন্য দিকে খৃস্টানরা মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বের অধিক নিকটবর্তী, কারন তারা শিক্ষিত ও নিরহঙ্কার। রাসুলের যুগেও এটা সত্য ছিল। মক্কার মুশরিক ও মদীনার ইহুদিরা মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। অপর দিকে ইথিওপিয়ার খৃস্টান রাজা মুসলমানদের যায়গা দিয়েছিল তার রাজ্যে। বর্তমানেও অবস্থা একই রয়ে গেছে। বিশ্বের ঘটনাবলির দিকে তাকালে এই সত্যই আমাদের সামনে ভেসে উঠে। আজ গাজায় ইহুদি আর মুশরিক একাট্টা হয়ে প্যালেস্টাইন মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে, সাথে রয়েছে খৃস্টান বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র। পবিত্র কোরআন বলেঃ

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ

আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরেকদেরকে পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টান বলে। এর কারণ এই যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার করে না। (৫:৮২)

২৮০

আল্লাহ তায়ালা যে সব বস্তু আমাদের জন্য হালাল করেছেন তার মধ্যে কোন কোনটিকে নিজের জন্য হারাম বানিয়ে নেয়া আমাদের উচিত নয়। এগুলো আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অনুগ্রহ। ঐসব নেয়ামতগুলি আমাদের পূর্নরূপে ভোগ করা উচিত এবং সেজন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। ইসলামে জীবনকে কঠিন করে তোলার অনুমতি দেয়া হয়নি। কৃতজ্ঞতার সাথে প্রাপ্ত সকল সুবিধাকে ব্যবহার করতে হবে। অপরদিকে সীমা লংঘনেরও অনুমতি নেই। ইসলামে ভারসাম্যপূর্ন জীবনই কাম্য। খাদ্যের বেলায়ও তাই। হালাল কিন্তু ভাল খাদ্য খেতে হবে। পচা অথবা নষ্ট খাবার নয়। ডাক্তারের নিষেধ থাকলে হালাল খাবারও খাওয়া ঠিক নহে। এটাকেই হালালান তায়ীবাহ বলে । হালাল হতে হবে, আবার নিজের জন্য উপযোগী হতে হবে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَوَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা ঐসব সুস্বাদু বস্তু হারাম করো না, যেগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ তা'য়ালা যেসব বস্তু তোমাদেরকে দিয়েছেন, তন্মধ্য থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী। (৫:৮৭-৮৮)

২৮১

কথায় কথায় শপথ নেওয়া অনেকেরই নিত্য দিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আল্লাহর কিরে, By God, মা-বাবার কিরে, ইত্যাকার বাক্যগুলি আমরা অহরহ শুনে থাকি। অনেক সময় না বুঝেই আমরা এগুলি বলি্। কিন্তু এগুলিও এক ধরনের শপথ বাক্য। যদিও অনর্থক শপথকে আল্লাহ ধরবেন না, তবুও এগুলি পরিহার করা উচিত। অনেক সময় মিথ্যাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য আমরা শপথ করি। এটা মহা পাপ। এই শপথের কোন কাফফারা নাই। এর জন্য শাস্তি হবে আখিরাতে। যখন কোন কাজ করার জন্য বা কোন কিছু বর্জনের জন্য আমরা শপথ করি, তখন তা পালন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু কোন কারনে যদি তা পালন করা না যায়, অথবা তা পালনে শরীয়তে বাধা থাকে, তবে সেই শপথ ভাঙা যেতে পারে এবং সে জন্য কাফফারা দিতে হবে। কি এবং কত কাফফারা দিতে হবে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা নীচের আয়াতে এসেছে। যে ব্যক্তি কোন ধরণের কাফফারা দিতে একেবারেই অসমর্থ, তার জন্য তিন দিন রোজা রাখাই যথেষ্ট হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্যে; কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুত করে বাধ। অতএব, এর কাফফরা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেনীর খাদ্য যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা, তাদেরকে বস্তু প্রদান করবে অথবা, একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন রোযা রাখবে। এটা কাফফরা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে। তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কর এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (৫ঃ৮৯)

২৮২

নিচের আয়াতটি খুবই গুরুত্বপূর্ন এই বিবেচনায় যে, এখানে মদ, এলকোহল অথবা অন্য কোন নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য চূড়ান্ত ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর আগে মদের উপর আরো দুইটি আয়াত এসেছে। একটাতে বলা হয়েছে, মদে ভালো মন্দ দুইটাই আছে, কিন্তু মন্দের ভাগ বেশী। অন্য আয়াতে মদ খেয়ে নামাজে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এই আয়াতে মদ খাওয়াকে শয়তানের কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য শুধুমাত্র হারামই করা হয়নি, বরং ইসলামী শরীয়তে মদ সেবনকারীর জন্য বড় ধরনের ইহজাগতিক শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। শেষ বিচারের শাস্তি তো রয়েছেই। এরকম কড়াকড়ির কারণ হলো, নেশা সকল সামাজিক অপরাধের মাতা। মদের সাথে সাথে একই আয়াতে জুয়া, প্রতিমা ও লটারির কথা বলা হয়েছে। এগুলিও সমানভাবে সামাজীক অপরাধ। তাই এগুলিকেও বর্জন করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক-যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। (৫:৯০)

২৮৩

আগের আয়াতে আল্লাহ আমাদের মদ ও জুয়া থেকে নিবৃত্ত থাকতে বলেছেন। মদ ও জুয়া যে শয়তানের উদ্দেশ্য হাসিলের এক বিশেষ হাতিয়ার, সেটাই আল্লাহ নীচের আয়াতে বিবৃত করেছেন। শয়তানের উদ্দেশ্য কী? সে সকলের অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ায় এবং একে অপরকে শত্রু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। শয়তানের অস্ত্র কী? তার অস্ত্র হলো মাদকদ্রব্য এবং জুয়া। বিষয়টি এতই সত্য যে, এর জন্য কোন প্রমানাদির প্রয়োজন নেই। আজকের দিনে যে সব অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে তার অধিকাংশই হচ্ছে জুয়া এবং মাদকাসক্ততা থেকে। একজন Addicted মানুষ সংসার ও সমাজের জন্য যে কত ভয়াবহ হতে পারে তার ভুরি ভুরি উদাহরণ আমাদের সমাজে আছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শুত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখন ও কি নিবৃত্ত হবে? (৫:৯১)

২৮৪

পূর্বে শিকার করা ছিল আরববাসীদের একটি প্রধান উপজিবিকা। সকালেই তারা বেড়িয়ে পড়তো শিকারে। দিন শেষে শিকার নিয়ে ফিরতো তারা ঘরে। হজ্জ বা ওমরাহের সময় ইহরাম বাধা অবস্থায়ও অনেকে শিকার করতো। কিন্তু ইহরাম অবস্থায় অনেক হালাল কার্য্যও হারাম হয়ে যায়। সব ধরনের পশু হত্যাও হারাম হয়ে যায় এ সময়। নীচের আয়াতে সেই নির্দেশনায় জারী করেছেন মহান আল্লাহ। কেউ যদি পশু হত্যা করেই ফেলে, তবে তার জন্য কাফফারা দিতে হবে। কাফফারার পরিমাণ কত হবে, তারও একটা নির্দেশনা আছে নীচের আয়াতে। হাজি সাহেবগন এগুলি খুব কড়াকড়ি ভাবে পালন করে থাকেন। তবে অন্য কেউ যদি শিকার করে আনে, তবে ইহরাম পরিধানকারী ব্যক্তিও সেটা খেতে পারেন। আর জলজ প্রাণীর জন্য এটা প্রযোজ্য নয়। যে কোন মাছ ধরতে ও খেতে পারবেন ইহরামধারী ব্যক্তি। হিংস্র পশু ও পাখিদের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছে। এরা যদি বিপদজ্জনকভাবে লোকালয়ে এসে যায় তবে এদেরকে হত্যা করা যাবে। বর্তমান সামাজীক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আমরা যে হজ্জ বা ওমরাহ পালন করি, সেখানে হাজীদের সব কিছুর যোগান দেওয়া হয় একটি প্যাকেজ হিসাবে। সুতরাং খাওয়া, শোওয়া, যাতায়াত ইত্যাদী কোন কিছুর জন্যই তাদের কোন চিন্তা করতে হয় না। তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদতে হজের সময়টা কাটিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী আমাদের উপর।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

মুমিনগণ, তোমরা এহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনেশুনে শিকার বধ করবে, তার উপর বিনিময় ওয়াজেব হবে, যা সমান হবে ঐ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে। দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে-বিনিময়ের জন্তুটি উৎসর্গ হিসেবে কাবায় পৌছাতে হবে। অথবা তার উপর কাফফারা ওয়াজেব-কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা তার সমপরিমাণ রোযা রাখতে যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে। যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ মাফ করেছেন। যে পুনরায় এ কান্ড করবে, আল্লাহ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম। (৫:৯৫)

২৮৫

আল্লাহ চারটি জিনিসকে সম্মানীত ঘোষনা করেছেন নীচের আয়াতে। এর একটি হলো আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ। কাবা ঘরের সীমানার মধ্যে কোন ধরনের ঝগড়া ফ্যাসাদ, মারামারি, যুদ্ধবিগ্রহ করা যাবে না, কোন পশু পাখি হত্যা করা যাবে না, গাছপালা কাটা যাবে না, এমনকি পিতার হত্যাকারীও এই সীমানার মধ্যে নিরাপদ। যে কেউ এর সীমানার মধ্যে পৌছে গেল, তার জীবন নিরাপদ হয়ে গেল। মাসের মধ্যে চারটি মাস সম্মানীত। এগুলি হলো রজব, জিলকদ, জিলহজ্জ ও মুহাররাম। এই মাসগুলিতে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ করা যাবে না। মানুষ নিরাপদে ভ্রমন করতে পারবে, ব্যবসার জন্য

সফর করতে পারবে, হজ্জের জন্য মক্কায় যেতে পারবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না। মানুষ যথেচ্ছাভাবে যথা তথা ভ্রমন করতে পারবে। এ ছাড়াও যে সব পশু কোরবানীর জন্য এবং মানতের জন্য গলায় পট্টি বেধে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেগুলিও সম্মানিত। কেউ সেগুলির চলাচলে বাধা দিতে পারবে না। মানুষ সেগুলিকে বাধাহীন ভাবে কোরবানীর স্থানে পৌছে দেবে। আল্লাহ বলেন, এই নির্দেশনা জারী করা হয়েছে যাতে সমাজে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে মানুষের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় কার্যাবলী বাধাগ্রস্থ না হয়, যাতে যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য মানুষের ব্যবসা বানিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। অশেষ করুনাময় মহান আল্লাহর প্লান কতই না সুন্দর। অবশ্য অন্য আর এক আয়াতে আল্লাহ আরো দুটি জিনিষকে আল্লাহর নিদর্শন হিসাবে ঘোষনা দিয়েছেন। হজ্জ বা ওমরাহ্ এর নিয়তে এহরাম পরিহিত হাজী সাহেবগন এবং সাফা মারওয়া পাহাড়। এ সম্বন্ধে আমরা নির্দিষ্ট স্থানে আলোচনা করেছি।

جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلآئِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

আল্লাহ সম্মানিত গৃহ কাবাকে মানুষের স্থীতিশীলতার কারণ করেছেন এবং সম্মানিত মাসসমূকে, হারাম কোরবানীর জন্তুকে ও যাদের গলায় পট্টি রয়েছে। এর কারণ এই যে, যাতে তোমরা জেনে নাও যে, আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের সব কিছু জানেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (৫:৯৭)

২৮৬
ইহুদিগন অযথাই নানা প্রশ্নে তাদের নবীদের বিব্রত করার চেষ্টা করতো । গরু কোরবানী করতে বলা হলো। এতেও নানা প্রশ্ন তাদের। কি গরু , কত বয়স, কি রং, কোন জাতের ইত্যাদী ইত্যাদী। ফলে গরুর specification এমন দাড়ালো যে সেরকম গরু বাজারে পাওয়াই মুশকিল। সহজ বিষয়কে তারা কঠিন জটিল করে ফেললো । প্রথমদিকে সাহাবাগন রাসুলকে নানা প্রশ্ন করতেন । অনেক ক্রীতদাস সাহাবা তাদের পিতার নাম জানতেন না। একদিন তারা রাসুলের কাছে তাদের পিতার নাম জানতে চাইলেন। এই পর্যায়ে আল্লাহ নীচের আয়াত নাজিল করে তাদেরকে অযথা প্রশ্ন না করার নির্দেশ দিলেন। এক হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাঃ বলেন , "সবচেয়ে বড় অপরাধী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার প্রশ্ন করার ফলে কোন জিনিষ হারাম করে দেওয়া হল যা আগে হালাল ছিল।" এর পরে সাহাবীগন রাসুলকে প্রশ্ন করতেই ভয় পেতেন। এরশাদ হচ্ছেঃ-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

হে মুমিণগন, এমন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। যদি কোরআন অবতরণকালে তোমরা এসব বিষয় জিজ্ঞেস কর, তবে তা তোমাদের জন্যে প্রকাশ করা হবে। অতীত বিষয় আল্লাহ ক্ষমা করেছেন আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল। (৫ঃ১০১)

২৮৭
কারো মৃত্যুর পরে তার সম্পদের বিলি বন্ঠন ব্যবস্থা কোরআনে সুরাহ নিসাতে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এর পরেও হয়তো কোন কারনে ওসিয়ত করার দরকার হতে পারে। হয়তো তার ঋণ আছে,

কোন গরীব আত্মীয়ের জন্য হয়তো সাহায্যের দরকার , আল্লাহর রাস্তায় কিছু দান করা প্রয়োজন, কিছু ওয়াদা করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবায়ন করা হয়নি, এসব কারনে ওসিয়ত করার দরকার হয়। কিভাবে ওসিয়ত করতে হবে, তার বিস্তৃত বিবরণ নীচের আয়াতে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় দুজনকে সাক্ষী রাখতে হবে। কিন্তু সফরে থাকলে চারজনকে সাক্ষী করতে হবে, দুজন দেশী এবং দুজন বিদেশী। সম্পদ ভাগের সময় তাদের সাক্ষ্য নিয়ে ওসিয়াত পূর্ণ করতে হবে। ঋণ থাকলে তা আগে শোধ করতে হবে। অবশিষ্ট সম্পদ থেকে সর্বোচ্চ তিন ভাগের এক ভাগ ওসিয়তে ব্যয় করা যাবে। বাকীটা ওয়ারিশদের মধ্যে বন্ঠন হবে। এরশাদ হচ্ছেঃ-

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ

হে, মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওছিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ন দুজনকে সাক্ষী রেখো। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে নামাযের পর থাকতে বলবে। অতঃপর উভয়েই আল্লাহর নামে কসম খাবে যে, আমরা এ কসমের বিনিময়ে কোন উপকার গ্রহণ করতে চাই না, যদিও কোন আত্নীয়ও হয় এবং আল্লাহর সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না। এমতাবস্থায় কঠোর গোনাহগার হব। (৫ঃ১০৬)

২৮৮

আল্লাহ সুবহানু তা'লা ইসা আঃ এর প্রতি কি কি অনুগ্রহ করেছিলেন তার একটা তালিকা এই আয়াতে আছে। এর বেশীর ভাগই মোজেজা যা ইসা আঃ কে দান করা হয়েছিল। আসলে ইসাঃ এর পুরো জীবনটাই অলৌকিক মোজেজায় পূর্ণ ছিল। তার জন্মটাই মোজেজা দিয়ে শুরু, পিতা ছাড়াই জন্ম হয়েছে তার। শিশুকালেই তিনি কথা বলেছেন, ইহুদীদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। বয়স কালে তিনি অগণিত মোজেজা পেয়েছেন। এমনকি মৃতকেও জীবিত করেছেন তিনি। তার শেষ মোজেজা ছিল জীবিত অবস্থায় আসমানে উত্থান। কিন্তু এটাই শেষ নহে। কেয়ামতের আগে তিনি আবার সেই আসমান থেকেই অবতরণ করবেন, কেয়ামতের এক প্রধান নিদর্শন হিসাবে। এই মোজেজা গুলির বর্ণনা বাইবেলেও রয়েছে। কিন্তু বাইবেল একটা খুবই প্রয়োজনীয় মোজেজার উল্লেখ করে নাই যা মরিয়ম আঃ এর দোষ স্খলনের জন্য দরকার ছিল। শিশু ইসাকে কোলে নিয়ে মরিয়ম যখন জনসমক্ষে আসলেন, তখন বিস্মিত জনগণের একটাই প্রশ্ন, এই শিশু কোথা থেকে আসলো? মায়ের কোল থেকে শিশু ইসা জনগণের সব প্রশ্নের জবাব দিলেন (সুরাহ মরিয়ম) । জনগণ বুঝতে পারলো যে ইসা আঃ এর জন্মটা অলৌকিক এবং মরিয়ম আঃ সম্পূর্ণ নির্দোষ। বাইবেলে এই ঘটনার উল্লেখ নাই। কিন্তু কোরআন কি সুন্দর ভাবে মরিয়ম আঃ কে জনগণের কাছে নির্দোষ প্রমাণিত করেছে।

إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِىءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ

যখন আল্লাহ বলবেনঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলে থাকতেও এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তওরাত ও ইঞ্জিল

শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখীর প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে; ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্টরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঈলকে তোমা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা বললঃ এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়। (৫ঃ১১০)

২৮৯
ইসা আঃ এর খুবই প্রিয় ছিলেন ১২ জন হাওয়ারী সাহাবী। তারা নবীর কাছে আবদার করলেন যেন আল্লাহ আসমান থেকে তাদের জন্য Tray ভর্তি খাবার পাঠান। তা থেকে তারা কিছু ভক্ষণ করবে। এতে তাদের চিত্তে প্রশান্তি আসবে, তাদের ইমান বৃদ্ধি পাবে এবং নবী যে সত্য বলছেন তার সাক্ষী হয়ে থাকবে তারা। ইসা আঃ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ প্রার্থনা কবুল করলেন এই শর্তে যে এর পরেও যদি তাদের কেউ অবিশ্বাসী হয় তবে তার জন্য রয়েছে সবচেয়ে কঠোর শাস্তি। বর্তমানেও খৃষ্টানদের জন্য আসমান থেকে অঢেল রিজিক আসে। বিশ্বের বেশীর ভাগ সম্পদই তাদের কুক্ষিগত। এখনও অনেক খৃস্টান খাবার সামনে নিয়ে স্পেশাল প্রার্থনা করে । কিন্তু তার পরেও তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ, ইসা আঃ এর শিক্ষা থেকে তারা বহু যোজন দূরে। উল্লেখ্য যে Tray ভর্তি খাবারের আরবী শব্দ মায়েদা। এই সুরার নামকরণও হয়েছে এই মায়েদা শব্দ থেকে। আমরা বাংলায় যে ময়দা শব্দ ব্যবহার করি সেটাও এসেছে এই আরবী মায়েদা শব্দ থেকে।

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
قَالَ اللهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ

ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেনঃ হে আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ, আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদের রুযী দিন। আপনিই শ্রেষ্ট রুযীদাতা। আল্লাহ বললেনঃ নিশ্চয় আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতরণ করব। অতঃপর যে ব্যাক্তি এর পরেও অবিশ্বাসী হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না। (৫ঃ১১৪-১১৫)

২৯০ .
আমি আমার খৃষ্টান বন্ধুদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনারা জানেন কী যে যীশু আল্লাহ তায়ালার সামনে খুবই লজ্জিত এবং বিব্রত বোধ করবেন যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কেন খৃষ্টানগণ যীশুকে অথবা মেরীকে ঈশ্বর বলে পুজা করে, কেন তারা যীশুকে আল্লাহর অংশীদার মনে করে, কেন তারা যীশুকে তিন খোদার এক খোদা বলে মানে। ঈসা (আঃ) আল্লাহর কাছে নিবেদন করবেন যে, তিনি কখনোই তার অনুসারীগণকে এ সব শিক্ষা দেন নাই, বরং তারা নিজ থেকেই এসব রচনা করে নিয়েছে। একজন রাসুলের জন্য এটা কত দুর্ভাগ্যজনক যে শেষ বিচারের দিনে তার অনুসারীগণ আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে এক অপ্রীতিকর অবস্থায় তাকে ফেলে দেবে। মুসলমানদের জন্যও হাদিসে এই ধরণের এক বর্ণনা রয়েছে যেখানে আমাদের রাসুলকে বিব্রত হতে হবে। মুসলিমদের একটি দল পানি পান করার জন্য হাউজে কাওসারের তীরে উপস্থিত হবে। ফেরেশতাগন তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবে। আল্লাহর রাসুল ফেরেশতাদের বাধা দিয়ে বলবেন, এরা তো আমার উম্মত। ফেরেশতারা উত্তরে বলবেন, আপনি জানেন না আপনার পরে এরা ইসলামকে নিয়ে কি করেছে। তাই

ভাইয়েরা আমার, আমাদের সবাইকে সাবধান হতে হবে। আমাদের কোন কার্যক্রমে যেন আল্লাহর রাসুল হাশরে লজ্জায় না পড়ে যান।

وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللهِ قَالَسُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَأَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ

যখন আল্লাহ বললেনঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন; আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত।(৫:১১৬)

প্রথম খন্ড সমাপ্ত